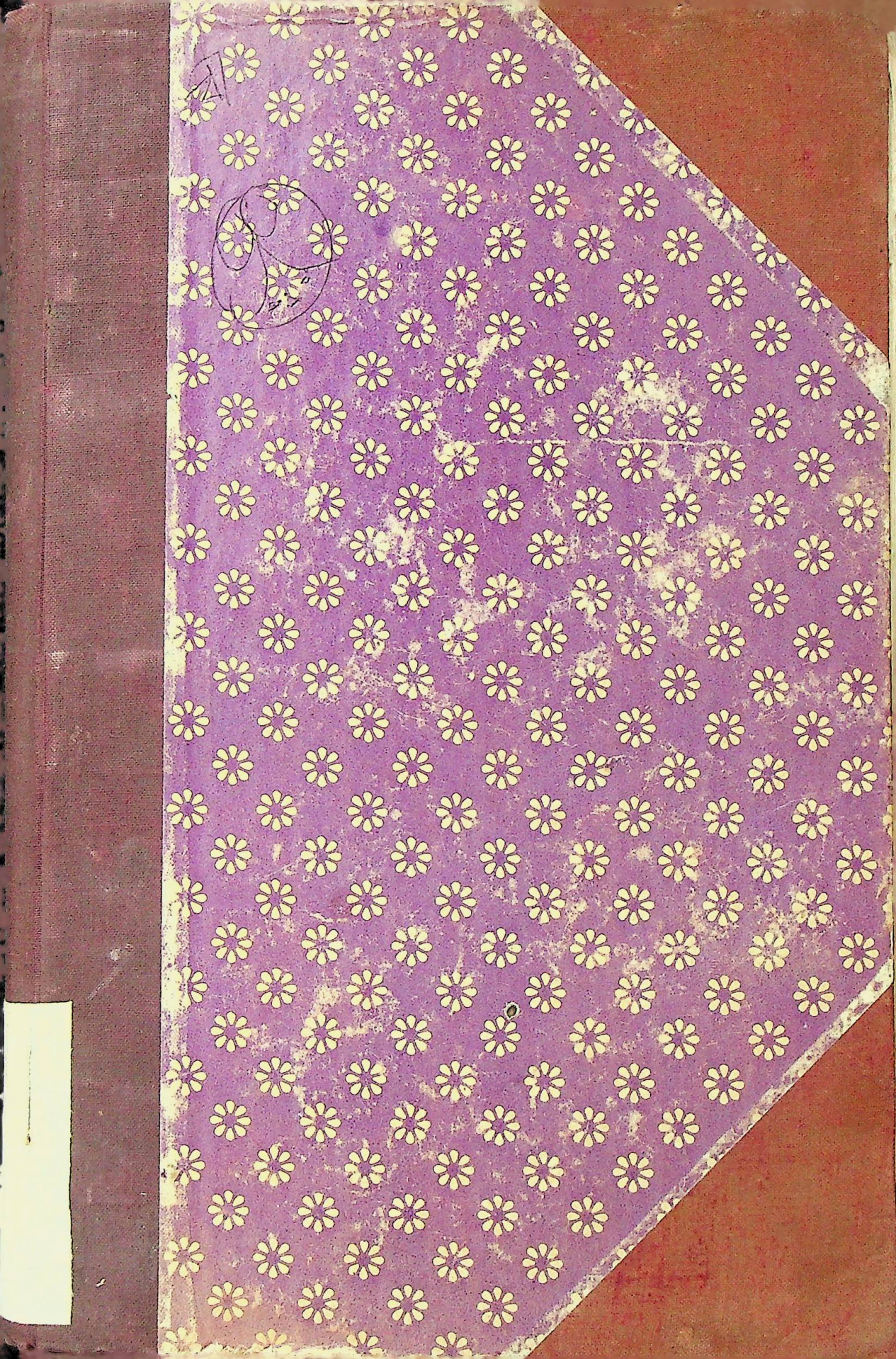






1

# ମାରିତ୍ରୀ



ଅଧ୍ୟାପକ

ଡକ୍ଟର ମଧୁସୂଦନ ଟିମ୍ଲାନ

ଏମ-ଏ, ସି-ଏଫ୍-ଡି

ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ

ଜାତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

100



# সাহিত্যিকী

সত্তর সংখ্যা ॥ ১৩৬৬  
প্রথম বর্ষ ॥



সম্পাদক

ডক্টর মম্বারুল ইসলাম  
এম, এ, পি-এইচ, ডি,

বাংলা বিভাগ  
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

অপর প্রাপ্তিস্থান : গ্রেট বেংগল লাইব্রেরী, ঢাকা—এক

দাম : আড়াই টাকা

## ভূমিকা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মুখপত্র ‘সাহিত্যিকী’ বছরে দু’সংখ্যা প্রকাশ পাবে—শরৎ ও বসন্ত। পাক-বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে বিচার করলে এ দুটো ঋতুর মাঝে আর কোন ঋতুর তুলনা চলতে পারে না।

সুচিন্তিত গবেষণা ও সমালোচনামূলক প্রবন্ধ এ পত্রিকায় স্থান দেয়া হবে। পূর্ব-পাকিস্তানের বিস্তৃত গ্রামাঞ্চলে সাহিত্যের যে টুকরো খণ্ডগুলো লোকচক্ষুর অন্তরালে বিলীন হতে চলেছে, এ পত্রিকা সেগুলোর উদ্ধার ও মূল্য-বিচারের দিকেও বিশেষ ভাবে নজর রাখবে। পাকিস্তানের নিজস্ব আদর্শ, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইসলামী জীবন-ধারণার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মতিবোধ এবং সাথে সাথে এ সর্বের স্রষ্টা রূপায়ণ কোন্ পথে কি ভাবে সম্ভব, তার পথ-নির্দেশ প্রভৃতির দিকে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য এ পত্রিকার চিরদিন থাকবে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য সম্পর্কে নতুন তথ্য ও গবেষণা এবং আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচনা—বাংলা সাহিত্যের এই বিরাট-পরিসর ক্ষেত্র নিয়ে ‘সাহিত্যিকী’র যাত্রা শুরু হোল।

বাংলা বিভাগ,  
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,  
রাজশাহী,  
১লা ভাদ্র—১৩৬৬ সাল।

—মহহারুল ইসলাম

---

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পক্ষে ডক্টর মহহারুল ইসলাম কর্তৃক প্রকাশিত এবং মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ কর্তৃক পূর্ব বঙ্গ প্রেস, ২, জিন্দাবাহার ২য় লেন, ঢাকা—১ হইতে মুদ্রিত।।

# সাহিত্যিকী

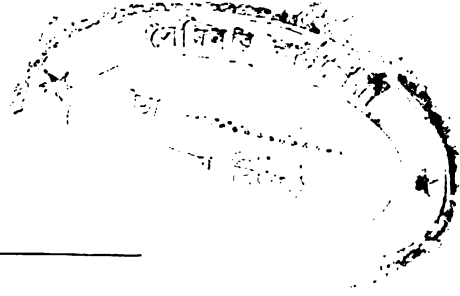
প্রথম বর্ষ

প্রথম সংখ্যা

শরৎ—১৩৬৬

কবি পাগলা কানাই

ডক্টর ময়হারুল ইসলাম



॥ কবি-জীবনী ॥

চণ্ডীদাসের নাম এক সময়ে বাংলা দেশে কিংবদন্তির মতো হয়ে উঠেছিল।  
বাঙ্গালীর গীতিপ্রবণ মনের যথার্থ সুরটি যে কোথায় তা তিনি অনুধাবন করতে  
পেরেছিলেন। সেই সুরে সুর মিলিয়ে তিনি এমন এক গভীর ব্যঞ্জনাময়  
সঙ্গীতের পথ অনুসরণ করলেন যা শুধু চিরস্মরণীয় হয়েই রইল না—বহুদিন ধরে  
এক বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে বিরাট ভক্তগোষ্ঠীর সৃষ্টি করলো। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া  
বাংলা সাহিত্যে আর কোন কবির প্রদর্শিত পথ এমন দীর্ঘকাল ধরে অনুসরিত  
হয় নি। বাংলা সাহিত্যে চণ্ডীদাস-সমস্তা নামে যে সমস্তার সৃষ্টি হয়েছে তার  
মূলও এখানেই। চণ্ডীদাসের মৃত্যুর পরেও কয়েক শতাব্দী ব্যাপী অশ্রু নামধারী

২৫



কবিও নিজের কাব্যকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য চণ্ডীদাসের নামে সজ্জীত রচনা করেছেন। সেজন্যই বলছিলাম, চণ্ডীদাসের নাম রীতিমত কিংবদন্তি হয়ে উঠেছিল। কবি পাগলা কানাই সম্পর্কে কথাটা এমন যথার্থভাবে প্রযুক্ত না হলেও আংশিক সত্য। কবি পাগলা কানাইয়ের নাম আজো পর্যন্ত খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে কিংবদন্তির মতো হয়ে আছে। এ সব স্থানের গ্রাম্য লোকেরা মনে করে কবি পাগলা কানাই তাদেরই স্থানীয় কবি এবং তিনি এক সময়ে তাদের মনের কথাগুলো খুঁটে খুঁটে তাঁর গানে রূপ দিয়ে গেছেন। তাঁর গানগুলোর আবেদন এতো সজীব এবং অভিনব যে সাধারণ মানুষ মনে করে এ সব খুব বেশিদিনের সৃষ্ট নয়—যেন সত্য সত্য কবি সৃষ্টি করে রেখে গেছেন। এজন্যই বোধ করি কোন কোন অঞ্চলের লোকেরা ব'লে থাকে “আরে পাগলা কানাই তো সেদিনের লোক—তার জাহাজের গান, ঘরের গান তো অমুক বয়াতি জানে, সে বয়াতি তো পাগলা কানাইয়ের শিষ্য”, কিন্তু দুর্ভাগ্য, পাগলা কানাই তো দূরের কথা তাঁর শিষ্যের শিষ্যেরাও আজ বিশেষ কেউ জীবিত আছে কিনা সন্দেহ। মরীচিকার এক অদ্ভুত যাত্র-শক্তি আছে বলেই তাকে নিকটের বলে ধারণা হয়,—পাগলা কানাইয়ের গানেরও এমনি একটা যাত্র-শক্তি আছে, তাই সময়ের দিক থেকে তাঁকে এমন কাছের বলে মনে হয়। কিন্তু খুব কাছের মানুষ তিনি নন।

আনুমানিক ১৮১০ থেকে ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে কবি পাগলা কানাই যশোহর জেলার বিনাইদহ মহকুমার সদর থানার অন্তর্গত বেরবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামটা বিনাইদহ থেকে মাত্র ৫৬ মাইল দূরে অবস্থিত। কবির পিতা ছিলেন একজন গরীব কৃষক। কৃষিকাজের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত কায়ক্রেশে তাঁকে সংসার চালাতে হোত। সেজন্য বাল্যে পাগলা কানাইয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি করতে পারেন নি।

গ্রামবাংলায় তখন শিক্ষা বলতে সাধারণতঃ মন্ডব বা টোল জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা বোঝাতো। ইংরেজী শিক্ষার শ্রোত বা পাশ্চাত্য সভ্যতার আলো তখনো পর্যন্ত বাংলার গ্রামগুলোতে ব্যাপকভাবে প্রবেশ করেনি। গ্রামের সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে মুসলমান জনসাধারণ ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে

ভাগ্যোন্নয়নের কথা লোক-মুখে হয়তো শুধু শুনেছে অথবা কচিৎ ছ' একজনকে চাক্ষুস দেখেছে কিন্তু সেই শিক্ষার পরিকল্পনাকে নিজের বা সম্ভাবন সম্ভবতার জীবনে রূপায়িত করবার সামর্থ্য অত্যন্ত কম ক'জনের পক্ষেই আয়ত্ত করা সম্ভব হয়েছিল। কারণ হিসেবে মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিরূপ মনোভাব, অজ্ঞতা, অর্থকৃচ্ছ্রতা এবং শাসক গোষ্ঠীর ইচ্ছাপ্রমূত বিরূপ মনোবৃত্তি প্রভৃতি সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ছিল বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। দেশের, বিশেষ করে গ্রাম-বাংলার এ হেন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে কবি পাগলা কানাই তাঁর শৈশব ও কৈশোরের দিনগুলো অতিবাহিত করেন। অবশি সাধারণ গরীব কৃষকের ছেলে হলেও তিনি গ্রামের মক্তবে পড়তে গিয়েছিলেন কিন্তু দূরন্ত পাগল ছেলের পড়ালেখা হোল না—কারণ কবি ছিলেন অত্যন্ত দৃষ্ট প্রকৃতির বালক। তাঁর একটা গানে তিনি তা উল্লেখ করেছেন—

লেখাপড়া শেখবো বলে

পড়তে গেলাম মক্তবে

পাগলা ছোড়ার হবে না কিছু

ঠাট্টা করে কয় সবে

ছোড়া চলে ফেরে তাড়ুম তুড়ুম

মারে সবায় গাড়ুম গুড়ুম

বাপ এক গরীব চাষা

ছাওয়াল তার সবনাশা

সে আবার পড়তে আসে কেতাব কোরাণ ফেকা

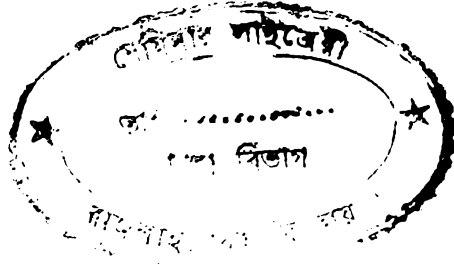
পাগল কানাই কয় ভাইরে পড়া হল না শেখা।

এ গানটার মধ্যে কিছু আধুনিক বাংলা শব্দ প্রবেশ করেছে বলে সন্দেহ হয়। তবে গানটা যে কবি পাগলা কানাই রচিত তাতে সন্দেহ হবার কারণ নেই, কেননা পরবর্তী কালেও কবি নিজের সম্পর্কে এ ধরনের উক্তি করেছেন। যথাস্থানে গানটা উদ্ধৃত হয়েছে। যাহোক, এ গানের মর্ম থেকে অনুধাবন করা যায় কবি শৈশবে অত্যন্ত দূরন্ত প্রকৃতির বালক ছিলেন এবং তাঁর স্বভাবটাও ছিল পাগলাটে। সেজন্মই বোধ করি শৈশব থেকেই লোকেরা তাঁকে পাগলা আখ্যা দিয়েছে। অবশি পাগলা হলেও কবির অন্তরটা ছিল স্বচ্ছ ও সরল। অন্তরের

প্রতি সহানুভূতি ও দরদে তাঁর অন্তকরণ ছিল পূর্ণ। সেজন্য লোকের কাছে এই দূরন্ত ছেলে বোধ করি খুবই আদরের ছেলে হয়ে উঠেছিল। ‘পাগলা’ আখ্যাটা আমরা সাধারণতঃ অত্যন্ত স্নেহ করে কারো প্রতি আরোপ করে থাকি। কবি পাগলা কানাইয়ের পাগলা আখ্যা এমনি এক স্নেহের উৎস থেকে যে উৎসারিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। হয়তো এই দূরন্ত ছেলে দৈনন্দিন ছুষ্ঠুমির মধ্য দিয়েও কোনো একটা বিশেষ গুণের জন্ম মানুষের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছিল,— আর তারই ফলে লোকে তাকে আদর করে নাম দিয়েছিল ‘পাগলা’। পরবর্তী কালেও লোকের দেয়া সেই ভূষণকে তিনি তুচ্ছ করতে পারেন নি। সাদরে মাথায় তুলে নিয়ে তাঁর সঙ্গীতের মাধ্যমে এই খেতাবের গৌরব ঘোষণা করেছেন। তাঁর আসল নাম যে কি ছিল তা জানা যায়নি।

অবশি চালচলনেও কবি সাধারণ মানুষের মতো ছিলেন না। তাঁর মধ্যে এমন একটা স্বভাবজাত খেলালীপনা ছিল যার জন্ম আপাতঃ দৃষ্টিতে তাঁকে পাগল বলে মনে হতো। শৈশবে যা ছিল খেলালীপনা এবং ছুরন্তপনা পরবর্তী জীবনে তাই তাঁকে এক গভীর ভাবতন্ময়তার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছিল—এবং তা সাধারণ মানুষের চোখে আর এক জাতীয় পাগলামি বলে প্রতিভাত হয়েছিল। সুতরাং তাঁর পাগলা উপাধি শৈশবে যদি স্নেহের ফলে সবাই দিয়েও থাকে তবে তা আর পরিত্যাগ করতে হোল না। সারাজীবনের জন্ম তাঁর জীবনের ভাবনা চিন্তা, চালচলন ও কাজকর্মের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে তা অক্ষুণ্ণ হয়েই রইল। এবং তাই আজ জনমনে অমরতার দাবী নিয়ে বেঁচে রয়েছে। থাকবেও। প্রতিভার পাগলামি মানুষকে এমনি করেই অমর করে রাখে।

যাহোক, কবির জীবনে বিদ্যাশিক্ষা সম্ভব হোল না। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা না করলেও যে প্রতিভার বিকাশ হয় না এমন নয়। সত্যিকার প্রতিভা এমনি একটা জিনিস যা ভেতরে চাপা থাকবার নয়। যে কোন একটা পথ ধরে তার প্রকাশ ঘটবেই। উপযুক্ত সুযোগ পেলে হয়তো তার সার্থক বিকাশ হতে পারে—কিন্তু সুযোগ না পেলেও তা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় না। বিশ্বের প্রতিকূল অবস্থা হয়তো তার বিকাশকে খাটো করতে পারে,—কিন্তু নিমূল করতে পারে না। পৃথিবীর বহু মনীষীর জীবনী থেকে এমন ভুরি ভুরি নিদর্শন দেয়া যেতে পারে। পাগলা কানাইয়ের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।



কবি পাগলা কানাই

৫

তিনি লেখাপড়া শিখেননি,—কিন্তু তাঁর ভেতরে যে স্বভাবজাত কবি-প্রতিভা ছিল তা স্বীয়-শক্তিতেই আত্মপ্রকাশ করেছে। অবশিষ্ট একথা স্বীকার্য যে আমাদের দেশের কবিদের মধ্যে কি মধ্যযুগে কি আধুনিক যুগে ক'জন আর পুথিগত বিচার বা রীতিমাত্তিক লেখাপড়ায় পারদর্শী ছিলেন! কিন্তু কবি পাগলা কানাইয়ের ক্ষেত্রে কথাটা একটু অতীত থেকে চিন্তা করে দেখবার রয়েছে। তিনি যখন গ্রামে গ্রামে ঘুরে গান রচনা করছেন তখন বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার জয়ধ্বজা উড়েছে,—এসেছেন মধুসূদন, বিহারীলাল, বঙ্কিম, মোশাররফ হোসেন, হেমচন্দ্র, নবীন সেন, কায়কোবাদ, অক্ষয় বড়াল, রবীন্দ্রনাথ—কেউ কবির জীবনকালে অতীত হয়েছেন, কেউ বর্তমান। এঁদের কীর্তির মূলে ছিল ভেতরের প্রতিভা-শক্তি এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার আলোক। তাঁদের প্রতিভাশক্তিকে তাঁরা এই অতুল্য মানবমুখী সভ্যতার আলোকে দেদীপ্যমান করে তুলেছেন। অন্যথা এঁরা ছাড়াও এ যুগে এমন অনেক কবি রয়েছেন, আধুনিক শিক্ষা ব্যতিরেকে যাঁদের ভাগ্যে অশিক্ষিত কবিরাম রামজীদাস, হরঠাকুর, ভোলাময়রা, সাতুরায় প্রভৃতির স্থায় কবি হবার গৌরব নিয়েই জীবন শেষ করতে হাত। মধুসূদন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের কথা অবশিষ্ট স্বতন্ত্র। আমি শুধু মাঝারি ধরনের কবিদের কথা এ প্রসঙ্গে বলছি। কবি পাগলা কানাইও যদি তাঁদের মত ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার পূর্ণ আলোকে হৃদয়-মনকে উদ্ভাসিত করতে পারতেন তবে কে জানে তিনিও আধুনিক বাংলা কাব্যের একটা স্মরণীয় শক্তিশালী অধ্যায় রচনা করে যেতেন কিনা। শিক্ষা ছাড়াই তিনি যা দিয়ে গেছেন তা অধ্যায় রচনার গৌরব অর্জন না করলেও স্থায়ীত্বের গৌরব পেয়েছে।

কবিওয়ালার দেশ যশোহর এবং খুলনা। এখানে তারক কাঁড়াল, পাঁচুদত্ত, গোবিন্দ তাঁতি, রূপে পাঠা, হারণ ঠাকুর, হরমোহন, মথুর সরকার প্রভৃতি কবিরাম বিভিন্ন সময়ে তাঁদের কবি গানের ঝংকারে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলেছিলেন। অতীত থেকে রয়েছে নদীয়া এবং বর্তমান পাকিস্তানের কুষ্টিয়া জেলা। এখানে ভারতচন্দ্রের প্রভাব দীর্ঘদিন সাধারণ মানুষের মনে বিরাজমান ছিল। সুতরাং কবি পাগলা কানাই কৈশোরে পদার্পণ করেই দেখলেন চারদিকে সঙ্গীতের এক নিবিড় মুখরতা। এর সাথে কবির হৃদয়ের কথা যেন সুর মিলিয়ে নতুন ভাষা খুঁজে পেলো,—বাইরের সুরঝংকারের সাথে তাঁর মনের বীণার

নিগূঢ় তত্ত্বীতে যে সুর বাঁধা ছিল তা এক অপূর্ব সাজুয়া খুঁজে পেয়ে প্রকাশের আনন্দে ও আবেশে অস্থির হয়ে উঠলো। গ্রামের যে গানের দলটা ছিল তারা জারী গান গেয়ে ফিরতো। তিনি তাতে ভিড়ে পড়লেন। কিছুদিন পালিদোহার হয়ে তাদের সাথে ঘুরলেও তাঁর সত্যিকার রূপ প্রকাশ পেতে বিলম্ব হোল না। তাঁর মুখে মুখে কথা রচনার শক্তি দেখে একদিন সব বন্ধু বান্ধব মিলে তাঁকে আসরে দাঁড় করিয়ে দিল। কবি অবশিষ্ট এতো শীঘ্রই আসরে দাঁড়িয়ে অসংখ্য লোকের সম্মুখে গান রচনার জ্ঞান এতোটুকু প্রস্তুত ছিলেন না। তাই বিপদ গুণলেন। কিন্তু খঞ্জুনি হাতে নিয়ে চপেটাঘাত করতেই অল্পভব করলেন কি যেন এক শক্তি তাঁর ওপর ভর করেছে—ভেতরের সকল কথা যেন সুর হয়ে বেরিয়ে আসবার জ্ঞান তাঁর রসনার অগ্রভাগে ভিড় করেছে—। সলজ্জ, সনয়ন অথচ আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনির্ভরতায় সুউজ্জ্বল মুখভার নিয়ে কবি এগিয়ে এলেন—

সালাম সালাম সালাম রাখি দশের পায়

পরলা সালাম করি আমি খোদার দরগায়

তারপর সালাম করি নবীজিরে

যিনি গুর্যা আছেন মদিনায়

ওরে সালাম করি ওস্তাদের আর সালাম পিতা-মাতায়

অধম আমি পাগলা কানাই আল্যাম চাঁদ সভায়

আল্লা তরাও হে আমায়।

কবিকে আর অগ্রসর হতে হোল না। চারদিক থেকে সাবাস সাবাস বলে সবাই অভিনন্দন জানাতে লাগলো। কবির সাথীরা তাঁকে মাথায় তুলে নিয়ে নাচতে লাগলো। কবির ওস্তাদ আসরের এক ধারে বসে মৃদু মৃদু হাসছিলেন আর শিষ্যের গৌরবে তাঁর বুক দশহাত ফুলে উঠছিল যেন। শেষে ধীর মন্থর গতিতে ওস্তাদ পাগলা কানাইয়ের কাছে এসে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন—‘গানের জগতে জীবনে চিরদিন তুমি বিজয়ী হবে—তোমার আর ওস্তাদের প্রয়োজন নেই—তুমি নিজেই তোমার নিজের ওস্তাদ।’ ওস্তাদের এ কথাগুলো পাগলা কানাইয়ের জীবনে পরবর্তী কালে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। জীবনে তিনি তাঁর সম-সাময়িক কালে অপ্রতিদ্বন্দ্বী সঙ্গীত রচয়িতা হিসেবে প্রায় সারা বাংলায় বিপুল সম্মান ও খ্যাতির অধিকারী



হয়েছিলেন। যতদূর জানা গেছে যশোরের কেশবপুর থানার অন্তর্গত রত্নসপুর গ্রামের গ্রাম্যব্যাতি নয়ান ফকির পাগলা কানাইয়ের ওস্তাদ ছিলেন। কবির একটা মাত্র গানে (রামায়ণ কাহিনী) ‘ওস্তাদ আমার ফকির নয়ান সভায় দিলাম পরিচয়’ এই উক্তি আছে—এ ছাড়া কোথাও গুরুর নাম করেন নি তিনি। ছ’একজন ভক্তের নাম তিনি তাঁর গানে উল্লেখ করেছেন—কিন্তু ওস্তাদের কথা কিছু বলেন নি। বোধকরি সঙ্গীত সাধনায় কবিকে খুব বেশি করে ওস্তাদের ওপর নির্ভর করতে হয়নি—ভেতরের শক্তি তাঁকে প্রথম থেকেই নিজের পারে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। অবশিষ্ট মুরশিদ-ভক্তি মূলক গান তাঁর যে নেই এমন নয়—তবে মুরশিদ-সর্বস্ব মন তাঁর ছিল না।

যাহোক, এ ঘটনার পর থেকেই কবি পাগলা কানাই আসরে দাঁড়িয়ে সঙ্গীত রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। ঘরে তিনি মন বসাতে পারলেন না। হৃদয়ের আহ্বান তাঁকে ব্যাকুল করে তুললো। তিনি বেরিয়ে পড়লেন। সারা যশোহর জেলা ঘুরে ঘুরে নিজের সঙ্গীত প্রচার করলেন—তবু মনের তৃষ্ণা মিটলোনা। এলেন ফরিদপুরে, কুষ্টিয়ায়। যেখানে গেলেন কোথাও কবির সমাদরের ঘাটতি পড়লো না। অবশেষে পাবনায় এসে কবি আরো উৎসাহে উদ্ভুদ্ধ হয়ে উঠলেন। দেখলেন অসংখ্য সঙ্গীত-পিপাসু ভক্ত জনতা যেন তাঁরই মত একজন সাধক সঙ্গীতজ্ঞের জন্ম এতোদিন হোল পথ চেয়ে বসে আছে,—কবি আর তাদেরকে এড়িয়ে যেতে পারলেন না। এখানেই তাঁর এক মনের মানুষ খুঁজে পেলেন—তিনিও কবির মত খেয়ালী রাজার মানুষ—তিনিও কবি। দুজনে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো এবং জীবন তাঁদের এ সখ্যতা অক্ষুণ্ণ ছিল। ইনিই পাবনা জেলার বিখ্যাত ভাবুক কবি ফকির আলীমুদ্দিন। এঁর জন্মস্থান ও জীবন কাহিনী এখনো উদ্ধার করতে পারিনি। সম্ভবতঃ বেড়া বা সাথিয়া থানার লোক ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর অনেকগুলো গান পাবনাতে পাওয়া গেছে। কবি পাগলা কানাই পাবনা জেলায় দীর্ঘদিন বাস করেছেন।

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমায় তাঁর অসংখ্য শিষ্য এবং ভক্তের স্মৃতি হয়েছিল। এদের মধ্যে কামারখন্দ থানার বারুপুর নিবাসী মনুহর এবং ত এবং কালিয়া হরিপুর গ্রামের জহিরদ্দিনের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

কবি মথুরম ও জহিরদ্দিনকে এতো স্নেহ করতেন যে দীর্ঘদিন তাঁদের বাড়ীতে তিনি বাস করেছেন, এ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। উক্ত দুই গ্রামবাসীদের অনেকেই একবাক্যে আমার কাছে তা বলেছে। জহিরদ্দিন ছিল কানাইয়ের অত্যন্ত ভক্ত শিষ্য। মথুরম কবির শেষ বয়সের শিষ্য—কিন্তু জহিরদ্দিন কবির যৌবন কালেই তাঁর ভক্ত হয়ে সঙ্গ নিয়েছিল। কানাইয়ের কয়েকটা গানে জহিরদ্দিনের নাম আছে। জহিরদ্দিনের কয়েকটা গান আমি সংগ্রহ করেছি। সেখানে কানাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধায় তার মন যে কত নম্র তা বুঝতে পারা যায়। কবি জহিরদ্দিনের বাড়ীতে বেশ কিছুদিন ছিলেন বলে জানা যায়। জহিরদ্দিনের একটা গান হারামণি ২য় খণ্ডে উদ্ধৃত হয়েছে,—কানাইয়ের প্রভাব সেখানেও চোখে পড়বে—

আমি কেমন করে করব বল সত্য সাধন  
আমায় সদাই চঞ্চল করে রিপু ছয়জন  
যোলজন করে ঝগড়া, ভেঙ্গে দিল সোনার আখড়া  
দেহের মধ্যে মানুষ মাকড়া তারে চিনলাম না  
সত্যতে উৎপত্তি ধর্ম, রাজ্য যুধিষ্ঠির তার জানে মর্ম  
জহিরদ্দিন বৃথা জন্ম ধর্ম চিনলাম না।

গানটা জহিরদ্দিনের নামে হলেও পাগলা কানাইয়ের রচনা বলে সন্দেহ হয়। যাহোক, পাবনাতে কবি যে বেশ কিছুদিন ছিলেন সে প্রসঙ্গেই তাঁর এই দুজন ভক্ত শিষ্যের পরিচয় দিলাম। এ ছাড়াও এ জেলায় তাঁর ভক্ত ঘরে ঘরে ছিল এবং এখনও আছে। শোনা যায় তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে পাবনা জেলার শাহজাদপুর থানার বনগ্রাম সন্তাবাদ গ্রামাঞ্চলের একজন পরমা সুন্দরী ব্রাহ্মণ কন্যা কবিকে ভালবেসে ফেলেন। কবি এ প্রেমকে অস্বীকার করেন নি। তিনি মেয়েটিকে বিয়ে করেন। এ নিয়ে এক বিরাট গোলমালেরও সৃষ্টি হয়েছিল,—কিন্তু কবির অসংখ্য ভক্ত গোষ্ঠীর সাহায্যে কবি সব বাধা বন্ধন অতিক্রম করতে সমর্থ হন। সম্ভবতঃ এই রমণীর কাছ থেকেই কবি সংস্কৃত সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান সঞ্চয় করেন। ব্যাপারটা কত দূর সত্য জানি না। কিন্তু এ ধরনের একটা গল্প শাহজাদপুর অঞ্চলে প্রচলিত আছে। হয়তো তা গল্পই শুধু।

এরপর ধীরে ধীরে কবির খ্যাতি সারাবাংলার ছড়িয়ে পড়লো। খুলনা যশোহর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, বগুড়া, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলার নানা স্থান থেকে কবির ডাক পড়লো। কবিও ব্যাপকভাবে সাড়া দিলেন। তাঁর যৌবন-প্রৌঢ়-বার্দ্ধক্য বিজড়িত সুখ-দুঃখের দিনগুলো এসব জেলায় গান গেয়ে তিনি অতিবাহিত করলেন। বিখ্যাত কবি লালন শাহ ফকির যখন কুষ্টিয়াতে তাঁর আধ্যাত্মিক গানগুলো রচনায় ব্যস্ত, পাগলা কানাই তখন তাঁর জারী ও দেহতত্ত্বমূলক গানগুলো গেয়ে বাংলার এক বিরাট অংশ মথিত করে ফিরছিলেন।

কবি পাগলা কানাইয়ের পিতার নাম ছিল কুড়ান শেখ। উজল শেখ নামে কবির এক ভাই ছিল। কবি সম্ভবতঃ কিছুদিন যশোহরের আঠারখাদা নিবাসী চক্রবর্তীদের বেড়বাড়ীস্থ নীলকুঠিতে খালাসী হিসেবে কাজ করেন। এসম্পর্কে যশোহর খুলনার ইতিহাস লেখক সতীশচন্দ্র মিত্র লিখেছেন “কানাই প্রথম জীবনে আঠারখাদার চক্রবর্তীদের বেড়বাড়ীস্থ নীলকুঠিতে দুই টাকা বেতনে খালাসী (চাপরাশী) ছিলেন। তাঁহার বংশ বা অশ্রু গোঁরব ছিল না, থাকিবার মধ্যে ছিল হৃদয়ে কবিত্ব, মুখে মিষ্টি কথা, কণ্ঠে পাপিয়ার সুর আর চরিত্রের অপূর্ব বিনয়শীলতা। তাঁহার হিন্দু মুসলমান ভেদজ্ঞান ছিল না, সর্বত্র সম-দৃষ্টি ছিল। কানাই দেহতত্ত্ব সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত। মরণ-রহস্য, আত্মতত্ত্ব তাঁহার বেশ পরিজ্ঞাত ছিল। সহজ সরল গ্রাম্য ভাষায় উহার অপূর্ব বিকাশ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।” পাগলা কানাই প্রথম জীবনে চাকুরী গ্রহণ করলেও চাকুরী তাঁর পোষায়নি। গানের যাদুশক্তি তাঁকে কোথাও স্থির হয়ে বসতে দেয়নি। তিনি বিশ্বের বিস্তৃত আলোকে ছুটে বেরিয়ে পড়বার এক বিপুল সাড়া তাঁর অন্তরের অন্তস্তল থেকে অনুভব করতে পেরেছিলেন। অধীনতার নাগপাশে ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর মধ্যে চাকুরীর বন্ধনকে স্বীকার করে আবদ্ধ থাকা তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তখনকার গরীব পরিবারে মাসিক দু’টাকার মূল্য কম ছিল না, কিন্তু অর্থের মায়া এই বিষয়-নির্লিপ্ত উদাসী উদ্ভ্রান্ত ভাবুক মানুষটাকে বেঁধে রাখতে পারেনি। চাকুরী ছাড়লেন এবং বেরিয়ে পড়লেন তিনি। ছুটলেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। বসন্ত-কোকিলের মতো সঙ্গীত লহরী ছড়িয়ে দিলেন দিগ্বিদিকে—যেখানে গেলেন বিপুল ভক্ত-গোষ্ঠী গড়ে উঠলো তাঁর। এ প্রসঙ্গে অগাধ সব জেলার কথা উল্লেখ

করেছি—তবে বিশেষ করে ফরিদপুর জেলার কথা উল্লেখ না করলে কবি-জীবনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। পাবনা জেলায় যেমন কবির জীবনের এক বিরাট অংশ অতিবাহিত হয়েছে—তেমনি ফরিদপুর জেলায়ও তিনি বহুদিন বসবাস করেছেন। এই জেলায় এখনো কবির বহু গান লোকমুখে প্রচলিত রয়েছে। জনাব অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন সাহেব ফরিদপুরের চরটেপাকোলা নিবাসী বয়াতি মঙ্গল প্রামাণিককে একবার ঢাকায় নিয়ে আসেন। এই গ্রাম্য বয়াতি পাগলা কানাইয়ের প্রচুর গান জানেন। তাঁর কাছে পাগলা কানাইয়ের বেশ অনেক ক’টি গান শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

তার কাছেই শুনেছি ফরিদপুরের লোকেরা পাগলা কানাইকে ফরিদপুরের মানুষ বলেই বিবেচনা করে। এই যে যশোহর, ফরিদপুর, খুলনা, কুষ্টিয়া, পাবনা প্রভৃতি প্রত্যেকটি জেলার লোকেরা কবিকে নিজ নিজ অঞ্চলের মানুষ বলে মনে করে আসছে এর মূল্য কম নয়। একজন নিরঙ্কর গ্রাম্য কবির পক্ষে কতবড় কবিত্বশক্তি ও প্রতিভা থাকলে তবেই এতো বিরাট অঞ্চল জুড়ে অসংখ্য মানুষের মনে স্থায়ী আসন লাভ করা সম্ভব তা ভেবে দেখবার বিষয়। কবি শুধু জনপ্রিয় ছিলেন না—তাঁর ভেতরে প্রতিভার দুর্বীর চঞ্চলতা তাঁকে বার বার অস্থির করে তুলেছে। তিনি একস্থানে বেশিদিন থাকতে পারেননি—কোথাও স্থির হয়ে নীড় বাঁধবার আয়োজন সমাপ্ত হতে হতেই অন্তর থেকে আহ্বান এসেছে, ‘হেথা নয়, হেথা নয়, অতঃ কোথা অতঃ কোনখানে।’ এযুগের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ এই চঞ্চলতা, এই স্রূরের প্রতি ব্যাকুলতা এক বিস্ময়কর অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে—

আমি চঞ্চল হে

আমি স্রূরের পিয়াসী।

## ॥ পাগলা কানাইয়ের সম্ভাব্য সময় ॥

পাগলা কানাই সম্পর্কে সম্ভবতঃ আমিই প্রথম বিস্তারিত আলোচনা করি দৈনিক আজাদ—( ১৩৫৯ সালের ১৫ই চৈত্র রবিবার, ২৯ শে মার্চ, ১৯৫৩ ইং ) ও মাসিক মাহেনও ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যা ) এ। আমার পূর্বে কবি সম্পর্কে পূর্ণ আলোকপাত কেউ করেননি। যারা করেছেন তাঁদের হাতে তথ্যও বিশেষ ছিল না। আমার উক্ত আলোচনাগুলোতে আমি কবির সম্ভাব্য জন্ম সময়ের কথা বলেছিলাম ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। বর্তমানে আমি কবির প্রচুর গান ও তাঁর সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য সংগ্রহের পর আমার উক্ত মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছি। কবির কয়েকটা গানে সন তারিখের উল্লেখ আছে। সে আলোচনা পরে করছি। পূর্বে প্রত্যক্ষ দর্শীর বিবরণ থেকে কবির আবির্ভাবকাল সম্পর্কে অবহিত হতে চেষ্টা করা যাক। বাং ১২৮৭ সাল ও ইংরেজী ১৮৮০।৮১ খ্রীষ্টাব্দে কিংবা তার খুবই কাছাকাছি সময়ে কুষ্টিয়ার কুমারখালি নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কাঙাল হরিনাথের সাহিত্য-শিষ্য ও কাঙাল ফিকির চাঁদ বাউল দলের সভ্য জনৈক কথক ফরিদপুর জেলায় এক কৃষি প্রদর্শনীতে গান করতে যেয়ে পাগলা কানাইকে চাক্ষুস দেখেছেন ও তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। এ বর্ণনা আমরা পাব জলধর সেন রচিত কাঙাল হরিনাথ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ( পৃঃ ৪২ )। নিম্নে উদ্ধৃত সেই উক্তি থেকে কবির সময় সম্পর্কেই যে ধারণা পাওয়া যাবে তা নয়—কবির প্রভাব যে কি রকম ব্যাপক ও হৃদয়স্পর্শী ছিল তাও বুঝতে পারা যাবে, “পাগলা কানাইয়ের নাম কলিকাতা অঞ্চলের লোক না জানিতে পারেন কিন্তু এক সময়ে পাগলা কানাইয়ের গানে যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা ও নদীয়া জেলার অংশ বিশেষ ভাসিয়া গিয়াছিল। পাগলা কানাইয়ের গান শুনিবার জন্ত এক এক সময় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুমুসলমান এক স্থানে সমবেত হইত। এক দিনের পথ হাঁটিয়া লোকে পাগলা কানাইয়ের গান শুনিতে আসিত। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন পাগলা কানাই বৃদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তখনও তাহার গলার এমন আওয়াজ ছিল যে পঞ্চাশ হাজার লোকের

মধ্যে দাঁড়াইয়া গান করিলেও সকলে তাহার গান শুনিতে পাইত। আমরা (অর্থাৎ জলধর সেন ও তাঁর সঙ্গীরা) ফরিদপুর উপস্থিত হইয়া শুনিলাম যে, যে সময়ে গান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার পূর্বে অর্থাৎ মধ্যাহ্ন বারটার সময়ে পাগলা কানাইয়ের গান আরম্ভ হইবে। কাঙ্গাল (কাঙ্গাল হরিনাথ, কুষ্টিয়া) বলিলেন ‘তোরা তো সে গান শুনিস নাই, কানাইয়ের গান শুনিলে লোকে পাগল হইয়া যায়।’ আমরা বেলা বারটার সময় মেলার মাঠে যাইয়া দেখি যে, সে এক আশ্চর্য দৃশ্য! অনুমান ত্রিশ হাজার হিন্দু মুসলমান কানাইয়ের গান শুনিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। একটু পরেই মাথায় লম্বা লম্বা চুলওয়ালা দশ বারজন লোক কানাইকে সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। জন সঙ্ঘের মধ্যে হিন্দুগণ ‘হরিবোল’ এবং মুসলমানগণ ‘আল্লা আল্লা’ ধ্বনি করিয়া তাহাদের অভ্যর্থনা করিল। সে যে কি আনন্দ, সে যে কি উন্মাদনা তাহা আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। যাহারা গান করিতে আসিয়াছে তাহাদের জন্য মাঠের মধ্যে একটি কাঠের মঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল, তাহারই উপর দাঁড়াইয়া গান না করিলে কানাইকে কেহ দাঁখিতে পারিবে না বুঝিয়াই কতৃপক্ষ এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কানাই ও তাহার দলের লোকেরা মঞ্চের উপর আরোহণ করিল। প্রত্যেকের হাতে একখানি করিয়া খঞ্জনী, আর কোন বাদ্য নাই।

“একটু পরেই তাহারা গান আরম্ভ করিল। এই যে ত্রিশহাজার লোক, ইহারা মন্ত্রমুগ্ধের মত গান শুনিতে লাগিল। তাহারা যে কয়টি গান গাহিল সমস্তই অনিত্যতা সন্মুখে। আমরা অবাক হইয়া এই দশটি লোক ও বৃদ্ধ কানাইয়ের সুরবাজি সুরের খেলা শুনিতে লাগিলাম। ধন্য আওয়াজ, ধন্য শিক্ষা! আমি সে গানের বর্ণনা করিতে পারিলাম না, যাহারা পাগলা কানাইয়ের গান শুনিয়াছেন তাঁহারাি আমার কথা বুঝিতে পারিবেন।”

উপরোল্লিখিত ঘটনা ঘটেছিল ১৮৮০।৮১ খ্রীষ্টাব্দে (১২৮৭ সনে) অথবা তার দু’এক বছর আগে বা পরে। কবি যে সে সময় বৃদ্ধ তা উক্ত উক্তিতে ধরা পড়েছে। পাগলা কানাই দীর্ঘজীবী ছিলেন একথা আমরা জানি—তাঁর গানেও অতিবৃদ্ধ বয়সের বর্ণনা আছে। তা ছাড়া সে সময় অতিবৃদ্ধ অর্থে ৭০।৭৫ বছরের কম সাধারণতঃ লোকে ভাবতো না। সুতরাং কবির বয়স

যদি তখন ৭০ বছর ধরা যায় তবে তাঁর জন্ম সময় ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে যেয়ে পড়ে।

আর একজন প্রত্যক্ষ দর্শীর বিবরণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ না করে পারছি না। সন ১২৯০ সালে (১৮৮৪ খ্রীঃ) পাবনা জেলার অন্তর্গত গাঁড়াদহ (উল্লাপাড়া স্টেশন ছেড়ে দু' মাইল দক্ষিণে) গ্রামের ক'জন হিন্দু জমিদার মিলে একটা হাট প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম হাট লাগবার দিনে বিরাট জাঁকজমক করা হয়েছিল এবং এই উপলক্ষে কবি পাগলা কানাইকে নিয়ে আসা হয়েছিল। হাটটা প্রতিষ্ঠিত হয় গাঁড়াদহেরই একটা পাড়া চকিদহে (>চহিদহ>চইদহ)। কবির গানে এর উল্লেখ আছে। কবিকে দেখতে ও তাঁর গান শুনে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়েছিল। সে সব লোকের দু'একজন ছাড়া কেউ-ই আর এখন বেঁচে নেই! তবে একজন লোক বছর তিনেক আগেও বেঁচে ছিলেন—তিনি উক্ত গাঁড়াদহের সন্নিকটস্থ চরনবীপুর গ্রামের মাতুউল্লা প্রামাণিক। প্রায় পঁচাশি-নব্বই বছর বয়সে তিন বছর পূর্বে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তিনি পাগলা কানাইয়ের গানের আসরে উপস্থিত ছিলেন—তখন তাঁর বয়স ১৪।১৫ বছর। এ সময় কবির বয়স ছিল কমপক্ষে ৭০।৭৫ বছর একথাও মাতুউল্লা প্রামাণিক অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন। এবং এই গান গেয়ে ফিরবার পথে কবির পায়ে কাঁটা বিধে যে তিনি খুব কষ্ট পান তাও তাঁর মুখে শুনেছি। কবির গানেও এর উল্লেখ আছে—

জ্যৈষ্ঠ মাসের পাঁচই রে ভাই তারিখ বুধবার

আমি পাবনা জেলার গ্রামে গেলাম নতুন হাট উঠাইবার

আবার ফিরবার সময় চোরা কাঁটা

--চুকল আবার পায়ের ভিতর

আমার সঙ্গে ছিল চইদর মাজন

আমি প'লাম জমির পর--ও কাঁটা টান দিয়া খসায় আর

আবার চা'র আঙ্গুল ঢুকেছে কাঁটা ও ভাই সকল

ও আমার প্রাণে বাঁচা ভার॥

উক্ত প্রত্যক্ষদর্শীর কথা ও কবির উক্তি এ দুটোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত মিল দেখা যাচ্ছে। সুতরাং কবি যে ১৮১০।১৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে জন্মেন তা



প্রমাণিত হয়। এই ঘটনার পর কবি আট-দশ বছরের বেশী যে বাঁচেননি উক্ত মাতুউল্লা প্রামাণিক সে কথাও বলেছেন। এ হিসাবে কবির মৃত্যু-সময় ১৮৯০।৯৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ধরতে হয়। উক্ত ঘটনার আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শী পাবনা জেলার চরনবীপুর গ্রামের জয়নাল আখন্দ। তিনি এখনও বেঁচে আছেন এবং কবির বহু গান দিয়ে আনাকে সাহায্য করেছেন। এঁর বয়স এখন ৮২।৮৪ বছরের মতো। তিনি কবির গান শুনে গিয়েছিলেন তাঁর চাচার সাথে--বয়স তখন তাঁর ৭।৮ বছর। সে ঘটনার কথা তাঁর মনে এখনো আবছা স্মৃতির রেশ ধরে বেঁচে আছে। তবে এই জয়নাল আখন্দের বয়স যখন ১৬।১৭ বছর তখনই তিনি কবির মৃত্যু-খবর শুনে মর্মাহত হয়েছিলেন এ জন্য যে তিনি কবির একজন ভক্ত হয়েও কবিকে আর দেখবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন নি। এ হিসেবেও কবির মৃত্যু সময় ১৮৯০।৯৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে পড়ে।

এ প্রসঙ্গে আরও একজন প্রত্যক্ষদর্শীর কথা আমার মনে পড়ছে। বিগত ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা কলেজে অধ্যাপনার সময় আমি কলেজের অধ্যাপকদের মজলিসে পাগলা কানাই সম্পর্কে একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম। উক্ত সভায় অধ্যাপক ওয়াহেদ বক্স সাহেব (বর্তমানে অধ্যক্ষ, বগুড়া কলেজ) আমার প্রবন্ধপাঠ শেষে দাঁড়িয়ে বলেন যে তিনি তাঁর জৈনিক আত্মীয়ের কাছে কবির বর্ণনা শুনেছেন। তাঁর সে আত্মীয় বেঁচে থাকলে বর্তমানে তাঁর ৯০।৯৫ বছর বয়স হোত। উক্ত ব্যক্তির বয়স যখন ১৫।২০ বছর তখন বগুড়ায় অধ্যক্ষ সাহেবদের গ্রামের নিকটে পাগলা কানাইয়ের গানের আয়োজন করা হয়। প্রায় পঞ্চাশ হাজার লোক এখানে গান শুনে উপস্থিত হয়। কবি সে সময় বৃদ্ধ ব'লে পাল্‌কীতে চলতেন। গান আরম্ভ হবার কথা ছিল বিকেল ৩টা ৪টার দিকে। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ কবি পাল্‌কীতে করে ৫টার দিকে উপস্থিত হলেন। হাজার হাজার লোক অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। কবিকে দেখে সবাই আত্মহারা হয়ে পড়লো। কিন্তু আয়োজন কর্তারা কবির এ বিলম্ব সহজ ভাবে সহ্য করতে পারল না। এদের মধ্যে একজন ছিল জমিদার শ্রেণীর। সে কবিকে পাল্‌কী থেকে নামবার সাথে সাথে ক'টা কড়া কথা শুনিয়ে দিল। শাস্ত-প্রশান্ত দৃষ্টিতে, সহাস্ত মুখভঙ্গীতে হাত দিয়ে

অসংখ্য প্রতীক্ষিত জনতাকে সালাম জানিয়ে কবি পালকী থেকে ধীর পাদ-  
বিক্ষেপে নেমে এলেন। নেমে দাঁড়িয়ে বিম্মিত দৃষ্টিতে তিনি আয়োজন কর্তা  
উক্ত জমিদারের দিকে তাকিয়ে তার কড়া কথাগুলো শুনলেন এবং কোন  
জবাব না দিয়ে স্মিতহাস্তে আবার পালকীতে প্রবেশ করে বেহারাদের হুকুম  
করলেন, ‘চল ভাই চল, এখানে আর একদণ্ডও না।’ জমিদার ভুল বুঝতে  
পারলো—আয়োজন কর্তারা জোড় হাতে এগিয়ে এলো—সমস্ত লোকেরা কবির  
পালকী ঘিরে অনুরোধ করলো—কিন্তু কবি শুধুই ‘মাফ কর, মাফ কর’ উচ্চারণ  
করতে করতে জনতার মধ্য থেকে বেরিয়ে তাঁর গন্তব্য স্থানে চলে গেলেন।  
গান গাওয়ার জন্তু কবির সাথে ছশো টাকার অঙ্গীকার হয়েছিল—আয়োজন  
কর্তারা কবির অনমনীয় মনোভাব দেখে আরো ছশো টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি  
দিল। কবি টাকার অঙ্ক শুনে শুধুই একবার বলেছিলেন—‘ছই হাজার দিলেও  
কানাই থাকবে না’। তখনকার দিনে ২০০।৪০০ টাকার মূল্য কম ছিল না।  
কিন্তু কবির কাছে টাকার চেয়ে আত্মসম্মান ছিল অনেক বড়। কবির  
জীবনে অর্থকষ্ট প্রচুর ছিল, শেষ বয়সে তিনি অর্থাভাবে খুব কষ্ট পেয়েছেন,  
মাবো মাবো সামান্য ব্যবসায় কঠোর পরিশ্রমে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়েছে  
তাঁকে, কিন্তু অর্থের মোহ (যা আজ কাল প্রায় সবার জীবনে প্রধান)  
কবিকে কোন দিনও হৃদয়ের মহত্তর বৃত্তি বিক্রয় করে বেঁচে থাকবার  
প্রেরণা দেয় নি।

যাহোক, এখানেও প্রত্যক্ষদর্শীর বয়স ও সময় বিবেচনা করলে কবির জন্ম  
১৮১০।১৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে এবং মৃত্যু ১৮৯০।৯৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ধরতে হয়।  
কবির কয়েকটা গানেও সন তারিখের উল্লেখ আছে। নিয়ে শুধু সেই লাইন-  
গুলো তুলে দিচ্ছি—

- ১। সন ১২৭৮ সালে ৫ই আশ্বিন উঠলো উদ্গতি
- ২। সন ১২৮০ সনে বাঁধছে বিষম খরা
- ৩। সন ১২৮৪ সাল জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে

পাবনা হচ্ছে বারোয়ারী শোন তাই বলি  
কতই লোকে দিচ্ছে বাহার।

287

এখানে প্রথমে উল্লিখিত গানে ঝড়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে এবং সেই ঝড়ে কবি তাঁর দলবল নিয়ে নদীতে ডুবেছিলেন, একজন শিষ্য মরেছিল এবং কবি বহুকষ্টে উদ্ধার পেয়েছিলেন ইত্যাদি বর্ণনা আছে। Bengal District Gazetters. ( Pabna )-এ এ সম্পর্কে বর্ণনা আছে—“On the 20th September, 1872 a Severe cyclone swept over a few districts and lasted from 11 A. M. till nightfall. In this space of time it caused widespread destruction.” (Page 46). কবি সম্ভবতঃ পাবনার কোথাও গান করতে গিয়েছিলেন—ফিরবার পথে পদ্মায় বা কোন নদীতে এই বিপদে পড়েন।

দ্বিতীয় গানে ১২৮০ সনের ( ১৮৭৪ খ্রীঃ ) বিখ্যাত অনাবৃষ্টির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই অনাবৃষ্টির ফলে ইতিহাস বিখ্যাত দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। কবি দুর্ভিক্ষের কথা স্পষ্ট বলেন নি—তবে তাঁর গানের বর্ণনায় এ সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়—‘মরব বলে খাই পচা ঝরা।’ কবির উল্লিখিত “বিষম খরা” ও “ক্ষেতের শস্য যায় শুকায়া ধান পাটের কর্মসারা” এ উক্তির সমর্থন ১৮৭৮-৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্টে মিলবে, “The monsoon of 1873 was not abnormal during the 3 months June, July and August, but in Northern Bengal it ceased prematurely in September ; and much of the winter rice crop, which ripens in November, was consequently lost (Report of the Famine Commission of 1878:80, Part 1 ) এ সম্পর্কে তদানীন্তন বাংলার লর্ড সার জর্জ ক্যাম্পবেল লিখেছেন “The rainy season of 1873 commenced late and rather scanty, but during July and August the rain was sufficient for agricultural operations, and the earlier and drier crops were got in and grew. But after that the rains failed more suddenly and completely than had been known in the present century, and the effect on the main rice-crops over great tracts was most disastrous.”—(Bengal under the Lieutenant-Governors—P 558).

সুতরাং কবির উক্তি যে মিথ্যা নয় তা প্রমাণিত হচ্ছে।

কবির তৃতীয় উক্তিতে তিনি যে ১২৮৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে (১৮৭৮ খ্রীঃ) পাবনায় বারোয়ারী মেলা উপলক্ষে এসেছিলেন (তাকে আনা হয়েছিল) তার উল্লেখ রয়েছে। সম্ভবতঃ ওমরচন্দ্র রায় নামক কোন এক ব্যক্তি এই মেলার আয়োজন করেন। এ সম্পর্কে কোন গ্রন্থে কোন উল্লেখ পাওয়া গেল না।

জনাব অধ্যাপক মনসুরউদ্দিন সাহেব ১৩৬২ সালের চৈত্র সংখ্যা মাসিক মোহাম্মদীতে বলেছেন “তিনি (পাগলা কানাই) সম্ভবতঃ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। খুব সম্ভব তিনি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।” কিন্তু তাঁর এই উক্তির সাথে তাঁর সংগৃহীত গানে উল্লিখিত সন তারিখের যে এক বিরাট অসামঞ্জস্য ঘটেছে সেদিকে বোধ করি তিনি নজর দেননি! তাঁর সংগৃহীত গানের ৩৩ সংখ্যক গানে (মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩ সাল) রয়েছে “সন ১৩৩৩ সনে “বাঁধছে বিষম খরা” —এ হিসেবে ১৩৩৩ সাল অর্থাৎ ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দেও যে কবি গান রচনা করেছেন তা বুঝতে পারছি। তবে তিনি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মরেন কি করে? অধ্যাপক সাহেবের মতে “তিনি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন” আবার ইদানীং কালের সারদা আইন সম্পর্কে গানও লিখেন— “পাগলা কানাই কয় সভায় এসে নতুন কথা করি বর্ণনা

নতুন আইন হচ্ছে জারী হয় কি করি ঐ দুঃখে প্রাণ বাঁচে না।”

—মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ, ১৩৬৩ সাল, পৃঃ ৯০৭।

এ ছাড়াও অধ্যাপক সাহেব কবিকে মেরে বাঁচিয়ে রেখেছেন ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে যখন সাড়ার পুল তৈরী হয়ে গেছে এবং কবি সে সম্পর্কে গান লিখেছেন—

বান্দে ঘাটে সাড়ার পুল—সাহেব হইছে নামাককুল

আবার মেম সাহেবের বুদ্ধি ভারী

টানে চালায় রেলের গাড়ী

জলে চালায় ইষ্টিমার

সন্নিভরে তার টানাইয়া করতেছে হেকমতের কারবার।

শুধু যে পুল প্রস্তুতের আয়োজন চলছে তা নয় পুল যে দাঁড়িয়ে গেছে সে কথাও কবি বলেছেন—

‘চারমুড়া চার চুঙ্গী গাড়া পুল করিল খাড়া

—দেখতে খুব চমৎকার।’

(মাসিক মোহাম্মদী, শ্রাবণ, ১৩৬৩ সাল, গান নং ৭১, পৃঃ ৯০৯)

সাড়ার পুল নির্মাণের জন্ত প্রথম ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে একটা কমিটির ওপর স্থান নির্বাচনের ভার অর্পিত হয়। অবশেষে কাজ চলতে চলতে ১৯১৪ অব্দের শেষে পুল সমাপ্ত হয়। প্রথম “১৯১৫ অব্দের ১লা জানুয়ারী মধ্যে ডাউন মাল গাড়ীর লাইন খোলা হয়। যাত্রী গাড়ী খুলিবার এক সপ্তাহ পূর্বে ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আগে মালগাড়ী লাইন খোলা হয়। সর্বশেষে ৪ঠা মার্চ তারিখ লর্ড হার্ডিঞ্জ সাহেব বাহাদুর কর্তৃক এই ব্রীজের উপর যাত্রী গাড়ী চলাচলের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে।”

(পাবনা জেলার ইতিহাস ১ম খণ্ড—শ্রীরাধারমণ বিশ্বাস—পৃঃ ১০৮)

১৯১৪/১৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা দূরে থাক ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দেও যে পাগলা কানাই জীবিত ছিলেন না এ সম্পর্কে পূর্বোল্লিখিত প্রমাণাদি ছাড়াও আর একটা অত্যন্ত সত্য প্রমাণ দেয়া যেতে পারে। সন ১৩১২ সাল অর্থাৎ ইং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে শ্রীতর্গাদাস সম্পাদিত “বঙ্গালীর গান” গ্রন্থটা প্রকাশ পায়। এতে পাগলা কানাইয়ের কয়েকটা গান স্থান পেয়েছে এবং কবির পরিচয় প্রসঙ্গে সম্পাদক স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে কবি বেশ কিছু কাল হোল গত হয়েছেন। এ সব দিক বিবেচনা করে কবির সন তারিখ সম্পর্কে জনাব অধ্যাপক মনসুরউদ্দিন সাহেবের উক্তির ওপর কিছুটা নির্ভর করতে পারলেও বিরাট অসামঞ্জস্যকে অস্বীকার করা যায় না। বলা বাহুল্য সারদা আইন ও সাড়ার পুল সম্পর্কে অধ্যাপক সাহেবের সংগৃহীত গান পাগলা কানাইয়ের রচিত নয়। অন্য লোকের গান অধ্যাপক সাহেব অনবধানতা বশতঃ উদ্ধৃত করে থাকবেন। তবে অনাবৃষ্টি সম্পর্কে লিখিত গানটা কবির লিখিত এবং আমার সংগৃহীত গানে তার যথার্থ রূপ রয়েছে। সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সুতরাং কবির জন্ম মৃত্যুর সম্ভাব্য সময় যুক্তিতর্কের সাহায্যে আমি যা উল্লেখ করেছি তা যথার্থ না হলেও সত্যের সর্বাপেক্ষা কাছাকাছি বলে মনে করা যেতে পারে। কবি ১৮১০ থেকে ২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৯০/৯৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে পরলোকগমন করেন।

## ॥ পাগলা কানাইয়ের নাম ও ধর্মমত ॥

কবির নাম দেখে তাঁকে হিন্দু মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এধরনের নাম তাঁর বংশে অপরিচিত ছিল না। তাঁর পিতার নাম ছিল কুড়ান (কোরবান) শেখ এবং ছোট ভাইয়ের নাম ছিল উজল শেখ। এই উজল শেখ-কে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং সঙ্গীত সাধনার উজল শেখ হয়ে ওঠে কবির দক্ষিণ হস্ত। কবির দুটো গানে এই উজলের নানোল্লেক্ষ আছে—

কানাইয়ের দাঁত উঁচো  
উজলের মাজা কুঁজো।

অন্যত্র বলেছেন—আমি ছিলাম যে কাহিলে  
সেই কথাটি পাগল কানাই কয় দশের হুজুরে  
উজল বলে ও মিয়াভাই মলি  
একবার কথা কও কথা কও কেন বেহুস হইলি ॥

সুতরাং উজল শেখ যে কবির ছোটভাই তাতে সন্দেহের কারণ নেই। এই উজল শেখ কবির পূর্বেই মারা যায়। মৃত্যুর পরে কবি বেদনায় অস্থির হয়ে একটা গান লেখেন। মৃত্যু বিষয়ক গানের মধ্যে সে গান দেখা হয়েছে। কবির পিতা ও ভ্রাতার নামদৃষ্টে মনে হয় কবির নাম ছিল কানাই শেখ। কানাই কোন গুরু প্রদত্ত নাম নয়—সম্ভবত পিতৃদত্ত নাম। এ ধরনের নাম পাক-বাংলার পল্লী অঞ্চলে মুসলমানদের মধ্যে আজো প্রচলিত আছে, যাদব (যাছ) সরকার, হারাণ মণ্ডল, পচা প্রামাণিক, নবীন (নবা) হাজী, নিতাই মোল্লা প্রভৃতি। কানাইয়ের সমসাময়িক কালে ইহু বিশ্বাস নামীয় একজন মুসলমান কবি কানাইয়ের শিষ্য হিসেবে সঙ্গীতজগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন—কানাইয়ের দুটো গানে তার উল্লেখ আছে—

ছোকড়ারা কয় ও ওস্তাদজী তোমার গায়ে দেখি কি  
জারেতে ধরেছে মাড়ী  
তখন পাগলা ইহু উঠে বলে আগুন পাব কার বাড়ী?

অধ্যাপক আবু তালেব এই ইছ বিশ্বাস সম্পর্কে বলেন “ইছবিশ্বাস স্থানীয় (যশোহর, কানাইদহ) ঘেড়োমারা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং কানাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী বয়াতীদের মধ্যে ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।”

(আজাদ চই ফাস্তুন, ১৬৬১)

যশোহর খুলনার ইতিহাস লেখক সতীশচন্দ্র মিত্র ইছবিশ্বাস সম্পর্কে বলেন—  
“কানাই ও ইছর জারী বঙ্গীয় নিম্নস্তরের ধর্মপ্রাণতা ও দেহাত্মবাদের সাফী, এজন্য উহার অনুবাদ পাশ্চাত্য মুল্লকেও অবজ্ঞাত না হইতে পারে। কানাই একপ্রকার নিরক্ষর। কিন্তু ইছ বেশ লেখাপড়া জানিতেন। কানাইয়ের দান সরল ও স্বাভাবিক, ইছর দান কিছু জটিল ও দীর্ঘ”—(২য় খণ্ড)  
“শরৎ কুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ” গ্রন্থেও (পৃঃ ১৬১) ইছ সম্পর্কে সামান্য আলোচনা আছে।

আমার মনে হয় ইছ শেষ দিকে কানাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী বয়াতি হিসেবে নিজেকে গড়ে তুললেও প্রথম দিকে সে ছিল কানাইয়ের শিষ্য। কবির উক্তিগত প্রমাণ মিলছে। অতএব ইছ সম্পর্কে কবি বলেন—

রঙ্ বলত্যাছে পাগল কানাই

আর দিত্যাছে ইছ ভাই

নতুন রঙ্ ছাবের বিশ্বাস কয় মন্দ নয়।

এখানে স্পষ্ট বুঝতে পারা যাচ্ছে ইছ আর সে সময় কবির শিষ্য নয়—রীতিমত রঙের পরিবেশন কর্তা কবি। যাহোক কানাই এবং ইছ এ দুটো নামই যে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তা প্রমাণের আর অপেক্ষা রাখে না। পাগলা কানাই তাঁর গানের ভণিতায় পাগল কানাই, পাগলা কানাই, কানাই, পাগল প্রভৃতি নাম ব্যবহার করছেন। একটা গানে তিনি বলেছেন “থাকবে পড়ে মুল্লক জুড়ে পাগল নাম কানাই সব দেশে।” এখানে তাঁর আসল নাম কানাই এবং লোকের প্রদত্ত উপাধি পাগল তিনি ব্যবহার করেছেন এমন একটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং কবির আসল নাম কানাই শেখ ছিল একথা বলবার পেছনে বিশেষ বাধা দেখি না।

কবি সঙ্গীত সাধনাকেই জীবিকার একমাত্র অবলম্বন বলে গ্রহণ করেছিলেন। এতেই তাঁর যে অর্থাগম হোত তা দিয়ে কায়ক্লেশে তাঁর সংসারের ব্যয়

নির্বাহ হোত। কিন্তু তবু কবিকে যে মাঝে মাঝে অর্থরোজগারের অগ্র উপায়ও দেখতে হয়েছে এমন প্রমাণ তাঁর গানে আছে। তিনি যশোহর থেকে শুপারী বোঝাই নৌকার মাঝি হয়ে পাবনার উল্লাপাড়া নলকা অঞ্চলে বাণিজ্য ব্যপদেশে এসেছিলেন—

উল্লাপাড়ার ঘাটেতে  
ব্যাতের লার মাঝি হয়ে  
গিয়াছিলাম শুপারী বেচতে।  
অথবা,  
ছিলাম ব্যাতের নৌকাতে  
নলকার বন্দরেতে  
মগাই শুপারী বোঝাই তাতে।

কবির দুই পুত্রের সন্ধান জানা গেছে। বড় ছেলের নাম ছিল গহর আলি শেখ এবং ছোট ছেলের নাম ছিল জামালউদ্দিন শেখ। এরা দুজনেই অত্যন্ত ধার্মিক মুসলমান ছিল।

ধর্মবিশ্বাসে কবি পাগলা কানাই শুধু নাম মাত্র (নামেও নয়) মুসলমান ছিলেন না। তিনি ছিলেন সাধক দরবেশ জাতীয় পরহেজগার মুসলমান। তিনি নিয়মিত নামাজ পড়তেন এবং রোজা করতেন। গানের আসরে দাঁড়িয়েও হাজার হাজার লোকের মধ্যে তিনি নামাজের সময় হলে গান থামিয়ে নামাজ আদায় করে নিতেন এবং তারপর দ্বিগুণ উৎসাহে সঙ্গীত রচনা শুরু করতেন। তাঁর গানের মধ্যে এই নামাজ রোজার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং শরিয়ত মোতাবেক জীবনকে গড়ে তুলবার প্রেরণা ব্যাপক ভাবে লক্ষ্য করা যায়—

পুলছিরাত যদি হবি পার  
তিরিশমতি পঞ্চ মাগিক সঙ্গে সাথী কর  
কত ফকির দরবেশ আলেম ফাজেল  
তাঁরা পুঁজি করছেন বল্লতর  
আমি কানাই স্পথে নাই  
কি জানি করেন শরওয়ার  
ভোলামন তাই বুঝা কর কারবার।



কবি যে সূফী সাধক ছিলেন তা বলাই বাহুল্য। শোনা যায় কবি কোন এক সূফী সাধকের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এবং এই দীক্ষার ভার তিনি সহ্য করতে না পেরে পাগল হয়ে পড়েন। কিন্তু কথাটা লোকের মধ্যে প্রচলিত থাকলেও সত্য নয় কেননা কবি শৈশব থেকেই পাগলা প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর রচিত গান তুলে দিয়ে সেকথা প্রমাণের চেষ্টা করেছি। আর এ ক্ষেপামীও প্রতিভার ক্ষেপামি। ভেতরে যে অদম্য সৃষ্টিশীল শক্তি তাঁর হৃদয়কে মথিত করে ফিরছিল তা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল,— চঞ্চল দুর্বার খেলালীপনার মধ্যে তাঁকে টেনে নিয়েছিল। তাই তিনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে এই আত্মগত হৃদয়োচ্ছ্বাসের বহিঃ প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর রচিত অসংখ্য গানে। এ যুগের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সাথে কবি পাগলা কানাইয়ের সেদিক থেকে আশ্চর্য মিল রয়েছে। জাত বোহেমিয়ান নজরুলের সাথেও পাগলা কানাইয়ের সাদৃশ্য আছে। প্রতিভার বাড়াবাড়ি একটু বেশী হলেই কিছুটা খেলালীপনার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

কবি সম্ভবতঃ দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন না। পাগলা কানাইয়ের স্বগ্রাম থেকে একটা গানের ছটোমাত্র চরণ উদ্ধার করা গেছে—সেখানে তিনি স্পষ্টই বলেছেন—

“কানাইয়ের দাঁত উচ  
উজলের পিঠ কুঁজ।”

বৃদ্ধ বয়সের একটা গানে কবি তাঁর নিজের চেহারা সম্পর্কে নিজেই ব্যঙ্গ করেছেন—

ডিল দেখ্যা কেউ ডড়াওনা ভাই  
শুন্যা ল্যাও ধুয়ার মিল  
বদডিল কর্যাছেন আমায়  
আলামিন রকিবল।

অবশ্য এখানে বৃদ্ধ বয়সে মানুষের চেহারায় যে রূপ নেমে আসে তার দিকেই কবি ইঙ্গিত করেছেন। কবি যে খুবই বৃদ্ধ বয়সে মারা গেছেন তার প্রমাণ তাঁর কয়েকটা গানে রয়েছে —

ওরে পাগল কানাইর বয়স গিয়াছে হইছি লরবরে  
 আমার দাঁতগুলো গ্যাছে পড়ে  
 ধুয়া বাঁধি কেমন করে  
 কথায় আমার রস বাঁধে না ফস করে কথা যায় সরে  
 সবে বলে পাগলা কানাই ফরম খায় ধরে।

এ ধরণের আরো অনেকগুলো উক্তি উদ্ধৃত করা যেতো, কিন্তু প্রদত্ত গানের তালিকায় সেগুলো খুঁজলেই পাওয়া যাবে বলে বিরত থাকলাম।

কবির স্বাস্থ্য প্রথম দিকে খুবই ভাল ছিল। কিন্তু শেষ দিকে এসে ম্যালেরিয়া, ডাইরিয়া প্রভৃতি অসুখে খুব ভুগেছেন বলে মনে হয়। তাঁর মাথায় লম্বা বাবরী ছিল এবং শেষ দিকে এসে তিনি দাড়ি রেখেছিলেন। মাঝে মাঝে এই বাবরী অসুখের জন্ম তাঁকে কেটে ফেলতে হয়েছে—কিন্তু শরীর ভাল হলেই আবার মাথায় লম্বা চুল রাখতেন। শেষ বয়সে যারা তাঁকে দেখেছে তারা তাঁর মাথায় লম্বা চুলের কথা উল্লেখ করেছে; কবির দাঁতগুলো সম্ভবতঃ সবই পড়ে গিয়েছিল শেষ বয়সে এসে। মোটামুটি তিনি লম্বা ছিলেন এবং শক্ত স্ঠাম স্পুরুষ ছিলেন। এ সমস্ত বিবরণ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনী বিষয়ক গানগুলোর মধ্যে রয়েছে।

গানের জন্ম কবি তাঁর ভক্তদের নিয়ে স্থানে স্থানে কেন্দ্র করে বেশ কিছুদিন সেখানে থাকতেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। এগুলোকে লোকে কবির আখড়া বলতো। পাবনা জেলার উল্লাপাড়ায় ও শাহজাদপুরে এমন দু'টো বিখ্যাত আখড়া ছিল। এ সমস্ত আখড়ায় কবির দু'তিন শত ভক্ত প্রায় সব সময়েই কবিকে কেন্দ্র করে দিন কাটাতে এবং কবির অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করে জীবন সার্থক করতো। এ সব লোকের আহ্বার বা থাকবার ব্যবস্থার জন্ম কবিকে ভাবতে হোত না, ভক্তেরা নিজে থেকেই ব্যবস্থা করতো। পাবনা জেলার চরনবীপুর গ্রামের আহম্মদজান সরকার আমাকে এই তথ্য দিয়েছেন এবং কবির আখড়ায় বাস করেছে এমন লোকের মুখে তিনি নিজে শুনেছেন একথাও আমাকে বলেছেন।

## ॥ কবি-প্রতিভা ॥

পাগলা কানাইয়ের কবি-প্রতিভা নিয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, আরো ছ' একজন করেছেন, তবু একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে তাঁর কবি শক্তির সর্বাত্মক বিচার আজো হয় নি। কবি পাগলা কানাই ছিলেন অশিক্ষিত গ্রাম্য কবি। জীবনে শিক্ষার আলোক তিনি পান নি। অথচ তিনি যে সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন তখন আধুনিক সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নব উদ্দীপনায় ও বিচিত্র সজ্জায় অগ্রগতির দিকে পাখা মেলেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে প্রাচীন জীর্ণ সংস্কার ও চিন্তাধারা একে একে ভেঙ্গে পড়েছে—সকল দিক দিয়ে জীবনের ও জগতের নতুন নতুন গ্রন্থি মোচন হচ্ছে, মানুষ তার বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে, পৌরুষ নিয়ে, নিজস্ব শক্তির ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে মানবতার মহান ঐতিহ্য সহকারে সাহিত্যে প্রবেশ করছে। একদিকে বাহ্যিক প্রকৃতির সাথে দ্বন্দ্ব মানুষের বস্তুমুখী ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটছে অগ্নিদিকে তার হৃদয় জগতে যে আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের ঢেউ প্রতি মুহূর্তে তাকে ব্যাকুল ও বিহ্বল করে তুলছে যুগ যুগ ধরে তারও চিত্র নতুন সুর ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে প্রবেশ লাভ করছে—আমাদের সাহিত্য বিচিত্র রসে, বিচিত্র রূপে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠলো। মানুষের জীবনেই যে 'এতো কথা ছিল, এত গান ছিল, এতো স্মৃতি ছিল, এতো সাধ ছিল, প্রাণ হয়েছিল ভোর' তা পূর্বে জানা যায় নি। পাশ্চাত্য শিক্ষার সোনার কাঠির স্পর্শে জীবনের সকল ঘুমন্ত শক্তি জাগ্রত হয়ে উঠলো, সাহিত্যে জীবনে জীবন যোগ করা সম্ভব হোল। মধ্যযুগের সাহিত্যের পথ থেকে দ্রুত গতিতে আমরা বহু দূরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম—পেছনের দিকে নয়, সামনের দিকে, জীবন সমুদ্রের দিকে। জীব-মহাসমুদ্রের কল্লোল-ধ্বনি উত্তাল তরঙ্গের উচ্ছ্বাস এবং ব্যাপকতর আশ্বাদ আমাদের সাহিত্যের সকল দ্বারদেশ দিয়ে প্রবেশ করলো আর প্রাণশক্তিকে বলিষ্ঠতর করে গড়ে তুললো। এই এগিয়ে যাবার পেছনে যে সব মনীষীর চিন্তাধারা ও সাহিত্য-কর্ম সবচেয়ে সক্রিয় ছিল তাঁদের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল, নবীন সেন, প্যারীচাঁদ, বঙ্কিমচন্দ্র, মশাররফ হোসেন, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ

যোগ্য। এঁদের শেযোক্ত অনেকের সাহিত্য-সাধনার যুগ কবি পাগলা কানাইয়ের সময়ে পড়ে।

সুতরাং আধুনিকতার এই প্রখর আলোকে আলোকদীপ্ত যুগে পাগলা কানাইয়ের মত একজন অশিক্ষিত কবির সঙ্গীত কি এমন গুণে গুণান্বিত যার জন্ত তাঁকে নিয়ে সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখবার বা তাঁর গানগুলো লোক সমক্ষে তুলে ধরবার প্রয়োজন থাকতে পারে এ প্রশ্ন একান্তই স্বাভাবিক। আর এর উত্তরও অত্যন্ত সহজ। পাগলা কানাই মূলতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের একজন গ্রাম্য-কবি। এ সময়ের বাংলা দেশের সাহিত্য-রস বোদ্ধা জনসাধারণকে মূলতঃ দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একভাগে ছিল আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত পাঠক যারা উচ্ছিন্ন মনীষীদেরকে বরণ করে নিয়েছে। এদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত সবাইকেই ধরা যায়—সামান্য লেখাপড়া শিখেও বিহারীলালের কবিতা, বঙ্কিমের উপন্যাস, হেমচন্দ্রের জাতীয় সঙ্গীত, মোশাররফ হোসেনের বিবাদসিদ্ধি এবং রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কাব্য (মানসী পর্যন্ত) পড়েনি বা রস উপলব্ধি করেনি এমন লোক সে যুগে ছিল বিরল। কিন্তু এই পাঠকদেরকে নিয়েও দেশের শতকরা দশ থেকে পনেরো কিস্বা কুড়ি জনের উর্ধে লিখিত-সাহিত্যের সাথে পরিচয় লাভ করেনি। আর এই পাঠকদের পড়া শুনে খুব বেশি হলে শতকরা দশজন শ্রোতা (পাঠক নয়) মুগ্ধ হয়েছে একথাও যদি ধরে নেয়া যায় তবু সব নিয়ে শতকরা পঁচিশ থেকে তিরিশের কোঠার ওপরে ওঠে না। অতীতকে দেশের শতকরা সত্তোর থেকে আশি জন লোক যাদের রচিত গান বা ছড়া শুনে গভীর আনন্দ রসে উজ্জীবিত হয়ে উঠতো তারা এই পাগলা কানাইয়ের দলের কবি সাহিত্যিক। তাছাড়া গ্রাম্য কবিদের মধ্যেও পাগলা কানাইয়ের সাথে জনপ্রিয়তার দিক থেকে বা চিন্তার সাবলীলতা অথবা গভীর বাঞ্ছনাময় বহিঃপ্রকাশের দিক থেকে বিচার করলে তাঁর নাম রাখতে হয় শীর্ষস্থানে। সুতরাং দেশের বিরাট জনমনে যে সব কবি নিজেদের সৃষ্টিশীল প্রতিভার রস পরিবেশন করেছেন তাঁদেরকে সাহিত্যের ত্রিসীমানায় প্রবেশ করতে না দিলে দেশের প্রতি এবং দেশের মানুষের প্রতি অবিচার করা হবে বলে আমি মনে করি। আমাদের মনীষী কবি সাহিত্যিকদের সাথে সাথে অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত গ্রাম্য-কবিদের সৃষ্টিকেও জানবার, বুঝবার এবং সমালোচনার দৃষ্টিতে

দেখে তার যথার্থ মূল্য বিচার করবার প্রয়োজনীয়তা যে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। আমার এ প্রচেষ্টাকে সেই দৃষ্টিতে বিচার না করলে এর মূল্যবোধ সম্পর্কে ভুল ধারণা হবার সম্ভাবনা।

তবু গ্রাম্য-কবি হয়েও এবং শিক্ষার আলোক না পেয়েও কবি পাগলা কানাই যা সৃষ্টি করে গেছেন তার মূল্য বাংলা সাহিত্যের অনেক উচ্চশিক্ষিত কবির সাথে তুলনা করলে মৌলিক চিন্তা, শিল্পসৃষ্টি ও ভাব-গাম্ভীর্যের দিক থেকে উৎকর্ষ বলে বিবেচিত হবে। কয়েকটা গানের অংশ তুলে দিয়ে সে বিচার করে নেয়া যাক -

গেলো দিন

শুন মুসলমান মোমিন

পড় রব্বিল আলামিন

দিন গেলে কি পাবি ওরে দিন

দীনের মধ্যে প্রধান হল মোহাম্মদের দীন

সেই দীনের দীন করলে একিন

সুখে রবি চিরদিন

নাইকো জ্বালা ও মন ভোলা

পাবিরে পার হাসরের দিন।

অথবা,

আজব এক জাহাজ গ'ড়ে

দীনবন্ধু পাঠাইছেন ভবের পরে

সে জাহাজ পানিতে কখন চলে না

শুকনাতে ভাস্তা ফেরে

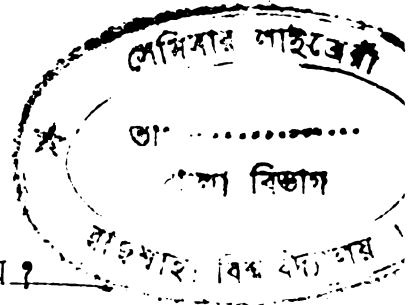
ভব সিন্ধুতে মন বন্ধু মাঝি হাল ধরে

জাহাজ চলত্যাছে ভাই দুই দাঁড়ে।

অথবা,  
 এক ঘরের দুই ঘরামি  
 করত্যাছে টানাটানি  
 কার বা কতই বল  
 আর এক ঘরের দ্বার হস্তে ছাদ  
 ঢাক্যাছে তিরপল  
 হস্তপদ নাই ঘরামীর বাক্যাছে বাক্যাছে  
 নির্মল  
 ঘর নাই তার ছাউনি ভালো  
 সে ঘরে জগৎ আলো  
 হয়্যাছে উজ্জল।

পাগলা কানাইয়ের উপরোল্লিখিত কয়েকটা গানের পংক্তির সাথে উৎকর্ষের  
 দিক দিয়ে তাঁর সমসাময়িক কবি হেমচন্দ্র ও কায়কোবাদের কয়েকটা পংক্তির তুলনা  
 করলে এগুলোর উৎকর্ষ ধরা পড়বে।

ফোটে ত রে এত ফুল তড়াগের কোলে  
 শুভ্র নীল লাল আভা  
 কাহারও শরীর প্রভা  
 কই ত আমার মনে ওরূপে না খোলে  
 এত সুখে চিত্ত কই দেখি না ত দোলে  
 রে চিত্ত-মাদক পদ্য ?



এখানে কবি কিভাবে ত ত করেছেন তা লক্ষ্য করবার মতো। কবিতাংশটা  
 হেমচন্দ্রের 'পদ্মফুল' কবিতা থেকে নেয়া হয়েছে। হেমচন্দ্রের কাব্যে আরও এমন  
 নিদর্শন বিরল নয়। অথচ তিনি ছিলেন এ যুগের জাতীয় কবি। অতীতকে  
 এ যুগের আর একজন মহাকবি কায়কোবাদের রচনার কথা বলতে হয়—একটা  
 মাত্র নিদর্শন দেয়া যাক—

আজ হতে দুই মোর হলি অর্দ্ধাঙ্গিনী  
 সাবধান অথ কোন পুরুষের সঙ্গে  
 মিশিস নে।

বলা বাহুল্য অশিক্ষিত কবি পাগলা কানাইয়ের রচনায় কাব্য-ব্যঞ্জনা এসব অংশের চেয়ে অনেকগুণে বেশি রয়েছে।

পাগলা কানাই ছিলেন সাধক পুরুষ। তাঁর গানগুলোতে ভাব সাধনার গভীরতা লক্ষ্য করা যায়। বাংলা দেশের অসংখ্য বাউল কবিদের গানে এই রীতি প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু তবু বাউল কবিদের মধ্যে একমাত্র লালন শাহের সাথেই তাঁর তুলনা চলতে পারে। লালন-শাহের মধ্যে বাউল-ভাব সাধনাই গানের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠেছে, অতীতকে পাগলা কানাইয়ের মধ্যে বাউল ভাব-সাধনার সাথে সাথে জীবনের অতীত, সমাজের ছবি, সমসাময়িক স্থানের বর্ণনা এবং ঐতিহাসিক কাহিনী সম্বলিত বস্তুমুখী ভাবধারাও গানের প্রাণ-শক্তি ও আকর্ষণ-ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলেছে। সেজন্য তাঁর গান বৈচিত্র্য-বহুল—একঘেঁয়ে নয়। তাঁর জনপ্রিয়তার মূলে এও একটা কারণ ছিল। বাংলা সাহিত্যে সুফী-মতবাদের প্রভাব প্রচুর রয়েছে। পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যযুগের সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে ফারসী গজলের প্রভাবে সুফী আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ ভাবের সৃষ্টি হয়। পুথি সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য প্রভৃতি ছাড়াও বাংলার ঘরমীরা ভাবসাধক আউল বাউলদের গানে এ প্রভাব ব্যাপকভাবে সঞ্চারিত হয়, মুর্শিদী, বাউল ও দেহতত্ত্বমূলক গানগুলোকে এ পর্যায়ে ফেলা যায়। সুফীদের মূলমন্ত্র হোল নিজেকে পূর্ণভাবে চিনতে পারা—হাদীসের সেই “মান আরাফা নাফ্ সাহ ফাকাদ আরাফা রাব্বাহ্” এবং বাইবেলের “Know thyself and you will know God”—এ কথাই প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় সুফী গান ও গজলগুলোর মধ্যে। মানুষের ভেতরেই যে মানুষ-রতন রয়েছে সুফী সাধকরা তাকেই জানতে চান, বুঝতে চান। সেই অহং এর সাথে যার নিবিড় পরিচয় ঘটেছে সে সংসারকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে—তার কাছে সেই অতন্ত্র প্রদেশের কাণ্ডারী পুরুষের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই। এই ব্যক্তি পুরুষের অভিব্যক্তি যদি চূড়ান্ত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মধ্য দিয়ে ছন্দোহীনভাবে বাণী-মূর্তি লাভ করে তবে তাকেই আমরা গীতি-কবিতা বলে থাকি। রবীন্দ্র কাব্যে বিশ্বের বিচিত্র জীবনধারার চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে কবির অতল গভীর সংবেদনশীল গন, হৃদয়ের সীমাহীন অনুভূতির বৈচিত্র্য—যা তাঁর কাব্যে ফল্গুধারার মতো শুধুই অন্তঃসলিলা নয়—বিশ্বের ও জীবনের যা কিছু সংস্পর্শে এসেছে

তাকেই সে ক'রে তুলেছে নতুন আলোকে মাধুর্যমণ্ডিত। মূর্খ কবি পাগলা  
কানাইও তাঁর গানের মধ্য দিয়ে এই অহং-এর সন্ধান করেছেন। তিনি  
 ছিলেন সুন্নী মুসলমান-সেজ্ঞা ইসলামী বিধি নিষেধের প্রতি তাঁর গভীর  
শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু তবু তাঁর কথার ফাঁকে ফাঁকে অন্তরের নিগূঢ় আকুতিকেই  
 তিনি যেন প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

ভাব-নাথক বলেই জীবনের প্রতি মমত্ববোধ পাগলা কানাইয়ের বেশ গভীর  
 ছিল। এ যুগের শ্রেষ্ঠ গীতিকবি রবীন্দ্রনাথকে এই চিন্তাধারা সবচেয়ে বেশি  
 ব্যাকুল করে তুলেছে। সুখ দুঃখ নিয়ে এই যে জীবন এর চেয়ে মধুর ও  
 প্রিয়তর পৃথিবীতে আর কিছু নেই। অথচ এই জীবনের সকল কিছুর অবসান  
 মৃত্যুতে। গভীর জীবনবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিকে 'মরিতে চাহি না  
 আগি সুন্দর ভুবনে' বলে ঘোষণা করেছেন—কিন্তু পরের দিকে এসে এ চিন্তা  
 তাঁকে আরো বিহ্বল করে তুলেছে—

(ক) এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে  
 সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে  
 গভীর ক্রন্দন, 'যেতে নাই দিব'। হায়,  
 তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।

(খ) দুর্লভ এ ধরণীর লেশতম স্থান  
 দুর্লভ এ জগতের ব্যর্থতম প্রাণ।

(গ) হায়রে হৃদয়  
 তোমার সঞ্চয়, দিনান্তে নিশান্তে শুধু  
 পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়  
 নাই, নাই, নাই যে সময়!

রবীন্দ্রনাথ থেকে এ ধরণের আরো প্রচুর উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। মানুষের  
 জীবনের সবচেয়ে বড় বেদনা তার জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব, দণ্ডে দণ্ডে, খণ্ডে খণ্ডে  
 নেমে আসা ক্ষয়িষ্ণুতা। এই অনুভূতি কবি পাগলা কানাইয়ের মধ্যেও অত্যন্ত



তীব্রভাবে ছিল। তবে তিনি অশিক্ষিত গ্রাম্য-কবি, সাধারণ মানুষের কবি,  
তাই তাঁর প্রকাশভঙ্গীও সাধারণ—

পাগলা কানাই তাই ভাবে  
আজ মরিলে কাল দুদিন হবে  
হুকুমেতে আচ্যাও রে ভবে  
হুকুমে যেতে হবে  
ভাই বন্ধু ইষ্ট কুটুম কেহ  
সঙ্গে না যাবে।

এ ধরনের উদাহরণ তাঁর গানে ভুরি ভুরি রয়েছে—

(ক) জাহাজের আঁট কুঠুরি নয় দরজা  
মাল কোঠায় সোনা  
যদি দাঁড়িমাল্লা ছয় জন রিপু  
জাহাজ চালায় না  
তবে জাহাজের কি হবে  
পাগল কানাই বসে এখন তাই ভাবে  
যেদিন জাহাজ হবে কমজোরী ভাই  
বা'ন খেয়ে তরী জল নেবে  
দাঁড়িমাল্লা ছয়জন রিপু সব ছেড়ে যাবে  
সেদিন শুকনায় তরী তল হবে।

(খ) অধম কানাই ভাবে  
আমি মিছে মিছে আসিলাম এই ভবে  
আমার আথেরে কি হবে  
কোন দিন যেন শমন এসে  
হুই হস্তে রসি দিবে।

(গ) আমি তোমার আশায় আশায়  
বড়ই প্রেম করেছিলাম  
বড় যত্নেতে ছিলাম

ধরবে প্রেমের ফল খাবো চিরকাল

সাধ করেছিলাম।

আমার সে আশা নৈরাশা হৈল

কালঘুম আস্তা ধর্যা নিল

ও ধর তুমি থাকো না থাকের জিন্মায়

হায় আমি চন্না ম সরকারে।

রবীন্দ্রনাথের সাথে পাগলা কানাইয়ের তুলনা একেবারেই বাতুলতা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে বাঙ্গালীর মানস-ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে চলবে না— রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এসে বাঙ্গালী মনের বহু যুগের মর্মবানী ধরা পড়েছে। বৌদ্ধ-যুগের সিদ্ধাইযোগী থেকে শুরু করে বৈষ্ণব সাধক, সূফী সাধনায় বিশ্বাসী পুথিরচয়িতা, বাউল ও আধুনিক যুগের গীত-কবি সবার মধ্যেই জীবনের এই ভাবতন্ময়তার দিক বা সাধনার দিকটা বড় হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁদেরই প্রতিভা। আর রবীন্দ্রনাথের যুগেই (উনবিংশ শতাব্দীতে) গ্রাম-দেশের এই ভাবুক কবির আধ্যাত্মিক সাধনার সঙ্গীতে সারাদেশ প্রাবিত করে দিয়েছিলেন—সে অবদানের মূল্যকে আমাদের ঐতিহ্যবিচারের মাপকাঠি থেকে বাদ দিলে দেশ-কেই অস্বীকার করা হবে। এঁদের পুরোভাগে ছিলেন লালন শাহ, পাগলা কানাই, শেখ মদন, ভানুশাহ, আলীমুদ্দিন, ভেলা শাহ, হাসান, ঈলাল শাহ, মুন্সী বেলায়েৎ হোসেন প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে জনপ্রিয়তার দিক থেকে অবিশিষ্ট পাগলা কানাইয়ের নাম করতে হয় সর্বাগ্রে।

মধ্যযুগের সাহিত্যের যে রীতি তারই বেশ পাগলা কানাই তাঁর গানে টেনে ফিরেছেন একথা ঠিক—তবু মধ্যযুগের সাহিত্যের সাথে কবির প্রাণের যোগ ছিল না। তাঁর কবি-মন মধ্যযুগের ভাবধারা থেকে আলো বায়ু নিয়ে বর্ধিত হয়নি। সঙ্গীত সাধনায় তাঁর সবচেয়ে বড় লক্ষ্য ছিল মানুষ—কবির চারদিকের মানুষের বিচিত্র জীবন। সমসাময়িক মানুষের মনের ভাবনা চিন্তাকে তিনি তাঁর কাব্যে রূপ দিয়ে গেছেন। সঙ্গীত হোক, সাহিত্য হোক, সবকিছুর মধ্যেই আমাদের জনসাধারণ একটু তত্ত্বকথা, একটু আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করতে চায়, স্রষ্টার সাথে আমাদের মনের যোগ যে বিনে-তারে গাঁথা রয়েছে সেখানে স্বংকার না উঠলে আমাদের পল্লীবাসী পুরোপুরি আনন্দলাভ করতে পারে না।

পাগলা কানাই তাই তাঁর চারপাশের মানুষের সেই আনন্দ রসের সূত্র ধরে মূলতঃ দেহতত্ত্বমূলক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা সম্বলিত সঙ্গীত রচনা করলেন। তাঁর গানে মানুষ চিন্তার অবকাশ খুঁজে পেল—আর পেল চিন্তার মধ্য দিয়ে আনন্দ রসেরও আশ্বাদ। তবে পাগলা কানাইয়ের গানে একথা পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায় যে তিনি ধর্মপ্রবণ মুসলিম ছিলেন। জীবনে তাঁর একটা বিশেষ আদর্শ ছিল। আধুনিক বহু আদর্শে রোমন্থনকারী বিকৃতমনা উন্নাসিক কবিদের মত হৃদয়-বৃত্তি তাঁর ছিল না বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল অটল এবং যা ছাড়া বুঝেছেন তা বলবার সাহসও ছিল অদম্য। আজ এক কথা বলে কাল তার উপটোটা ঘুরিয়ে পঁচিয়ে বলবার দরকার হয়নি তাঁর। ইসলাম নিঃসন্দেহে মানুষের শ্রেষ্ঠ কল্যাণকামী ধর্ম—এ বিশ্বাস কবির প্রাণে-মনে এবং রক্তে রক্তে বিদ্যমান। নিজের জ্ঞান যা তিনি মঙ্গলময় ভেবেছেন সবার জ্ঞানও তা যে মঙ্গলময় এ কথা দ্বিধাহীন চিন্তে বলতেও সেজ্ঞান তিনি কুণ্ঠিত হননি। তাই তাঁর প্রায় গানেই একটা উপদেশমূলক বা নীতিমূলক ভাব লক্ষ্য করা যায়। এর আরো একটা কারণ ছিল—তিনি যে গ্রাম্য কৃষক সমাজের কবি সে-সমাজ দিনরাত অজ্ঞতার পঙ্কিলে নিমগ্ন। কবি তা উপলব্ধি করেছেন। আর তাই নিজে থেকেই এ অজ্ঞ সমাজকে পথ নির্দেশ দেবার দায়িত্ব তিনি বরণ করে নিলেন—তাদেরকে সত্যের ও সত্যের পথে চলবার আহ্বান জানালেন। এখানেই Poets are the unacknowledged legislators of the world একথা সত্য প্রমাণিত হয়।

স্বীকার করি পাগলা কানাইয়ের গানে নীতিশিক্ষা বা তত্ত্বকথার চাপে আর্ট বা শিল্পরস কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। সাহিত্য সমালোচনার কষ্টি পাথরে যাচাই করতে গেলে হয়তো মাত্র দু'চারটা গানকে রসোত্তীর্ণ বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু গ্রাম্য-কবিদের সাহিত্য বিচারে আমাদের শিল্পবোধকে কিছুটা পরিবর্তন করতে হবে। সহজভাবে যা তারা বোঝে সহজ ও অনাবিল ভাবেই তার প্রকাশও তারা করে থাকে। আমাদের মানসিক-গঠন অনুযায়ী সূক্ষ্মতা সেখানে খুঁজলে আমরা ব্যর্থ হব। গ্রাম্য মেয়েদের মোটা বা স্থূল গহনার মতই তা বেশ কিছুটা স্থূল। আর এ স্থূলতার দোষ কবিদের ঘাড়ে না চাপিয়ে সমগ্র গ্রাম্য সমাজটার ওপরেই চাপাতে হয়। পাগলা কানাই এই গ্রাম-বাংলার প্রতিভূ কবি। তাই তাঁর গানে আধুনিক কবিদের সূক্ষ্মানুভূতি

থাকতে পারে না। তবু Sincerity of purpose বলতে সাহিত্যে যা বোঝায় তা তাঁর গানে রয়েছে। সেজন্য গানের মাধ্যমে মানুষের অভ্যন্তরে যে মানব-রতন আছে তাকে খাঁটি পথে চালিয়ে মুক্তি নিয়ে আসবার আবেগ ও উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও কবির এ অনুভূতি কোথাও কৃত্রিম হয়ে পড়েনি।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ সম্পর্কে বলতে ঘোরতর মানবমুখীনতার কথা উল্লেখ করেছি। আর একথাও বলেছি যে যেহেতু পাগলা কানাই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না সেজন্য তাঁর গানে এই মানবমুখীনতার পূর্ণ বিকাশ থাকবে, স্বাভাবিক ভাবেই তা আশা করবার কথা নয়। অথচ আশ্চর্য, পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক-বঞ্চিত কবি পাগলা কানাই তাঁর সারাজীবনের দঙ্গীত সাধনায় শুধু মানুষের কথাই বলে গেছেন। তাঁর গানের মূল বিষয়বস্তু প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ছিল মানুষ, মানুষের দেহ-আত্মার মিলন-কেন্দ্র। সমস্ত সভ্যতার আলোক-বিচ্ছিন্ন সমাজের কবি হয়েও তিনি শুধুমাত্র মধ্যযুগীয় ভাবধারার মধ্যে তন্ময় হয়ে ছিলেন না। তিনি মানুষের দেহ-আত্মার বাস্তব কাহিনী রচনা করে তাঁর কবিশক্তিকে মানবমুখী করে তুলেছিলেন। কবির এই মানবমুখীনতার কথা এ প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্তও বলেছি—তবু আরো খোলাসা করবার জন্য এখানে এ প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম।

একটা মাত্র উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করবো—

মানুষ জমিন ভাই

যতন তার করা চাই

যতন না করলে ফসল মেলে না।

এমন বাগানেতে কতই না ফুল

ফুটালে ফুটবে জবা টাঁপা বকুল

গন্ধে অতুল

হায়রে বাতুল, তুমি তার খবর পেলে না॥

জ্ঞানের পথে নয়, অনুভূতির মাধ্যমে কবি যেন সবার অলক্ষ্যে যুগের বাণীর সাথে তাঁর হৃদয়ের একটা সূক্ষ্ম তন্ত্রী যোগ স্থাপন করেছেন। এখানেই তাঁকে যুগপোষোগী কবি হিসেবে সম্মান না দিয়ে পারি না। অবশি এখানে

রামপ্রসাদের বিখ্যাত গান “এমন মানব-জমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা” কথাটা স্মরণ হওয়া স্বাভাবিক। চিন্তার দিক থেকে আমাদের গ্রাম্য-কবির প্রায় একই পথের পথিক।

পাগলা কানাই কবি হিসেবে অত্যন্ত উচ্চ স্তরের ছিলেন একথা প্রমাণ করাই এখানে আমার উদ্দেশ্য নয়—সাহিত্যের লুপ্ত বা বিলুপ্তমান উপকরণগুলো উদ্ধার করা ও তার যথার্থ মূল্য যাচাই করাই আমার প্রধান লক্ষ্য। তবু কবির প্রতি আমার দুর্বলতা বা অতি-দরদ হেতু কবি সম্পর্কে আমি হয়তো ভাবাবেগ বশে অনেক বেশি বলেছি কেউ কেউ এমন মনে করতে পারেন। তাঁদের আমি কবির সংগৃহীত গানগুলোর দিকে লক্ষ্য করতে বলি। সার্থক শব্দ-চয়ন ও ছন্দের তাল লয় বিধান করার মধ্যে কবিতা বা গানের সার্থকতা নির্ভর করে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কবি বিহারীলালের গানের চিন্তাধারা, ভাবভঙ্গি অত্যন্ত গভীর পর্যায়ে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও যে এমন গভীর ভাবের ভাবুক আমাদের সাহিত্যে ছিলেন একথা ভাবতে সত্যি শুধু ভাল লাগে তা নয়—কবির প্রতিভা সম্পর্কেও এক বিপুল শ্রদ্ধা-বোধ স্বাভাবিক ভাবেই মনে জেগে ওঠে। কিন্তু তবু কবির কবিতাগুলোর শিল্প-কর্মের দিকে তাকালে মনে হয় তাঁর মন যেন দুটো কাজ একত্র সার্থকভাবে সম্পন্ন করতে পারেনি, কাব্যে গভীর ভাবুকতার দিকে লক্ষ্য রাখতে যেয়ে শব্দ-চয়ন বা ছন্দের মাধুর্য বিধানে তাঁর মন সজাগ-শিল্পকুশলতার পরিচয় দিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। এজ্ঞেই তাঁকে যত বড় ভাবুক বা ধ্যানী বলা যায়—তত বড় কবি বলা যায় না। কবি হতে হলে তিনি ভাবুক হন, ধ্যানী হন বা সৈনিক হন অথবা আরো অল্প কিছু যদি তাঁর মন চায় তবে তিনি তাই-ই হন আপত্তি নেই—কিন্তু সবার উর্ধ্বে তাঁকে কবি হতেই হবে। এই কবি-হওয়া নির্ভর করে কবিতার শিল্প-কর্মের ওপর। শিল্প-কর্ম বলতে শুধু কবিতার ভাব-গান্ধীর্ষ বোঝায় না—ভাব-গান্ধীর্ষ বা কবির সূক্ষ্ম ও গভীর চিন্তাভাবনা নিঃসন্দেহে কবিতার প্রাণ-শক্তি নির্মাণ করে—কিন্তু শুধুই প্রাণ-শক্তি কবিতার সব নয়, তার বহিরঙ্গের জৌলুষও প্রয়োজন। এই দিক থেকে বোধ করি কবিতাকে ললনার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। নারীর ভেতরের গুণপনা বা মধুর কোমল নারীত্ব নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার্থ ও বরণীয়। কিন্তু সাথে সাথে তার বাইরের



কথাটা শুনে কবির মনে এসব চিন্তা থেকে পাগলা কানাইয়ের সমান  
একজনমানুষের কথা ভাবতে কবির মনে বিশেষ চোখে পড়ে না। কথাটা নিশ্চয়ই  
কবির মনে মুগ্ধতা এবং দুঃখের উল্লেখ দিলেই বুঝতে পারা যাবে—

পালক বন গুন মুসলমান মোমিন

নয় রবিবর হিন্দু মুমিন

কিন পালক কি পাবি ওরে দিন

দীনর মনে প্রধান হোল মোহাম্মদের দীন

নই দীনর দীন করলে একিন

সুখে রবি চিরদিন ;

নাইক জল এমন ভোলা পাবিরে তুই

হাসরের দিন।

অথবা,

এক দরদর হুই বরানি

কদম্বের উনটানি

কদম্ব কদম্বই বন

কদম্ব এক দরদর দার হস্তে ছাদ

ঢেকেছে তিরপল

হস্ত পদ নাই ঘরামির

বাক্যাছে বাক্যাছে নির্মল

দার নাই তার ছাউনি ভাল

সে ঘরে জগৎ আলো

হর্যাছে উজ্জল।

ছন্দের গাঁথুনীতে, সহজ, সরল ও স্বাভাবিক কথার পারিপাট্যে, অনুপ্রাসের  
বহুল প্রয়োগে এবং ভাবের গভীরতায় এসব গান সত্যি বাংলা সাহিত্যে  
স্থায়ী আসন পাবার দাবী রাখে। কবির শব্দ-নির্বাচন-পদ্ধতি এতো স্বাভাবিক  
যে কোথাও কোন শব্দ এতটুকু অসামঞ্জস্য সৃষ্টি করে না। সেজন্য তাঁর  
ছন্দ শুধু দ্রুত তালে চলে না, হৃদয়কেও দ্রবীভূত করে। তাছাড়া শুধু কঠিন

তত্ত্ব কথার মধ্য দিয়ে একটা সত্যে পৌঁছতে তিনি চাননি—জীবনের গৃঢ়  
রহস্য-সন্ধানের ফাঁকে ফাঁকে সার্থক শিল্পীর মতো রসবেত্তার পরিচর্য তিনি  
পূর্ণ ভাবে দিতে পেরেছেন। এই রস, এই আনন্দের দাবীতে আকর্ষণ  
করবার ক্ষমতা আছে বলেই তাঁর গানের আবেদন হৃদয়কে স্পর্শ করে।  
অবশিষ্ট আমি শুধু আমার সংগৃহীত গান থেকেই উদ্ধৃতি দিয়ে এ সব প্রমাণ  
করতে চেষ্টা পেয়েছি। কিন্তু অশ্রের সংগৃহীত গানেও কবির এ কৃতিত্ব  
সমানভাবে প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণ দেয়া গেল—

// পাগলা কানাই বলে বলি তোরে  
মন কেন বুঝেও বোঝে না  
এমন অসৎ লোকের সঙ্গে লয়ে  
হারালি ষোল আনা !  
মাল আমাল নিল লুটে  
ছয় জন মুটে  
তাও তুমি জেনে জান না।  
লাভের ধন পিপড়েয় খেয়ে গিয়াছে  
বুঝে দেখরে দিন কানা।  
( মুঃ মনসুরউদ্দিন সংগৃহীত )

কি মজার ফুল ফুটেছে ওরঙ্গের মাঝার  
দেখতে ভয়ঙ্কর ভাসছে ফুল নিরাকার ॥  
মূল রয়েছে তদন্তরে, তদন্তরে নবীর দৃষ্টি কার।  
লগ্ন যোগে লিখা কুঁচি, দৃষ্টি রাখে সৃষ্টিধর,  
কি চমৎকার সেই অমূল্য ফুল, তোলে সাধ্যকার ॥  
( বাঙ্গালীর গান, শ্রীছর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত )

কবি সম্ভবতঃ মুখে মুখে শুনে কিছুটা সংস্কৃত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।  
আমি তাঁর একটা গান আবিষ্কার করেছি যার মধ্যে এর প্রমাণ আছে। গানটার  
শব্দ-ঝংকার সত্যি আকর্ষণীয়। যথাস্থানে গানটা উদ্ধৃত হয়েছে।



*পাগলা কানাইয়ের গানের আকর্ষণ-শক্তি শুধু যে গঠন-নৈপুণ্যের জগতই*

বেড়েছে তা নয়—তাঁর গানের সুরের অভিনবত্বও রয়েছে এর পেছনে। তিনি অসংখ্য গান রচনা করেছেন এবং প্রত্যেকটা গানেরই সুর দিয়েছেন নিজে। তাঁর গানের কথা ও ভাব যেমন বিচিত্র, তেমনি সুরও অভিনব। গানের আসরে দাঁড়িয়ে সুরের মারাজাল সৃষ্টি করতে পারতেন তিনি। তাঁর গানের আসরে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করতো এসব কারণেই। বাংলার কোমল মধুর সুরটার স্বরূপ তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। বাংলার মানুষের হৃদয়ের কোন্‌ তারে টোকা দিলে ঝংকার সৃষ্টি হয়, তা তিনি সার্থকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। আমি নিজে সুরবেত্তা নই—তাঁর গানগুলোর সুরলিপি দিতে পারলে তাঁর প্রতিভার এই বিস্ময়কর দিকটা উদ্ঘাটন করা সম্ভব হতো। ‘বাঙ্গালীর গান’ গ্রন্থের সম্পাদক (সন ১৩১২ সালে প্রকাশিত) শ্রীচূর্ণাদাস লাহিড়ী মহাশয় ‘পাগলা কানাই’ সুর বলে এক অভিনব সুরের কথা উল্লেখ করেছেন। পল্লী-সঙ্গীতের জগতে এ সুরের আবেদন যে কত গভীর, মর্মস্পর্শী ও জনপ্রিয়, তার প্রমাণ আজো পাক-বাংলার এক বিরাট অঞ্চলে রয়ে গেছে। এসব ছাড়াও কবির কণ্ঠ ছিল উদাত্ত ও আকর্ষণীয়। তিনি ২০।৩০ হাজার লোককে সঙ্গীতে মুগ্ধ করেছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা, একথা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা গেছে।

গান নিয়ে সবচেয়ে বড় অসুবিধে হোল এই যে সুরকে বাদ দিয়ে গানের সত্যিকার রস উপলব্ধি করা যায় না। শুধুই কথার গাঁথুনীর ওপর নির্ভর করে গানের মূল্য-বিচার সঠিক হতে পারে না। সুর ছাড়া গান প্রাণহীন মানুষের মতো। শুধুই কতকগুলো শব্দের সমাবেশ অথবা মনে ঝংকার সৃষ্টি করতে যে পারে না তা নয়, তবে শব্দের সাথে সুরের সমাবেশ হলে মানুষের মনে তার ঝংকার বা আলোড়ন সৃষ্টির ক্ষমতা শতগুণে বেড়ে যায়। রবীন্দ্রনাথের ‘পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে’ একেবারেই সাধারণ কথা, কিন্তু এ কথাগুলোই যখন বিশিষ্ট শিল্পীর কণ্ঠে শোনা যায় তখন সব মিলিয়ে যে অসাধারণ ছোঁয়ার সৃষ্টি হয় তা মন থেকে মুছবার নয়। পাগলা কানাইয়ের গানগুলো সম্পর্কেও একথা সত্য। তাঁর কিছু কিছু গানের রূপ দেখে সাধারণ বা কোন ক্ষেত্রে একেবারেই সাধারণ মনে হতে পারে। কিন্তু গ্রাম্য বরাতি বা গায়কেরা যখন

এগুলো কবি-প্রদত্ত স্বরে গাইতে থাকে তখন তারা নিজেরাই শুধু তন্ময় হয় না, অন্যকেও অভিভূত করে। সুতরাং পাগলা কানাইয়ের যে গানগুলো আমি এখানে তুলে দিয়েছি স্বর ছাড়া সে গুলোর সত্যিকার রসগ্রহণ যেমন সম্ভব নয়, মূল্য-বিচারও তেমনি যথার্থ হতে পারে না বলে আমি মনে করি। তবু কবির কবিত্ব বিচারের জন্য এগুলো অপরিহার্য।

কবি পাগলা কানাইয়ের গানগুলোকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে মোটামুটি কয়েক ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এর মধ্যে দেহতত্ত্ব, জারি, বাউল, ধূয়া, মারফতী, মুর্শিদী প্রভৃতি জাতীয় গান প্রধান। এ ছাড়াও তাঁর কতকগুলো গান রয়েছে যেগুলোতে সমসাময়িক স্থানের বর্ণনা ঠাঁই পেয়েছে। কবি যেখানেই গিয়েছেন, সেখানকার পরিবেশ ও মানুষকে কোন না কোনদিক থেকে তাঁর ভাল লেগেছে। তাছাড়া গানের মধ্যে মাঝে মাঝে তিনি হিন্দু পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও কোরাণ-হাদিস থেকে উপমা সংগ্রহ করেছেন। এ সবই কবির জ্ঞানানুসন্ধিৎসার পরিচায়ক। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তিনি যে ব্যাপক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, তা তাঁর গান থেকে বুঝতে পারা যায়। আর এ অভিজ্ঞতা ছিল বলেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন জীবনের যত আশ্চর্য, যত বাড়াবাড়ি সব কিছুর অবসান মৃত্যুতে। সুতরাং এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে কর্মের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা অর্জনের সাধনা নিশ্চয়ই কাম্য ; কিন্তু তাই বলে জীবন যেন কর্ম-সর্বস্ব হয়ে না ওঠে। কর্মের সাথে চিন্তা চাই—এ চিন্তা আধ্যাত্মিক চিন্তা—স্রষ্টার সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলবার চিন্তা। সাধনার মধ্য দিয়েই এ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে—

তোর সাথী যারা জুয়াচোর তারা

যাস না রে কথার মধ্য,

ভজন সাধন করিস মন তুই

সামনে রেখে স্রবুন্ধি ॥

কবি উপলব্ধি করেছেন চারদিকে ফাঁকিবাজ, জুয়াচোর আর ফেরেস্বাজদের আনাগোনা। সুতরাং জীবনে স্রবুন্ধিকে আশ্রয় করে সাধনায় ব্রতী হলে তবেই সেই পরম সুন্দর ও চরম সত্য আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যাবে এবং

তখনি এই নখর জীবনের সার্থকতায় ভরে উঠবে । এ সাধনার মূলে যে সূফী বিশ্বাস রয়েছে, সেকথা পূর্বে বলেছি । পাগলা কানাইয়ের এই সুরের সাথে লালন শাহের সুরের সাদৃশ্য লক্ষণীয়—

এই মানুষে আছে রে মন

যারে বলে মানুষ রতন

লালন বলে পেয়ে সে ধন পারলাম না চিনতে ।

অন্যত্র লালন বলেছেন—

দেহের মাঝে আছে রে সোনার মানুষ

ডাকলে কথা কয়,

তোমার মনের মধ্যে আর এক মন আছে গো

তুমি মন মিশাও সেই মনের সাথে ।

এই মনের মানুষ আর কেউ নয়—তিনিই পরমাত্মার এক স্নগহান সত্তা—তাঁর জন্মই আমাদের মানবাত্মা যুগ যুগ ধরে এতো ব্যাকুল । জামীর ভাষায়—

Wherever you seest a veil

Beneath that veil He hides

Whatever heart

Doth yield to love, He charмест.

পার্থিব জগত বঙ্কা-সংকুল সমুদ্রের মতো । জীবন-তরী এ সমুদ্রে ডুবে যেতে পারে—সেজন্তু কবি বারবার মন-মাঝিকে ছঁশিয়ার করেছেন—

(বল) তুই কেমন করে যাবি রে পারে

ও তোর জীর্ণ তরী তুফান ভারি

তরী কখন ডুবে যায় রে ।

এই ভব-সমুদ্রে শুধুই নিজের ওপর নির্ভর করে তরী পারে নেয়া যাবে না—  
আল্লাহ এর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা । তাঁর ওপর নির্ভর করতে হবে—

পাগল বলে নাই আর উপায়

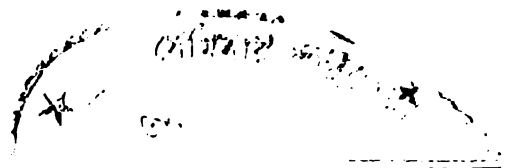
বিনে রে সেই দীন দয়াময় ভাই রে

ভবের নাবিক তিনি চিন্তামণি

তুই ডাকরে ত্রায় তাঁরে ॥

এই হোল কানাইয়ের সাধনার স্বরূপ। মানুষ সৃষ্টির দিনে হয়তো এই পাক-পরওয়ারদিগার আল্লাহকে স্মরণ করে না, কিন্তু পৃথিবী থেকে বিদায়ের দিন যতই ঘনিষে আসতে থাকে, বিপদের কালোমেঘ যখন চারদিক থেকে আচ্ছন্ন হয়ে আসে তখন কে একজন আছেন তাঁর কাছে আশ্রয় না চেয়ে উপায় থাকে না। কঠোর বাস্তববাদী বা নাস্তিক মুখে যদি এ সত্যকে অস্বীকারও করে, তবু মন তার হয়তো জ্ঞাতে কিংবা অজ্ঞাতে মানবাত্মার সেই পরমতম জনের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করবেই—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘তর্ক তারে পরিহাসে মর্ম তারে সত্য বলি জানে।’ পাগলা কানাই ভক্ত-হৃদয়ের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন বারবার এই সর্ব-কালজয়ী সর্বজ্ঞ আল্লাহর কাছে। আর সেই সাধনালব্ধ সত্যকে মানুষের কল্যাণের জন্ত তুলে ধরেছেন তাঁর গানে। একজন শাস্ত্রজ্ঞ প্রচারক দিনের পর দিন বিচিত্র ভঙ্গীতে প্রচার কাজে লেগে থেকে মানুষের মনকে যতটা উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি, পাগলা কানাইয়ের গান তার চেয়ে অনেক বেশী করে মানুষের হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে।

পাগলা কানাইয়ের গানে সমসাময়িক সমাজের মোটামুটি একটা ছবি ধরা পড়েছে। সমসাময়িক সমাজের ছাপ প্রত্যেক সাহিত্যিকের লেখায় কম-বেশী প্রকাশ পেয়ে থাকে। পাগলা কানাই যখন সঙ্গীত সাধনা করছেন, তখন সমাজ ও সমাজের মানুষকে ছাড়া সাহিত্য সৃষ্টির কল্পনা প্রায় রুদ্ধ হয়ে এসেছে। সমাজের বিভিন্ন দিক বিচিত্র চিত্রে সাহিত্যে প্রতিফলিত হচ্ছে। কবি পাগলা কানাই অশিক্ষিত কবি হয়েও সমাজকে তাঁর গান থেকে বাদ দিতে পারেন নি—কম-বেশী সমাজচিত্র তাঁর সাহিত্যে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে ধরা পড়েছে। তবে কবি সজ্ঞানে সমাজের বিভিন্ন দিককে প্রধান্য কমই দিয়েছেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল সমাজ নয়—সমাজের মানুষ, দেহে ও আত্মায় যে মানুষ বিচিত্র এবং স্রষ্টার সাথে এক নিবিড় সম্পর্কে যে মানুষ আবদ্ধ। কবি যখন গান রচনায় নিমগ্ন, সে সময় আমাদের বিস্রম্ত সমাজ ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে মোটামুটিভাবে স্থিতিশীল আবস্থায় ফিরে এসেছে। অর্থনৈতিক বিপর্যয় কিছুটা থাকলেও তা মানুষকে বর্তমান কালের মতো এমন ত্রিশঙ্কু অবস্থায় নিয়ে এসেছিল না। দু’টাকা বেতনে যে চাকরি করতো, তারও সংসার কোন রকমে চলে যেতো। অনাভাব তখন থাকলেও বর্তমান কালের মতো



এমন প্রকট ছিল না। অর্থ ও অনের দুশ্চিন্তা কম ছিল বলেই লোকে গান-বাজনা, নাচ-যাত্রা, খেলাধুলোর মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করতো। পরাধীনতার ঘ্রানি ছিল, বর্তমান কালের মতো আরাম-আয়েশের উপকরণ একান্তই দুর্লভ ছিল, প্রাচুর্যও ছিল খুব কম ক'জনের; কিন্তু তবু পল্লী-বাংলার বেশির ভাগ লোক বর্তমান কালের চেয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত যে ছিল, তা বোঝা যায় তৎকালের গান-বাজনা, নাচ, যাত্রা প্রভৃতির প্রচলন দেখে। বর্তমানে পল্লী-বাংলার এসব প্রায় লোপ পেতে চলেছে। এর পেছনে অগ্র সব কারণের মধ্যে অর্থ ও অনচিন্তাও রয়েছে বলতে হয়।

যাক সেকথা, পাগলা কানাইয়ের সময় আর বর্তমান কালের মধ্যে সময়ের ব্যবধান খুব বেশী দিনের নয়—৭৫৮৫ বছরের হবে। সুতরাং তখনকার সামাজিক অবস্থার সাথে বর্তমান সামাজিক অবস্থার বিরাট একটা পার্থক্য গড়ে উঠেছে, এমন কথা বলা যায় না। সে জন্য কানাইয়ের গানে সমাজের যে সব দিক এখানে ওখানে প্রকাশ পেয়েছে, তার বিস্তারিত আলোচনা নিম্নয়োজন মনে করছি। একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, পাগলা কানাইয়ের জীবনকালেই ১৮৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এক করাল দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয় এবং কয়েক বার বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে দেশের সমূহ ক্ষতি হয়। পাগলা কানাইয়ের গানে এ সবার চিত্র আছে। দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে তাঁর গান আছে এমন শুনেছি কিন্তু সংগ্রহ করতে পারিনি। সমাজের এমন চরম দুর্দিনের স্মরণ কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হবে না এ হতেই পারে না। কানাই সমাজের এই দুর্দিনগুলোর কথা তাঁর গানে রূপ দিয়ে গিয়েছেন—কিন্তু সব গান সংগ্রহ করা যায়নি অথবা যারা জানতো, তারা হয়তো বেঁচে নেই; তাই কোনদিনও হয়তো সংগ্রহ করা যাবে না। বন্যা সম্পর্কে লিখিত একটা গান আমি সংগ্রহ করেছি। এ গানে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত আছে—

এবারকার দুঃসময় বর্ষায় ধান পাট সব তলায়্যা গেল  
ভেবে আর কূল পাই না সাকুল্যে মনের সখ মাটি হ'ল  
রাজার খাজনা মহাজনের দেনা কি দিয়ে আদায় করি  
ভাবছি বসে অবিরত মনে সেই চিন্তা ভারি।

স্বীকার করতেই হবে যে, কবির মনে সমস্যাগূলক সামাজিক রীতিনীতি বা অবস্থা খুব বেশী দাগ কাটতে পারেনি। এজন্য যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন, তা কবির ছিল না। সেজন্য যখন দুর্দিন নেমে এসেছে, তার বাহ্যিক বর্ণনা কবি গানের মধ্যে আরোপ করতে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু এ দুর্দিনের উৎস যে কোথায় তা বিশ্লেষণ করবার সূক্ষ্ম-মানসিকতা কবি আরও করতে পারেননি। এই অক্ষমতার সাথে যুক্ত হয়ে ছিল তাঁর স্বভাবসুলভ আধ্যাত্মিক চিন্তা—কোন বিপদ বা সমস্যা এলেই অষ্টাকে স্মরণ করে তা থেকে উদ্ধার পেতে হবে—এই আত্মগত ধারণা। সেজন্য ব্যক্তিজীবনের ব্যথা-বেদনা ও সমাজজীবনের দুঃখ-দৈন্য যখন যেটি আশ্রুক, তার সমাধান যে সেই মহান অষ্টার হাতে, একথা বলেই কবি ধ্যানস্থ হতে চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর শ্রোতাকে সেদিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিয়েছেন—এ যুগের কবি-সম্রাটের ভাবার বলা চলে ‘মিথ্যা আপনার সুখ মিথ্যা আপনার দুঃখ।’

মোটামুটিভাবে এটুকু বলেই পাগলা কানাই সম্পর্কে আলোচনার ছেদ টানছি। কানাই সম্পর্কে যা বলেছি তা হয়তো বেশি বলা হয়েছে অথবা যা বলবার তা যথার্থভাবে বলতে পারিনি। সমালোচক পাঠকের অবগতির জন্য রইল কবির এ-যাবৎ সংগৃহীত সমস্ত গান। এ থেকে কবি সম্পর্কে সূচু ধারণা গড়ে তুলতে তাঁদের অন্তর্বিধে হবে না বলে আশা করি।

## ॥ সমালোচকের দৃষ্টিতে পাগলা কানাই ॥

“পাগলা কানাই একজন ভক্ত ও সাধক পুরুষ ছিলেন। ইহার বিরচিত দেহতত্ত্ব-বিষয়ক গীতগুলি অতি গভীর ও মর্মস্পর্শী।”

( শ্রী দুর্গাপ্রসাদ লাহিড়ী, বাঙ্গালীর গান, পৃঃ ৭৬৪ )

(বাউলদের) “এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেচে, কোরাণ পুরাণে ঝগড়া বাধেনি।” ( —রবীন্দ্রনাথ, ভূমিকা, হারামণি )

“কানাই প্রথমতঃ গুরুর উপদেশানুসারে সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া উন্নতবৎ হইয়াছিলেন, এইজন্য ইহার নাম রটিল পাগলা কানাই। সাধনাবলে আত্মশক্তির বিকাশহেতু অবশেষে ইহার অপূর্ব শক্তি জন্মিল, আসরে শ্রোতৃবর্গের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি একসঙ্গে গান রচনা ও গাওনা করিতে সমর্থ হইতেন।”

( —শরৎচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, পৃঃ ১৫৯ ) ।

“আহা প্রতিভার কি মহীয়সী শক্তি—কানাই যথার্থ ই প্রেমিক।”

( —শরৎ কুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ )

“পাগলা কানাইয়ের জারীগান বঙ্গ প্রসিদ্ধ। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার রচনার প্রশংসা করিয়াছেন।” ( —হারামণি, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪ )

“কানাইয়ের গান বঙ্গীয় নিম্নস্তরের ধর্মপ্রাণতা ও দেহাত্মবাদের সাক্ষী, এজন্য ইহার অনুবাদ পাশ্চাত্য মুল্লকেও অবজ্ঞাত না হইতে পারে। তাঁহার গান সরল ও স্বাভাবিক। তাঁহার ছিল হৃদয়ে কবিত্ব, মুখে মিষ্টি কথা, কণ্ঠে পাপিয়ার সুর, আর চরিত্রের অপূর্ব বিনয়শীলতা।”

( —শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড )

“তোরা তো কানাইয়ের গান শুনিস নাই, তাহার গান শুনিলে লোকে পাগল হইয়া যায়।”—কাজল হরিনাথ (‘কাজল হরিনাথ’—২য় খণ্ড, জলধর সেন, পৃঃ ৪২)

“এক সময়ে পাগলা কানাইয়ের গানে যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা ও নদীয়া জেলার অংশ বিশেষ ভাসিয়া গিয়াছিল। তাঁহার গান শুনিবার জন্য এক এক

সময় চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান একস্থানে সমবেত হইত। এক দিনের পথ হাঁটিয়া লোকে পাগলা কানাইয়ের গান শুনিতে আসিত।”

( —জলধর সেন, ‘কাজল হরিনাথ’—২য় খণ্ড )

“লালন ফকির ও পাগলা কানাই বাংলার জনসাধারণের রস-পিপাসা নিবারণ করিয়াছেন। এই গানগুলি সত্যই রসপূর্ণ। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের সাধনা সম্পর্কে আলোচনা করিতে গেলে লোক-কবিদের রচনারও মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে। লৌকিক সাহিত্যের সাধনায় মুসলমানদের নাম চিরস্মরণীয়।”

(অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ১০০। জনাব অধ্যাপক সাহেব সংবাদ, ১৩-১১-৬৫ তারিখে কানাইয়ের জারীগান সম্পর্কে ও মাসিক মোহাম্মদী চৈত্র, ১৩৬২ সংখ্যায় কবি সম্পর্কে মামুলি আলোচনা করেছেন বলে সেগুলো উল্লেখ করলাম না)।

“রবীন্দ্রনাথ ‘সাধক ওগো প্রেমিক ওগো পাগল ওগো’ বলে সাধক ও প্রেমিককে পাগলের পর্যায়ে ফেলেছেন। পাগলা কানাই সে অর্থেই ছিলেন পাগল অর্থাৎ সাধক ও প্রেমিক। তাঁর দেহতত্ত্ব বিষয়ক বহুগানে সহজবোধ্য উপমা ও অলঙ্কারের সহযোগে যে উপায়ে নিগূঢ় ভাবের বাণীরূপ দান করা হয়েছে তার স্বকীয়তা ও সার্থকতা অনস্বীকার্য।” ( —আবদুল কাদির, পাকিস্তানের লোক-কবি )

“পাগলা কানাইয়ের মধ্যে যে বিপুল প্রাণ-শক্তি, গভীর ভাব-ব্যঞ্জনা, ছন্দবোধ এবং গীতি-প্রবণতা ছিল তা যদি উপযুক্ত শিক্ষার আলোক পেত, তবে বাংলা সাহিত্য তাঁর লেখনীর দানসম্ভারে হয়তো সমৃদ্ধ হয়ে উঠতো। তাঁর গানগুলোর মধ্যে জীবন ও জগতের প্রতি যে নিগূঢ় মমত্ববোধ রয়েছে, তা বহু শিক্ষিত কবির কাব্যেও বিরল।”

( —মাহেনও, সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ )

“সামান্য জারী গানের বয়্যাতী হলেও পাগলা কানাই তাঁর গানে যে অসাধারণ রস-দৃষ্টি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, শুধুমাত্র বাংলা দেশের ইতিহাসে কেন, যে কোন দেশের ইতিহাসে তার তুলনা বিরল।” —অধ্যাপক মুঃ আবু তালিব।

( আজাদ, ৮ই ফাল্গুন, ১৩৬১ )



## ॥ পাগলা কানাইয়ের গান ॥

এ পর্যন্ত পাগলা কানাইয়ের যত সংগৃহীত গানের সন্ধান আমি পেয়েছি, সবই এখানে উদ্ধৃত হোল। এর মধ্যে আমার সংগৃহীত গান ছাড়াও জনাব অধ্যাপক মনসুরউদ্দিন ও অধ্যাপক আবু তালিব সাহেব দ্বয়ের সংগৃহীত গান আছে। আবু তালিব সাহেবের একটামাত্র গান আমি নিয়েছি—মনসুরউদ্দিন সাহেবের বেশ কয়েকটা আছে। মনসুরউদ্দিন সাহেবের অনেকগুলো গান মাসিক মোহাম্মদী ও বাংলা একাডেমী পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। এর মধ্যে আমার সংগৃহীত ও প্রকাশিত গানকেও তিনি স্থান দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, এ পর্যন্ত আমিই পাগলা কানাইয়ের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক গান সংগ্রহ করেছি। আমার সংগৃহীত গানের মধ্যে এমন অনেক গান রয়েছে—যা জনাব মনসুরউদ্দিন সাহেব অন্যত্র থেকে সংগ্রহ করে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। সে সব গানের মধ্যেও তাঁর ও আমার সংগৃহীত কোন কোন গানে সামান্য এবং কোন কোন গানে ব্যাপক পার্থক্য আছে। উৎসাহী পাঠক মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। গানগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে অশিক্ষিত মানুষের মুখ থেকে। স্মরণ্য মাঝে মাঝে শব্দ-বিকৃতি যে ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। তবু যতদূর সম্ভব আমি এ বিকৃতি থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করেছি—যাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি তাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে যথার্থ শব্দ আবিষ্কার করতে প্রয়াস পেয়েছি। ওপরে উল্লিখিত ব্যক্তিদের গান ছাড়াও শ্রী ভূর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত ‘বাঙ্গালীর গান,’ জনাব আবদুল কাদির সম্পাদিত ‘কাব্যমালক’ প্রভৃতি গ্রন্থে উদ্ধৃত গানগুলোও এখানে সন্নিবেশিত হোল। এসব মিলিয়ে আমি পাগলা কানাইয়ের একটা পূর্ণাঙ্গ সংগ্রহ এখানে দাঁড় করিয়ে তাঁর কবি-প্রতিভার স্বরূপ বিচার ও বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি। বলা-বাহুল্য আমাদের পুথি-সাহিত্যের ও বিখ্যাত পল্লী-কবিদের প্রত্যেকের সমগ্র কাব্য, কবিতা ও গান এভাবে একত্র গ্রথিত করে প্রকাশ করবার প্রয়োজন আজ আমরা খুব বেশী অনুভব করছি—আমার এ সংগ্রহ সেই প্রয়োজন কতটুকু মিটিয়েছে জানি না, তবে আমি চেষ্টার ক্রটি করিনি। অবশিষ্ট কবি-রচিত সমস্ত গানই এখানে উদ্ধৃত হয়েছে, একথা বলবার ধৃষ্টতা আমার নেই। কেননা যশোহর,

খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, পাবনা, বগুড়া, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায় প্রচুর চেষ্টা করে কবির গান যা পেয়েছি, সবই সংগ্রহ করেছি, কিন্তু এসব ছাড়াও হয়তো বহু গান আমাদের অজ্ঞাতে পল্লীর নিভৃত অঞ্চলে মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। ভবিষ্যতে সেগুলো সংগৃহীত হলে কবি সম্পর্কে আরো বহু তথ্য জানা যাবে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার জ্ঞান অপেক্ষা না করে যতটুকু জানা গেছে তা দিয়েই কবিকে বিচার করা ও সবার কাছে তুলে ধরা সমীচীন মনে করেছি।

সমগ্রভাবে এখানে উদ্ধৃত অন্তর সংগৃহীত গানগুলোর জন্য কারো কারো কাছ থেকে অনুমতি নেয়া সম্ভব হয়নি বলে আমি তাঁদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। গানগুলো এখানে বিয়বস্তুর ভিত্তিতে সাজান হোল। কিছু কিছু গানের নীচে টীকা দিয়ে সংক্ষিপ্ত অর্থ-বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি। কোন কোন গান এতো বেশি হেঁয়ালিপূর্ণ যে, তাদের যথার্থ অর্থোদ্ধার সম্ভব হয়নি। তাছাড়া কবির সমস্ত গানের টীকা দিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে হলে আলোচনার কলেবর অসম্ভব বেড়ে যাবে বলে বিরত থাকতে হয়েছে।

অন্তর গৃহীত গানগুলোর নীচে সংগ্রাহকের নাম দেয়া হোল। জনাব মনসুরউদ্দিন সংগৃহীত গানগুলোর নীচে সংক্ষেপে (মঃ উঃ সঃ=মনসুর উদ্দিন সংগৃহীত) তাঁর নাম উল্লেখ করেছি।

### যে গানগুলোর নীচে কোন নাম নেই সে সব আমার সংগৃহীত।

গান সংগ্রহের ব্যাপারে আমার স্নেহভাজন ছাত্র এবাদত আলী মোল্লা ও ছোট ভাই আব্দুল খালেক আমাকে যে ভাবে সাহায্য করেছে তা উল্লেখ না করলে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে। মামুলি ধন্যবাদ দেয়ার মতো সম্পর্ক তাদের সাথে আমার নয়।

## ॥ বন্দনা বা হাম্দ ও নাত ॥

( ১ )

সালাম সালাম সালাম রাশি দশের পায়  
পয়লা সালাম করি আমি খোদার দরগায়  
তারপর সালাম করি নবীজিরে  
যিনি শূর্য্য আছেন মদিনায়  
ওরে সালাম করি ওস্তাদেরে আর সালাম পিতামাতায়  
অধম আমি পাগলা কানাই আ'ল্যাম' চাঁদ সভায়  
আল্লা তরাও হে আমায় ।

টীকা :—গানটা কবির প্রথম কবিত্ব-শক্তি বিকাশের পরিচয় বহন করে ।  
অন্যত্র একথা আলোচনা করেছি । এর সাথে আরও অংশ আছে কিনা  
জানি না—তবে এটুকুই পাওয়া গেছে ।  
'আ'ল্যাম—আসিলাম ।

( ২ )

ওগো আল্লা দীনবন্ধু ডাকছি বারেবার  
এ অধীনকে দয়া করে ভবসিন্দু কর পার  
তোমার লীলা বুঝতে পারে ভবে  
এমন সাধ্য আছে কার ?  
তুমি করিম তুমি রহিম আল্লা তুমি হও জব্বার  
বায়তুল্লাকে মুজাম রাখো, পাথর রাখো শূন্য পর  
ইউসুফকে ফেললো কুয়ার গাঝে  
তরালে মালেক পরওয়ার  
আল্লা তোমার নাম ভরসা করে  
সভায় আ'ল্যাম আমি  
পাগলা কানাই ডাকছে বারেবারে  
তরাও আল্লা গণি  
বিষম কালে কোথায় রলি যা বরকত জননী ।

টীকা :—গানের আসরে দাঁড়িয়ে কবি আল্লাকে স্মরণ করছেন । মনসুরউদ্দিন  
সাহেব সংগ্রহ করলেও এখানে উদ্ধৃত গানটা আমার সংগৃহীত ।

( ৩ )

দেওয়ান খেজের চাঁদ—ও আমার দেও আসে আছান  
 পাগল কানাই ডাকে তোমায়—সামনে দেখি তুফান  
 ও তোমার নামের নহিনা আল্লা কোরাণে বলে  
 আমি দেশ বিদেশে ফিরত্যাচি ঐ নামেরি বলে  
 ওয়ে খেজের নামের জোরে যেনন  
 আগুন হয় পানি  
 পানিতে সমুদুরে বিপদে হয় আছানি  
 আল্লা আছে সবার পরে,—খেজের সে  
 কাফালের কাণ্ডার  
 গোনাগার হওরে যদি—দরিয়ায় তারই নামে  
 হয়্যা যাবা পার  
 তার নাম ভরসা করে আমি আজ দিয়াছি সাঁতার ।

টীকা—কবি এখানে অন্ধকারে আবহায়াত-প্রাপ্ত খেজুর ( আঃ ) এর কথা বলেছেন । কথিত আছে তিনি জঙ্গলে বা পানিতে বিপদ-গ্রস্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করেন । গানটা আমি এক চর অঞ্চল থেকে উদ্ধার করেছি । সম্ভবতঃ কবি কোন এক নদী-কেন্দ্রিক চর অঞ্চলে এসেই এ গান রচনা করে থাকবেন ।

গানটা জনাব মনসুরউদ্দিন সাহেবও সংগ্রহ করে ১৩৬৩ সনের আষাঢ় সংখ্যা মাসিক মোহাম্মদীতে ( পৃঃ ৮০২ ) প্রকাশ করেন । কিন্তু আশ্চর্য, সেখানে সর্বত্র খেজুর স্থানে কালা ( কৃষ্ণ ) শব্দ রয়েছে । পাগলা কানাইয়ের গানে কোথাও এমন কৃষ্ণ প্রশস্তি নেই । বিশেষ করে কোরাণে আল্লাহ কৃষ্ণের প্রশস্তি করেছেন, পাগলা কানাইকে যতটুকু বুঝেছি, এ কথা কিছুতেই তিনি বলতে পারেন না । সুতরাং মুসলমানী গানও কিভাবে হিন্দু আদর্শে রূপ বদলায় এ তারই এক নিদর্শন । এখানে আমার সংগৃহীত গানই যে আসল তাতে সন্দেহ মাত্র নেই । উৎসাহী পাঠক মিলিয়ে পড়লেই বুঝতে পারবেন ।

( ৪ )

গুরু ভজব বলে ছিল বাসনা  
 আমি পারলাম না রে ভাই  
 আমি দিন থাকতে মুরসিদ ধইরে  
 সাধন ভজন করতে চাই  
 কাওড়া<sup>১</sup> লাগায় মদনচাঁদ<sup>২</sup> গোসাঁই  
 আমি কাজে মাতাল হয়েছি বেতাল  
 আরও চৌতালে বেড়াই  
 আমি চোরের দেশে করি বসতি  
 ও সদায় সিং কাটে ঘরে  
 ওরে মদনা বেটা দুষ্ট ভারি  
 প্রাণ কাঁদে তাহার ডরে  
 আমি সাধন ভজন করি কেমন করে ?  
 গুপ্ত তলায় চোরের অধিকার  
 ও তারে ধরি কেমন করে ।  
 কাম ক্রোধ লোভ মোহ মায়া—  
 ও যার অন্তরেতে নাই  
 তারই হচ্ছে সাধন ভজন  
 এই অধীনের শক্তি নাই  
 মিছে চাটকি চাটাম করিয়া বেড়াই ।  
 পাগলা কানাই বলে তাই মিছে খটখটি  
 ও দেশে বিদেশে ঘুরে পেট বাঁচাই ।

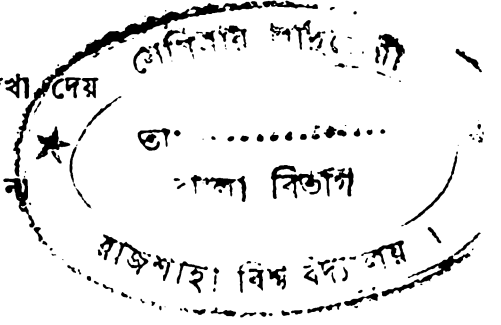
টীকা—গানটা মুর্শিদী জাতীয় । গুরুভজনায় কবির সবচেয়ে বড় বাধা কাম-প্রবৃত্তি ।  
 এ পথে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মায়া এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের  
 কথাও কবি বলেছেন ।

<sup>১</sup> কাওড়া—বাধা সৃষ্টি করা ( দেশীয় ) ।

<sup>২</sup> মদনচাঁদ—কাম দেব ।

( ৫ )

যদি সাধন করতে সাধ থাকে মনে  
 ও তারে ডাকছে দনে দনে  
 নইলে সাধন হবে কেমনে ?  
 আমার দয়াল গুরু দয়ার সাগর  
 সবার মনের ভাব জানে  
 এক ধারা মনে যেই করে সাধন  
 হয় তার ভজন গুরুর চরণে  
 ও যে জন দোদেল বান্দা  
 কালুমা চোরা হয়  
 ও তার সাধন ভজন বৃথা যায়  
 দরে ইন্দুর থাকতে দরের মুখ ছাপায়  
 করে মানুষ দেখলে আল্লা আল্লা  
 দূরে যেয়ে নদা নাচায়  
 ভাইরে ঐ সাধনে কাম হবে না  
 সাধুর নিশান চোরের নায়  
 যে ভাবে ভাই যাহার ভক্তি হয়  
 দয়াল সেইভাবে তাহার দেখা দেয়  
 আমার দয়াল গুরু সবার মন যোগায়  
 সে ধনী মানী পার করে না  
 কাঙ্ক্ষালের নায় সখা হয়  
 ও তার নামের কাঙ্ক্ষাল যে হয়েছে  
 কাণ্ডারী হয় তারই নায়  
 লাগবে না তার পার ঘাটের কড়ি  
 তাই পাগলা কানাই কয়  
 যে উঠতে পারে সেই তরীতে  
 ও তাড়াতাড়ি সে পার হয়ে যায় ।



টীকা—এখানে কবি তাঁর দয়াল গুরুর সাধনার কথা বলেছেন। এ সাধনায়  
 মনে ও মুখে এক হয়ে যে একাগ্র ভাবে অগ্রসর হয়, সেই সার্থকতা অর্জন  
 করতে পারে। এই গানে ভাব-সাধনায় নিবেদিত-চিন্ততার কথাই কবি বলেছেন—  
 ধন বা মানের বড়াই নিয়ে নয়,—একেবারেই কাঙ্ক্ষাল হয়ে যে আত্মনিবেদন

করতে পারে, তার কাছেই তিনি ধরা দেন। ভাছাড়া মানুষ দেখানো  
এবাদতকেও কবি এখানে তীব্র কশাঘাত করেছেন।

১ দরে—গর্তে।

( ৬ )

ওরে মনের দুখ বলবো কারে শোন ভাই সকল  
আমি হয়েছি উলাই পাগল  
ছয় জনা আমার দেহের মদি করে গোঙগোল  
আমার আমি ভাই চিন্লাম নারে  
আমি ভুলেছি সেই গুরুর বোল  
লোকে বলে হয়েছি পাগল  
আমি কেমন করে যাব ভবপারে  
আমার পারের নাই সম্বল।  
সেই পারের ঘাটে দিচ্ছে খেওয়া গুরু কর্ণধার  
সে যে ধারেনা পয়সারই ধার  
রসিক জনে পাইলে পরে অমনি করে পার  
ও যদি প্রেম রসিক হইতে পার  
আগে বান্দরে সেই প্রেমের ধার  
গুরুর চরণ করবে নেহার  
ও সেদিন গুরু হবে ভবতীর ভাই  
শিষ্য হবে কর্ণধার।  
পাগল কানাই বলে শুনরে কোরবান কই তোরে  
ও তুই যাবি যদি ভব পারে  
গুরুর চরণ সম্বল রাইখা চড় ইষ্টিমারে  
সে যে অনায়াসে পার করে নিবে  
গুরুর ঐ চরণের জোরে—  
পয়সা কড়ি লাগবে না পারে  
ও সেদিন চরণ টিকিট দেখাইলে ভাই  
ওমনি দিবে ছাড়ে।

টীকা—ছয় রিপূর হাত থেকে বাঁচতে হলে গুরু ধরে সাধনা করতে হবে—  
একথাই কবি বলেছেন। কোরবান—কবির প্রিয় শিষ্য। কোরবান জীবিত

থাকতে এ গানটা লেখা হয়। পরে তিনি মারা যান এবং কবি এতে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন। পরবর্তী করেকটা গানে তার প্রমাণ আছে।

( ৭ )

পাগলা কানাই বলে ও মন রসনা  
 গুরু চরণ কর সাধনা  
 সমন জ্ঞানার ভয় রবে না ভয় রবে না  
 আপ্ত, তব, পরম আপ্ত—জ্ঞানীজনে জানে অর্থ  
 অজ্ঞানে তা জানে না  
 সেই গুরু চরণ নিষ্ঠুর অতি  
 তারে কেউ চিনল না  
 চণ্ডীদাস ও বনজয় ঠাকুর রে  
 কারে কেউ ছাড়তে পারল না  
 নব রসে নব কীতি  
 করতে পারলে আদর ভক্তি  
 নয়ন ভরে দেখতে পারি চক্ৰিশ পরগণা<sup>১</sup>  
 আরও গুরুর নামে ডকা মারে  
 যাবিরে মন ভব পারে  
 যাবিরে মন রসনা,  
 সেই গুরু চরণ করলে স্মরণ মরণ হবে না।  
 তাই পাগলা কানাই বলে  
 ও কোরবান \* মরণে কেউ সঙ্গী হল না।  
 এক মরণ মরছিল কবির জোলা  
 ও তার আফছোছেতে পাগলা ভোলা  
 কাঁন্দে লয়ে আঁচলা বোলা  
 আরও হাড়ের মালা  
 সে যে শ্মশানে মশানে থাকে  
 সর্ব অঙ্গে ভস্ম মাখে  
 সদাই থাকে গাছতলা  
 রূপ নিহারে বইসে সদায় বাজায় বোম ভোলা  
 আরও অহল্যা পাষণী ছিল, সেই জানে মরণের জ্ঞান।  
 ( ম: উ: স: )



টীকা—এখানেও কবি গুরুভক্তির কথা বলছেন। প্রসঙ্গক্রমে কবি চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ ভক্তির কথা এবং কবিরের এক ভক্ত ভোলার কথা উল্লেখ করেছেন। কোরবানের নিবাস সম্ভবতঃ পাবনা জেলায় ছিল। এই জেলায় তাঁর কয়েকটা গান পাওয়া গেছে। তাঁর অকালমৃত্যুর কথাও প্রচলিত রয়েছে।  
 ১ চব্বিশ পরগণা—চব্বিশ দায়রা। সুফী সাধনা মতে এই চব্বিশটা স্তর পার হয়ে তবে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়।

( ৮ )

চাঁদ সভাতে বল আল্লার নাম  
 আমার আল্লা বড় মেহেরবান  
 নাম শুনেছি মালেক সোবহান  
 ও তার কুদরতে পয়দা জমিন ও আস্‌মান  
 খাম খুঁটি নাই শূন্যে থাকে ক্যান  
 তাই বুঝে মন হও হুঁশিয়ারী  
 শোন ভাই মোমিন মুসলমান ॥

করিম রহিম কুদরতের ধ্বনি  
 আমি মুশিদের মুখে শুনি  
 আরেক নাম তাঁর কাদের গণি  
 আল্লা রসুলের এই দুটি নাম পুরাণ হয় না কি জনি  
 সেই কথা ভাবি রাত্রি দিনই  
 ওরে যার নামের জোরে মূর্তি ভেঙ্গে যায়  
 সে কথা কোরাণে শুনি ॥

ভাইরে আরেক কথা শুনি কোরাণে  
 আবার হাসরের সেই ময়দানে  
 নেকি বদী যাবে ওজনে  
 দোয়া ধর্ম নামাজ রোজা সাক্ষী দিবে চারজনে  
 বান্দার হিসাব হবে সেই দিনে  
 যে জন করবে নেকি যাবে ভেসে  
 বদির স্থান হবে দোজখে  
 কানাইর কি হবে সেই দিনে ॥

টীকা—গানটা আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্যব্যঞ্জক। রোজহাসর বা শেষ বিচারের দিনের কথাও কবি এখানে বলেছেন।

( ৯ )

প্রথমে সালাম গো জানাই আল্লা নবীর পায়  
তারপরে সালাম গো জানাই দশজনের ঠাঁয়  
তারপরে সালাম গো জানাই  
আরে ও হারে ওস্তাদ যেজন হয় ॥

এ মা নবীর বেটি দুনিয়ার খুঁটি ভেসে দাওনদার  
পুলসিরাতে দাউন ধরে আপনি করবেন পার  
তোমার নামের জোরে আইছি চল্যা গো  
হারে ও, ওমা যা কর এইবার ॥

এ মা আপ্ত ছিল। গুপ্ত হল্যা দেখলাম নয়নে  
অধম পাগল কানাই ডাকছে তোকে হরদমে দমে  
কিঞ্চিৎ দাও পদ ছায়া গো  
হারে ও, ওমা তোমার চরণে ॥

এ মা তারা, তারা ও জগতের পারা  
এ মা তারিণী  
যেদিন ইস্রাফিল ফুক্বে সিঙ্গা  
সব হইবে পানি  
নৌকা বিনে ডুববে তোমার পিতার উন্মত্ত  
তা জানি  
তুমি তখন আসবে ওমা,  
মোসলমানের বরকতিনী ॥

টীকা—রসূল (দঃ) ছহিতা ফাতেমা (রাঃ)-র গুণ গান করা হয়েছে এ গানে।

তুলনীয় : বিবি ফাতেমার পদ শিরেতে বন্দিয়া  
রচিব পুস্তক আমি কেতাব দেখিয়া

—হেয়াতমামুদ, জঙ্গনামা।

## মন-কে

( ১০ )

হারে হারে মন ভাবো নিরঞ্জন সাধুর সঙ্গে মিলে  
যে দিন আসবার আচ্যাও<sup>১</sup> রে মন

কিবা বোল বলিয়ে

দেহ ছেড়ে মহা আত্মা যখনেতে যায় চলে  
হায় কিরে তোর মাটির দেহ পড়ে রবে ভবের পরে  
ভাই বন্ধু দাফন করে রে সেদিন নিবেন কব্বরে ॥

\* \* \*

হারে আবোধ মন ওরে পাগল মন বুঝে কেন বোঝা না  
যেদিন কব্বরেতে অন্ধকারে থাকবিরে একেলা  
হবে ঘোর অন্ধকার দেখে চনৎকার

সেই যে রে কি ভয়ঙ্কর

তিন ফেরেস্তু সেজে এসে পুছবে রে তুই বান্দা কার  
কি জবাব দিবি তাহার হুজুরে—সকলে হওরে হুঁশিয়ার ।

\* \* \*

ছাড় ছাড় মন ছাড় ছাড় মন ছাড় ভবের খেলা  
যেদিন ইস্রাফিলের শিঙায় সব হবে আখের ফানা  
তিরিশ রোজা পঞ্চ নাগাজ কোরাণেতে যায় জানা  
অধম পাগল। কানাই বলছে রে ভাই চিনলি না তুই দিনকানা  
তিরিশ রোজা পঞ্চ নাগাজ সকলে কর সাধনা ।

টীকা—মৃত্যুর ভয়াবহতার কথা শুনিয়া কবি এখানে মন-কে সাবধান করেছেন ।

<sup>১</sup> আচ্যাও—এসেছ ।

( ১১ )

পাগল কানাই বলে 'ও মন রসনা

বুঝাইলে বুঝি মানে না

ভবে আসা যাওয়ার যন্ত্রণা

জানলে আর ভবে আসতাম না

আসি বলে ভবে আস্যা ভাবছ আর যাওয়া হবে না  
 আশায় আশায় দিন কুরাবে  
 যাওয়ার দিন নিকটে হবে  
 যেদিন শমন আসে বাঁধবে কষে  
 কাঁদবি তুই একা বসে  
 কাঁদন তোর কেহই শুনবে না ।

\* \* \*

তাই বুঝে কর সাধনা—দিন গেলে কেউ রবে না  
 প্রেম মায়ায় মজে খাও মিছরি দানা  
 আলেম কাজেল তাই বুঝে আর পাগ সাগরে ডোবে না  
 কেউ হয় রাজ্যত্যাগী কেউ হয় অনুরাগী  
 কেউ আবার হয় বৈরাগী, সংসারে আশা রাখে না  
 অধীন পাগলা কানাই কয় মন পাগলা  
 কেনে কর অবহেলা  
 ঐ বুঝি ডুবলো বেলা  
 ছাড় এবার কাম রসের খেলা  
 শমন যদি করবে দমন—সার কর নাম মালেক আল্লা  
 পাগলা কানাই কয় শোনিরে কোরবান আলী  
 বৃথা ভবে আইলি গেলি  
 নিজের ধন পরকে দিয়ে—কাঁধে লও ঝোলা ছালা ।

টীকা—এখানেও কবি মনকে সংপথে চলবার জন্ত সাবধান করেছেন। প্রিয় শিষ্য কোরবানের মৃত্যু কবিকে যে খুবই ব্যথিত করেছিল, গানটাতে তারও প্রমাণ আছে। গানটা জনাব মনসুরউদ্দিন সাহেবও সংগ্রহ করেছেন—কিন্তু আমার এ সংগ্রহের সাথে সে গানের পার্থক্য প্রচুর। শব্দচয়নের দিক থেকে এখানে উদ্ধৃত গানটাই অধিক সঙ্গত।

( ১২ )

শোন বলি শোন ওরে মন পাগল

—তুই রইলি কেন অচেতন

কোন দিন যেন আসবেরে সরকারী শমন

তোর দেহ জমি পতিত রইল—করলি না তার অনুরোধ

ওরে আড়ে দীঘে ঠিক নামায়্যা

কোন কোণে ঈশান কোণ

—কোন কোণের কোণে আছে মহাজন

দিন কানা তাই ঠিক পা'লেম না রইলাম অন্ধলের মতন ।

কোন কোণেতে বসতবাড়ী কোন কোণেতে ঘর ।

দিন থাকিতে ওরে মন সেই জমি জরিফ কর

আড়ে দীঘে ঠিক নামায়্যা ঈশান কোণে দস্তিগার ।

একটা ভক্তির বেড়া দিঘে তাতে—একটা প্রেম ফলের গাছ

রোপণ কর

যাতে জমা খরচ কায়ম হবে তোমার

আর ছয় বলদে খায় না যেন তাই

বাগান রাইখো খবরদার

পাগলা কানাই বলে শোনরে কোরবান কই এখন

—ও তুই চিনলি না পর আপন

আড়ে দীঘে ঠিক নামায়্যা কোন কোণে ঈশান কোণ

কোণ কোণের কোণে আছে মহাজন

দিন কাণা তাই ঠিক পা'লেম না রইলাম অন্ধলের মতন ।

টীক

টীকা দেহরূপ জমিতে বেড়া দিয়ে, হেফাজত করে প্রেমফলের গাছ রোপণ করতে বলেছেন কবি। ছয় বলদ বলতে কবি এখানে ছয় রিপুকে বুঝিয়েছেন। কোরবানের কথা পূর্বে ছোটো গানে বলা হয়েছে।

( ১৩ )

ও আমার মনরে লয়ে ঠেকলাম বিষম দায়ে

সে যে গামছা মোড়ার দলে ফেরে

দমবাজে দমবাজী খেলায় ।

তারে ধরতে গেলে না দেয় ধরা পালায়ে যায় কুটনীপাড়া  
 কেমনে ধরব সে মন চোরা ।  
 সে চোরা চুরি করে নেপুর দিয়ে পায়  
 সে জাগাল ঘরে করে চুরি—ঠিক পায় না দ্বারী পাহারায়  
 ঘরে থাকতে মানুষ করে চুরি—ডংকা মার্যা ঘুরে বেড়ায়  
 তারে ধরা হল বড় দায়  
 হইল সদরপুরে চোরের বসতি  
 কামেতে প্রেম গিলটি করা ধরছে—যার আছে জ্ঞান বাতি  
 ও যেমন আগলা নাও শয়তানের ঘোড়া  
 গুরু বলে যার নাই প্রেম ভক্তি  
 তাই পাগল কানাই বলে  
 হোলরে তার ঠগবাজারে গতি ।

( মঃ উঃ সঃ )

টীকা—মনকে বশ মানিয়ে সরল সঠিক পথে পরিচালনা করা কঠিন কাজ ।  
 এখানে কবি সে কথাই বলেছেন । কুপ্রবৃত্তির মোহে আচ্ছন্ন মনকে কবি  
 চোরের সাথে তুলনা করেছেন । সে চোরের স্বরূপ বড় সাংঘাতিক ।  
 ‘আগলা নাও শয়তানের ঘোড়া’ কবির এ উক্তি আরবী ‘মান লায়সা!  
 লাল্শ শয়খো ফশয় খুল্শ শয়তানে’ অর্থাৎ যার গুরু নেই তার গুরু শয়তান,  
 কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয় !

( ১৪ )

শোন বলি মন পাগল  
 সারোরে তিন তাসের খেলা  
 এই না ভবের হাটে ;  
 ও তোর সঙ্গে আছে ছয়জন দাঁড়িয়ে  
 ও তারা দুটো আর বোম্বাটে  
 ও কেউ তারা সঙ্গে না হাঁটে  
 ও তারা কাম ছাড়ে যায় লোভের ধারে মন  
 ও তোফিল বান্ধে আইটে

দুই মুড়া দুই মহরী খাড়া  
 জমা ওয়াশিল লেখে তারা  
 দাখিল হয় এক জনের কাছে  
 ও দলিল পত্র সব নিকাশের কাগজ  
 ও আবার লক্ষ্য করে যারা  
 যদি কুমতি হয় এক দরা  
 পাগল কানাই বলে ও আমার মন  
 সে দিন নিকাশের চোর পড়বে ধরা  
 তাই বুঝিয়া ও আমার মন  
 কর সেই আশ্র সাধন  
 সাধন কর ঘরা  
 তিন তাসের খেলা সাঙ্গ কর মন  
 খেলা কর আজ সারা ।

আমার ও জনাব মনসুরউদ্দিন সাহেব সংগৃহীত এই গানে পার্থক্য বিশেষ নেই ।  
 টীকা—কবি এখানে জীবনের কুমতির খেলা থেকে নিস্তার পাওয়ার কথা  
 বলেছেন । কেননা মানুষের দুই স্বন্ধে দুই ফেরস্তা বসে সব সময় ভালমন্দ  
 কাজ লিখে রাখছেন এঁরা সমস্ত কাগজ যখন আল্লার কাছে দাখিল করবেন  
 তখন চোর ধরা পড়বে—জবাবদিহি করবার কিছু থাকবে না ।  
 ছয়জন—ছয়রিপু । তোপিল--তহবিল । মুড়া—ধারে ।

( ১৫ )

পাগলা কানাই বলে গানের তালে  
 ঠেকবিরে মন কালাকালে এই না নায়ার জালে  
 ও তুই ভবে এসে রইলি বসে  
 চিন্তি না মন আল্লা রসুলে  
 তুই দেখরে নয়ন মেলে,  
 আর হবে না সাধের জনম  
 পাবি না দিন গেলে  
 গেলে দিন আর হবে না  
 দিন কানা কাঁচ ধরিস মাণিক ফেলে ।

ও যেদিন ধর ছাড়িয়া মালেক যাবে উড়ে  
খালি দেহ পইড়া রবে—এই ভবের বাজারে  
সে যে মাতা পিতা কন্যা কেউ চাবে না ফিরে  
ও নিবে যমুনার তীরে ।

সোনার অঙ্গ দিবে পুড়া না হয় দিবে কব্বরে  
দয়া হবে না ধড়ে  
দেহ থাকতে মন হওরে চेतন  
ভুল করলে হারাবি সব ধন  
যার কর রায়তগিরি  
দেওনা তার মাল গুজারী  
আসল করলা চুরি  
আদালতে আরজি দিয়ে করবে ডিগ্রী জারি  
ওরে তোর সমন আসবে বাড়ী  
মাল কোরকের পেয়দা আইসা হাতে দিবে দড়ি  
সকল ধন লুইটে নিবে  
ও শূন্য হবে তোর পুরী ।

টীকা—কবি এখানেও মনকে সাবধান করেছেন । রায়তগিরি করতে যেয়ে  
মালগুজারী না দেয়া এবং তা চুরি করার পরিণাম ভয়াবহ—ডিক্রিজারী  
করে মালিক সব একদিন নিয়ে যাবে । এ গানও মনসুরউদ্দিন সাহেব সংগ্রহ  
করেছেন—কিন্তু আগার গানের সাথে তাঁর গানের পার্থক্য আছে ।  
নিঃসন্দেহে আমার সংগ্রহকে আমি যথার্থ মনে করি ।

( ১৬ )

ধড়ে বলে মনের কাছে,  
ভবের খেলা এই তিন তাসে  
খেলে সর্বজন্য ।  
ঠকতে ঠকতে চিনতে পারবি মন  
নিদানে পাবি খাঁটি সোনা



ও ধড় তুমি তা জানো না  
 খেলতে খেলতে খেলুয়া যে জন  
 ও তারে খেলাতে যাবে চেনা ।  
 দুই মুড়া দুই ছবি ধরা  
 ও তোর দলিলের কাগজ নিকাশ করে তারা  
 ও তোর সঙ্গে ছিল যোগী অন্য যারা  
 ও তারা তিন তাসে মিল দিচ্ছে  
 ও তার কি জমা খরচ আছে  
 এই জগতে আর রহিল না পাছে  
 ও তারা আর এক জগতে আছে  
 থাকেতে থাক মিশে যাবে—পরমেতে জীব লয় হবে  
 কার নিকাশ কে দিবে ?  
 ও তিন তাসের খেলা সাজ হলো  
 ও হাকিম থাকে কোথা কারে  
 ও থাকে কোন শহরে  
 পাগলা কানাই কয় স্মৃতিচার করে  
 ও সে দিন চোর ধরিবা কারে ?

টীকা—জীবনে তিন-তাসের খেলায় ( বর্তমান কালের ফ্লাশ খেলা ) মগ্ন থাকলে পরকাল খোয়াতে হয় । তবু দেহ মনকে এই খেলায় প্ররোচনা দেয় । কবি এখানে স্মৃতিচার করে রায় দিয়েছেন খেলার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্কে চেনা চাই, নাহ'লে পরিণামে ফাঁকিতে পড়তে হয় ।

( ১৭ )

আমার মনেরে বলি ডাইনে যেতে  
 মন যে চলে যায় বামে—  
 পথ খুয়ে অপথে যেয়ে—কু-পথে নামে  
 আমি শোন দলি মন তোরে  
 কত চিনি ছানা ত্যাজ্য ক'রে  
 তালতলায় বেড়াও ঘুরে ।

ডালিম বলে মাকাল ফলকে ভেবেছ সুফল--  
 বেসন ভেবে প্যারা খায়া ভুলে রনি কেন বল  
 তুমি শোনরে অজ্ঞান--  
 নিশাতে ভোর হয়ে, গেল তোমার কুলমান--  
 সুখের পালঙ্ক খুয়ে মসির ঘরে  
 মনের আনন্দে করলে শয়ান ।  
 তাই পাগল কানাই বলে—সভায় বর্তমান—ও তুমি  
 শোনরে অজ্ঞান  
 তোমার মাথায় উঠেছে বেল গাছ্যা ভূত  
 ভূত ছাড়াও সভার মাঝে  
 আর মন তোমার ঠিক রাখো ইমান ।

টীকা—মন-কে সঠিক পথে চলবার জ্ঞান আবেদন জানিয়েছেন কবি । আমার  
 সংগৃহীত এ গানের সাথে মনসুরউদ্দিন সাহেবের সংগৃহীত গানে পার্থক্য  
 রয়েছে প্রচুর—তার গান মাঝে মাঝে অর্থহীন বলে মনে হয় ।

( ১৮ )

ওঘাটে নামবি যদি মনা—আগে গুরু কর ভজনা,  
 আগে শক্তি থাকতে কর সাধনা  
 থাকতে শক্তি কর ভক্তি কুস্তীরের ভয় রবে না  
 ও ঘাটে নামবি যদি মনা ॥  
 আরও প্রেমপাথারে সঁতার যে দিচ্ছে  
 ও তার কুস্তীরের কি ভয় আছে ?  
 ওরে কুস্তীরকে সে জরীপ করেছে  
 ঘাটে নামলে মরা মানুষ—কুস্তীর হয় বেহঁস  
 ও সেই কুস্তীর ধাইয়া কুস্তীর খাইছে—ও তার কি  
 জরা মৃত্যু আছে ?  
 তাই পাগল কানাই কয় সেই ঘাটে কুস্তীর রয়  
 তাজা দেখলে ধইরা খায় মরা দেখলে দোড়িয়া পলায়  
 পাগল কানাই কয় ও মন সাধু  
 আজ কেনে হলি বুধু

দিন থাকিতে মুরশিদ ধরে সাধন ভজন করতে হয়

—ও তার কিসের কুস্তীরের ভয় ॥

টীকা—কবি জীবন-নদীর ঘাটে কুস্তীরের কথা বলেছেন—সে ঘাটে নামতে হলে গুরু ভজনা করে কুস্তীরকে বশ করতে হবে এবং তারপর নামতে হবে। এখানে উদ্ধৃত আমার সংগৃহীত গানে ও মনস্করউদ্দিন সাহেব সংগৃহীত গানে বিশেষ পার্থক্য নেই।

( ১৯ )

একটা কথা শুধাই তোমায় ওরে আমার মন-চাষা  
তুমি কেন হলে বুদ্ধির নাশা, সর্বনাশা।  
এই মানব জমি আবাদ করলে না তাই হলো তোমার দুর্দশা  
তুমি ধান না বুনে বুনে চিনা—বছর ভরে খাবে কিনা  
নাই তোমার কোনই ভরসা  
তা খুইয়া ছয় বলদে হাল জুড়িয়া রে মারো সেই জমিনের  
বাকসা  
আরও মোল পোয়া জমিখানি আরে দীঘে নাই বেশী কোমী  
দেখতে বড়ই খাসা  
ও তার নাঝখানে এক বরুজ আছে রে তার কুমপুনী  
মহারানী  
জমিনের দস্তি আছে বারটা তারা লাগায় লেঠা  
আর আছে মদনা বেটা  
তাই পাগল কানাই ভেবে বলে রে  
ও দিন থাকতে জমি আবাদ করলে না  
ও ফসল ডোলে তুললে না।

টীকা—মানব জমি আবাদ করে ফসল ফলানোর কথা কবি এখানে বলেছেন।

তুলনীয় : মন রে কৃষিকাজ জান না

এমন মানব-জমিন রইল পতিত

আবাদ-করলে ফলতো সোনা

(রামপ্রসাদ)।

বাকসা—এক রকমের ঘাস.—পাবনার শব্দটা ব্যবহৃত।  
ডোলে—বাঁশের তৈরী ধান রাখবার বড় ঝুড়ি।  
আমার সংগৃহীত এ গানের সাথে মনসুর্উদ্দিন সাহেব সংগৃহীত গানের  
পার্থক্য প্রচুর।

( ২০ )

ভব পারে যাবিরে অবুঝ মন, আনার মনরে রসনা,  
দিন থাকিতে মুরসিদ ধরে সাধন ভজন করলে না ;  
—ও ভব পারের চেষ্টা করলে না ;  
দিনে দিনে ফুরাইয়া গেল চেয়ে দেখরে দিন কানা।

তোর দেহের বাদী রিপু ছয়জন আগে বশ করে। তারে  
ঐ নাম ভুলে প'রে পড়বি ফেরে—প্রাণ বাবে হীরার ধারে  
আবার পুল ছিরাত পার হবি কেমন করে  
দাই মালা চোর ওরে গাঁজাখোর  
আর কত বুঝাইব তোরে।

পাগল কানাই কয় ওরে অবুঝ মন  
আনার মনরে রসনা  
তোমার আজ ম'লে কাল দুইদিন হবে  
—এ ভাবে দিন যাবে না  
চেয়ে দেখরে দিনকানা।

( মঃ উঃ সঃ )

টীকা—ছয় রিপুকে বশ করে গুরু ভজন না করলে মাহুঘের মুক্তির পথ  
নেই,—কবি সে পথেই চলতে উদ্দেশ্য দিয়েছেন।

ভুলনীয় : আমি কেমন করে করবো বল সত্য সাধন

আমায় সদাই চঞ্চল করে রিপু ছয় জন। ( হারামনি ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৭ )

( ২১ )

পাগলা কানাই বলে, বলি তোরে  
মন কেন বুঝেও বুঝে না  
এমন অসৎ লোকের সঙ্গ লয়ে  
হারালি ঘোল আনা ।

মাল আমাল নিল লুটে  
ছয় জন মুটে  
তাও তুমি জেনে জান না ।

লাভের ধন পিঁপড়ের খেয়ে গিয়াছে  
বুঝে দেখে রে দিন কানা  
তাই বুঝে অবলা মন  
গুরু চরণ কর সাধনা

কেন অসৎ লোকের সঙ্গ লয়ে  
হারালি ঘোল আনা ।

ওরে গুরু চরণ অমূল্য ধন  
সে ধন কেন চিনলে না  
ওরে মন কুয়োকারের সঙ্গ লয়ে  
পরকালের পথ চিনলে না

আদার ব্যাপারী হয়ে দিন কানা  
সোনার মর্ম জানলে না,  
গুরু চরণ চিনলে না ।

যেমন কুলুর বলদ ঘুরে ম'ল  
চোখ থাকতে কানা ।

মন আমার আখের ফানা  
পাগল তোমার যাবে চেনা

রতি মাসা কম থাকলে  
তখন তোমায় ছাড়বে না

ওরে মন জুয়াচোর  
সোনার মর্ম জানলে না

ওরে মন অপার নদী  
পারের নিধি  
যদি সে পার করে  
তাই বুঝে কর সাধনা ।

( মঃ উঃ সঃ )

টীকা—গুরুর চরণকে অমূল্য ধন মনে করে সাধনা করতে উপদেশ দিয়েছেন কবি ।

১ কুয়োকার—কুহককার ।

( ২২ )

পাগলা কানাই কয়, আমি মনের কথা আর বলিব না  
মনেক বুঝালে সে বোঝে না,  
আমি যে পথে যাই মনের সাথে  
সেই পথে মন ঠিক ঠিক চলে না  
আমি দেখে হই হারা ওরে মন-চোরা  
তোরে ঠিক পালাম না ।  
একি ঠগের বেচা-কেনা  
আমি দেখে হত ভাবচি কত,  
দিন গেল হয়ে গত ঠিক পেলাম না  
ভবে আসা যাওয়া হোল এক সমান  
কেবল কাজেরই আনন্ডাম ;  
আমি সুপথে এড়ি কুপথে বেড়ি  
তিন জরাজরি বাঝাও ক্যান  
যে দিন আজরাইল আসিবে দুই হস্ত বাঁধিবে  
রশি ধ'রে দিবেন টান,  
সে দিন পাবে না আছান ।  
তলব চিঠি করবে দিটি জমা খরচ আপন মুষ্টি  
খাটবে না কোনই ফটি ঘটবে তুফান ।  
সাথে সাথে মন যদি থাকে কেউ  
উঠিতে বসিতে ভব-সিন্দুতে মনে মনে ওঠে চেউ  
ও চেউ লাগলে ভরাডুবি সঁতারসঁতারি সার  
নদীর মধ্যে বালুর চর ।

কূল ছেড়ে অকূলে গেলে  
 জল-ডুবি হবে নিরন্তর  
 সঙ্গে তোর ছিল বারা জুয়াচোর তারা  
 করত্যাছে ডাঙ্গাদার  
 সে যে দিবসে আন্ধার  
 গিছা মায়ার কারণ ঘুরিয়া মরণ  
 পারাপার করলি রে মন  
 কূল পাবি না শেষে হবে  
 ডিঙ্গা বওয়াই গার ।

টীকা—এখানেও মনকে উপদেশ দেয়া হয়েছে। আমার ও জনাব মনসুরউদ্দিন সাহেব সংগৃহীত এই গানে পার্থক্য প্রচুর। আমার সংগৃহীত গানের শব্দ নিঃসন্দেহে যথার্থ কেন মনে করি, উৎসাহী পাঠক এ গান ও অন্যান্য সমস্ত গানে তা মিলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। এখানে একটা উদাহরণ দেব। মনসুরউদ্দিন সাহেবের গানে আছে—“তলব চিঠি করবে দিষ্টি,—জমা উসিল হাপন মুসকিল”—এর কোন অর্থ হয় না। অন্যদিকে আমার গানে আছে—“তলব চিঠি করবে দিষ্টি জমা খরচ আপন মুষ্টি” এর অর্থ হোল আজরাইনের তলব চিঠি যেদিন মাস্তুরের ওপর দৃষ্টি করবে সেদিন তার আপন মুষ্টি ছাড়া জমা খরচ আর কিছুই থাকবে না। শেষাংশে মনসুরউদ্দিন সাহেবের গানের কোন অর্থ হয় না, আমার গানের অর্থ সুস্পষ্ট, ‘পারাপার করলিরে মন’ কে “কাটাদারি কল্লেন রাবণ” বলে তিনি মেনে নিয়েছেন।

( ২৩ )

ও মন কি হোল কি হোল বসে ভাবছি তাই  
 আমার পথের সম্বল কিছু সাথে নাই  
 কাল কাটলাম হাসে রসে  
 সমুখ বাড়িতে রলাম বসে  
 পাছবাড়িতে কি হোল তার ঠিকানা নাই ।

ও মন দুন্যাদারি এ বাকমারি  
 নিখা বসত যার  
 না বুঝে কেন প্রাপ্ত-বস্তু করলি রসাতল ।  
 পাগল কানাই বলে, সামান্য মন রে রসনা  
 তোমার পাছবাড়িতে বসত করে রিপু ছয়জন ;  
 তুমি সকুতলে হুঁশিয়ার থাকো  
 ক্ষতি হবে না মহাজনের ঘোল আনা  
 তোমার পাছবাড়িতে সিঁধ কাটিছে  
 প্রাপ্ত-বস্তু চুরি যেতেছে  
 মহাজনের কাছে মন তোমার ঘটবে যন্ত্রণা ।

টীকা—সংসার-সংশ্লিষ্ট মনকে কবি সাবধান করেছেন কেননা পাপ সম্মুখ দিয়ে  
 না হোলেও পেছন দিয়ে অর্থাৎ মনের অজ্ঞাতে প্রবেশ করতে পারে ।  
 মন-কে পাপের স্পর্শ থেকে মুক্তি রাখতে হোলে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে ।  
 সকুতলে—সকৌতুহলে ।

( ২৪ )

ভবপারে যাবিরে অবুঝ মন  
 ও আমার মনরে রসনা ।  
 দিন থাকতে মুরসিদ ধরে সদা ভজন করলে না ।  
 ও পরকালের চেষ্টা করলে না  
 দিনে দিনে দিন হল গত চেয়ে দেখরে দিন কানা ।  
 দেহের বাদী রিপু ছয়জন আগে বশ কর তারে  
 ঐ নাম ভুলে পরে পড়বি ফেরে প্রাণ যাবে হীরার ধারে—  
 পুলহেরাত পার হবি কেমন করে ?  
 ও দায় মালিচোর ওরে গাঁজাখোর আর কত বুঝাবে তোরে  
 তাই পাগল বলে ও আমার অবুঝ মনরে রসনা  
 আমি বারে বারে বলছি তোরে কর পারের ভাবনা  
 তোমার দিনে দিনে দিন ফুরায় গেল  
 ও তাই কর সাধনা ।

টীকা—কবি এখানে মনকে মুরসিদ ধরে সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে বলেছেন ।  
 এ গানটার সাথে মনসুরউদ্দিন সাহেব সংগৃহীত ২০ নম্বর গানের সাদৃশ্য রয়েছে ।



তুলনীয় : সাধ গুরু না করিয়ে হেলা ।

(গোরক্ষবিজয় কাব্য, পৃ: ১৪৭)

( ২৫ )

শোন ওরে পাগল মন  
কেবা পর কেবা আপন  
পারের জন্য বুঝে মর  
তুমি কি কারণ  
সাঁই বিনে নাই গতি  
দুঃখে সুখে যে জন হয় সাথী  
সকলেরই আহাৰ যোগায় জগৎপতি  
গউত কালে যাহার নামে রে  
মন পাবারে মুকতি  
যে তারে না চিনে  
খুঁজলে পাবি না ত্রিভুবনে  
ভক্তির সাথে দেখ রে জানে প্রাণে,  
যে তারে চিনতে পারে  
আছে তার চোখের কোণে ।

টীকা—মনকে আল্লাহ্‌র পাথে অগ্রসর হতে বলা হয়েছে । সত্যিকার ভক্তের কাছে কাছেই তিনি থাকেন ! গানটার শব্দ-চয়ন সহজ সরল এবং হৃদয়-স্পর্শী ।

The true man of God sits where He is and the Bayatul Mamur comes several times a day and night to visit him.

( Legacy of Islâm—T. W. Arnold, p 220. )

তুলনীয় : আপনা বুঝিলে বুঝি চৌদ্দ ভুবন—( সহজিয়া সাহিত্য—পৃ: ১৮৩

—শ্রীমণীন্দ্র মোহন বসু । )

( ২৬ )

ভবে এসে রলি বসে  
 কাল কাটালি হাসি রসে  
 রলি মন মায়া'র বশে  
 যেদিন আসবে শমন বাঁধবে কষে  
 ও মন সেইদিন তোমার কি হবে  
 তাই দেখ ভেবে  
 ভাই বন্ধু সূত দারা কেউ সঙ্গে না যাবে ।  
 তিরিশ মতি পঞ্চ মাণিক তাই কররে সঙ্গে'র সাথী  
 তাতে তোর হবে রে গতি  
 যেদিন রোজ হাসরের ময়দান পরে  
 হিসাব নিবেন আল্লাজী  
 ও মন তাই ভাবি  
 রসুলের জমা খরচ সব র'ল বাকী

চেয়ে দেখ ও মন ভোলা  
 ছাড়ে রসের খেলা  
 দেখ চেয়ে ডুবে যায় বেলা  
 তোর সঙ্গে'র সাথী কেউ হবে না  
 কাঁদবি বসে একেলা  
 ও মন পাগলা  
 দিনের কাম কিছুই করল্যা না  
 ডুবে যায় বেলা ।

টীকা—মনকে মৃত্যুর কথা চিন্তা করে ধর্মের পথে চলতে বলা হয়েছে । গানটার  
 শব্দ-চয়ন সুন্দর !

( ২৭ )

পাগল কানাই বলছে সাধের মন  
 মন মুখে বল নিরঞ্জন  
 দীন বন্ধু জগৎপতি সে বিনে নাইরে গতি  
 ভরসা শ্রীগুরু চরণ  
 এক নারীর প্রেমে মত্ত হয়ে হারালি অমূল্য ধন  
 শোনরে পাগল মন  
 বিফলে গেলরে দিন কেউ হোল না আপন ॥  
 পুত্র ছেলে ঘরের পরিবার তারা কেউ হোল না আশা  
 তারা কেউ হোল না আপন  
 যে দিন শমন আসবে বাঁদবে কসে ছেড়ে যাবে আশুজন  
 হবে একেলা গমন  
 ভবের কানাই ভবে খুয়ে খালি হাতে যেতে হবে  
 শোনরে পাগল মন ॥  
 যে দিন শমন এসে দুই হস্ততে লাগাবে ডুরী  
 সেই দিন তোমার ধড়ের মালিক করবে চুরি  
 আট কুঠুরী নয় দরজা আঠারো কুঠুরী  
 সেই দিন তোমার ঘটনে বিষম দায়  
 আমি ভাবি তাই সদায়  
 পিজিরা অঁধার করে প্রাণ পাখী যাবে ছেড়ে  
 ছয় ইন্দ্র রহিবে কোথায়  
 চার চৌকিদার ঘোল পহরী  
 তারা কোনদিন যেন ছেড়ে যায়  
 আমি ভাবি তাই সদায়  
 পাগল কানাই বলে অস্তিন কালে নিরঞ্জন বল মুখে  
 দিন তো বয়ে যায় ॥

টীকা—মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে মনকে সৎপথে চলতে উপদেশ দিয়েছেন  
 কবি ।

( ২৮ )

শোন বলিরে মন পাখী রতন  
তোমার সু-পথে আর নাইরে মন  
কু পথে যাও কিগের কারণ  
পাখী নাই তোর মনে কোন দিনে  
আগবেরে বিষম শমন  
বল কি হবে তখন ।।

\*

পাখী মনের কথা ভেঙ্গে বল না  
পাখী বুঝালে তো বোঝ না  
ভজন সাধন কিছুই শিখলে না  
কোন্ দিন জানি যাবা ছেড়ে  
আমায় করে ছলনা  
পাগল কানাই বলে মন পাখী রতন  
আমায় ফেলে যেও না ॥

\*

পাখী কোন দিন জানি যায় উড়াল ছেড়ে  
অতি যত্ন করি তোমারে  
বল পাখী কি হবে মোরে  
সাধের খাঁচা শূন্য করে ফেলে যাবে কেমন করে  
পাগল কানাই বলে মন পাখী রতন  
আমি ছাড়বো না তোরে ॥

টীকা—কবি এখানে মনকে খাঁচায় পোষা পাখীর সাথে তুলনা করেছেন।

কখন যে এ পাখী চলে যাবে, এই ভয়ে কবি সর্বদা ব্যাকুল।

তুলনীয় : হায়রে সাধের খাঁচা, পড়ে রবে সাধের খাঁচা

আমি ময়না বলে পুষলাম যারে

সে হয়ে গেল ভুতুম পেঁচা ( পল্লীগীতি ও পূর্ব বঙ্গ, পৃ: ৮৭ )

## ॥ দেহতত্ত্ব ॥

( ২৯ )

আজব এক জাহাজ গ'ড়ে  
 দীনবন্ধু পাঠাইছেন ভবের পরে ;  
 সে জাহাজ পানিতে কখন চলে না  
 শুকনাতে ভেসে ফেরে  
 দীনবন্ধু জয়সিন্ধু-মন মাঝি হালি ধরে  
 জাহাজ চলত্যাছে ভাই দুই দাঁড়ে ।  
 একি আজব কল,  
 শুকনাতে ভাইয়া ফেরে তার মধ্যে জল,  
 জাহাজের মধ্যে আগুন পানি  
 বোঝাই তাতে মূল্য মাল  
 হাল ছাড়োনা ও ভাই মাঝি  
 ঠিক সামাল সামাল  
 তরী কখন যেন হয়না তল ।  
 জাহাজের আট কুঠরী, নয় দরজা  
 মালকোঠার সোনা  
 যদি দাঁড়িমাল ছয়জন রিপু জাহাজ চালায় না  
 তবে, জাহাজের কি হবে  
 পাগলা কানাই ব'সে এখন তাই ভাবে ;  
 যেদিন জাহাজ হবে কমজোরি ভাই  
 বান খেয়ে তরী জল নেবে,  
 দাঁড়িমাল ছয়জন রিপু সব ছেড়ে যাবে ;  
 সেদিন শুকনায় তরী তল হবে ।

টীকা—গানটা আমার সংগৃহীত । সেপ্টেম্বর, ১৯৫৪ সংখ্যা মাহেনও-এ প্রকাশ  
 পাবার পর অনেকেই বিভিন্ন স্থানে উদ্ধৃত করেছেন । গানটা কবির

শ্রেষ্ঠ প্রতিভার নিদর্শন হয়ে থাকবে : শুধু পাগলা কানাইয়ের কেন,  
কোন পরী কবিরই এমন প্রথম শ্রেণীর গান বিশেষ নেই বললেই চলে।  
দেহকে এখানে জাহাজ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে।

তুলনীয় : নৌকাখানি ডুবাইলে স্তম্ভনাতে পানি।

( —গোরক্ষবিজয়, আঃ করিম সাহিত্যবিশারদ সম্পাদিত। )

নিম্নের কয়েকটা গানে দেহকে রথ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে—

( ৩০ )

এক রথের ধূয়া বেঁধে

পাগলা কানাই রাত্রদিন কাঁদে ;

সে যে বেহাল রূপ ধরে

রথ উজালা করেছে রে ভাই

সাড়ে চব্বিশ চাঁদে।

এক বিনা সূতার তোরা গেঁথে

রেখেছে রথে বেঁধে

তোরা দেখ্‌সা' এক বক বেঁধেছে

ভাইরে সেই উড়ে ফাঁদে।

সে রথ দেখা যাচ্ছে ভালো

মেটে তক্তায় কাম পাকা

সে রথ বকের জন্ত চাম দিয়ে ঢাকা

চার চৌকিদার ষোল প্রহরী

পাখীর পাখায় লেখা,

যেদিন বক উড়িবে রথ পড়িবে

ঘুরবে না রথের ঢাকা ;

পাগলা কানাই কয় ভাই রে সেদিন

রথে হবে না থাকা।

(৩) তাই ভাবছি নিরবধি  
 চব্বিশ দায়রা সেই রথের মধি,  
 তিরি ধারা আরে মন বাঘা  
 তোরা মৎস্য খাস যদি,  
 তোর সাথী যারা জুয়াচোর তারা  
 যাসনা রে কথার মধি,  
 ভজন সাধন করিস মন তুই  
 সামনে রেখে স্রবুন্ধি ।

১ দেখ্‌সা—দেখ আস্তা (দেখ আসিয়া) শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ ।

( ৩১ )

পাগলা কানাই বলে ভাই  
 রথে চড়ে স্বর্গে যাই ;  
 রথের চাকা কমজোরী ;  
 নিকশের মধ্যে হাতুর বাটাল  
 রাখছে ছুতার মিস্তিরি,  
 পড়লো খসে না পাই দিশে  
 কি দিয়ে সারি ।  
 মুগুর দিয়ে কুপ আটাই  
 লখমা দিয়ে কল আটাই  
 রথের জোড়ায় জোড়ায় মিল  
 আমি দেখলাম হালের চূড়া টিলে  
 নড়ে গেছে ধর্ম খিল ;  
 জানলাম রথের চাকার গুণে ভাই  
 নড়্যা হচে টিল ।

কবি পাগলা কানাই

( ৩২ )

ছুই চাকার রথ দেখেছি  
ধূলার এই ধরায়,  
কইতে সেই রথের কথা  
ছাতি ফেটে যায়।

রথের চারিদিকে ঘেরাও করা  
মধ্যস্থানে মানিক জোড়া,  
সেপাই সামন্ত তারা  
রথ চৌকি দেয়।

চাকার নীচে ছুইখানি তাক  
দেখতে কি শোভা  
রাতদিন সেই রথে করে  
ফুলের সেবা।

চারিদিকে চারজন চোপদার  
কেউ না কারো লুকুম বরদার,  
চুড়ার পর ছুই ফুল আছে রক্ত জবার  
যেদিন চোরা এসে রথে সিঁদ কাটবে,  
পবন আর চৌকিদার  
তারা বলবে সার সার,  
রথ থুয়ে তখনি পালাবে ;  
ভাইরে সেদিন সেই রথের পরে  
ডাকাতি হবে  
ছুইখানি চাকা খসে থাকেতে হবে।



( ৩৩ )

পাগলা কানাই বলে  
 স্ততারের কি গুণপনা  
 এক রথ গড়েছে দিনকানা ।  
 আর একজন চড়েছে  
 সে তো শুনে না  
 আর একজন তার করনা কথা  
 রথ ঠেলে নেয় যথা তথা  
 ষোলজন গোপী ঠাকুর একজনা ।  
 ঠাকুর পূজা দেয় ঘণ্টা বাজায় তিনজনা ।  
 ও চুড়ার পরে বসেছে ত্রৈলোক্যনাথ  
 ও যে আট গলি আর নয় গাছ পথ  
 ষোলজন গোপী সাথ ।  
 নব দলে নব গোত্র করে সাথ  
 ওরে প্রাপ্ত বস্তু ব'সে থাকি  
 ব্রহ্মাণ্ডে কে বুঝতে পারে  
 বাহবা কি আজব নীলে গড়ে রথ  
 কত পুরুষ পীরিত করে ঘটাঘট ।  
 আট মুণ্ডর বার কামান চোদ্দ তালের পর  
 শূত্ৰের পর রথ গড়েছে এছাই কামিলকার ;  
 পাগলা কানাই চড়েছে দেখ সেই রথে  
 ওচার যুগ উঠেছে পাছে ষোলজন গোপিনী সাথে  
 নবদলে যাত্রা পেয়েছে ।  
 ওরে গোপীগণে নেও সাথে করে  
 আপনি রথের চাকা ঘোরে  
 মহেশ্বর কিঞ্চিৎ ধিয়েন পেয়েছে  
 উর্দ নয়ন পক্ষে মিশেছে ।

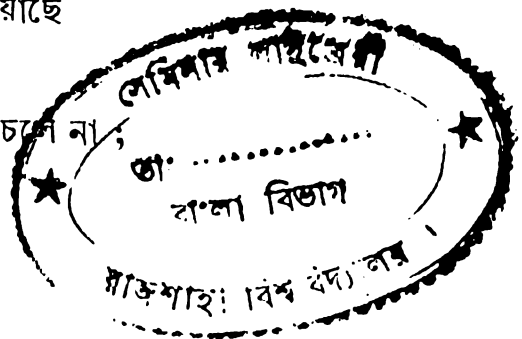
( ৩৪ )

গাগলা কানাই কয় কর্মকার এ রথ গড়ালি তুই কি ভাবে  
 চাকায় যারা চাক লাগাইয়া কুঠুরী ভাগে ভাগে  
 এ চাকা ঘুরছে কি পাকে ।  
 উহার এক খোপে কুঠুরী রাখে  
 উহার আরেক খোপে বাটাল দুইটি  
 এ কত চিজ তাহারই মজি,  
 উহার আট কুঠুরী নয় দরজা  
 চড়নদার তার ষোলজন  
 উহার মাঝখানেতে বসা আছে  
 গিরি আর মহাস্তম্ভজন  
 সে টানতেছে পবন ।

( ৩৫ )

পাগলা কানাই বলে  
 গড়া রথ নূতন কলে  
 চালাতাম সাবেক কালে  
 এই শেষ কালে  
 কল বিকলে চলে না ।

আমি ঠেলেঠেলে চালাতে চাই ;  
 যে ঠেলার সে ঠেলে না,  
 ঠেলেতে ঠেলেতে বল গিয়াছে  
 ঠেলা আর আসে না,  
 ভাটির রথ চলে না,  
 এ রথে ছিল যারা  
 সব স'রে পলো তারা,



হয়েছি নজর হারা, দিশাহারা  
 সার্যা যাইতে পারলাম না ।  
 আমি যার কাছে যাই সেই রাগ করে  
 (তোমার) ভাটির রথে থাকব না  
 ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু তারা  
 প্রবোধ মানে না,  
 ভাটির রথ চলে না ।  
 এ রথ মজবুত ছিল গড়া,  
 তখন টনক ছিল দড়া  
 খুব জোরে চলত ঘোড়া, দেখতে পরিপাটি  
 আমরা এই ষোল জনে টেনেটুনে কতদিনে  
 দিয়েছি কত বাহার,  
 এখন সারথী হয়েছে ভাটি  
 চাকাতে বল নাইকো আর,  
 পাগলা কানাই বলে  
 এখন টানাটানি সার,  
 এ রথ চলবে নাকো আর ।

( ৩৬ )

পাগলা কানাই বলে  
 আমার রথ কি এখন চলে  
 এ ঘোড়া রথ চলে না রে ;  
 চালাইছি ঈশান কালে  
 সাবেক বলে, কল বিকলে  
 এ ঘোড়া রথ চলে না রে ।  
 আমি চালাইতেছি ঠেলেঠেলে  
 যে ঠেলেতো সে ঠেলে না রে

ঠেলেতে ঠেলেতে জীবন গেল  
 ঠেলা আসে না,  
 এখন আর রথ চলে না ;  
 ঐ রথে ছিল যারা  
 ঐ সব স'রে দাঁড়ায় তারা  
 ইন্দ্র, চন্দ্র, ঋতু, তারা  
 প্রবোধ মানে না ।  
 কানাইয়ের রথ চলে না ।  
 আমরা বোলজন একসাথ হয়ে  
 কতক দিন দিলাম বাহার,  
 পাগলা কানাই বলে  
 এখন টানাটানি সার ;  
 এ রথ চলে নারে আর ।

( ৩৭ )

কি মজার রথ গড়েছে ভবে তার অঙ্গ মাঝে  
 ভয়ঙ্কর চাকা দুইখান আছে  
 রথের সারথী যে জন  
 ভিতরে সে গোপন  
 চাকা পবন হেলানে হেলত্যাছে  
 টাকু ঘুরত্যাছে  
 বিনা তেলে দুইটা বাতি দিবানিশি জ্বলত্যাছে ।  
 রথখানি দেখে আমি হলাম নামাককুল  
 ও সে মাপলে হয় চইরাশি আব্দুল  
 রথের চৌকিটি জোড়া তাতে রথ খাড়া  
 রথের হরদেহে ভাই বিন্দুভরা এসে দেখ তোরা  
 পবন ফুরায়ে গেলে রথের খসবে সব জোড়া ।

( ৩৮ )

পৃথিবীর উপর রথ গড়া পাগল কানাই ভাই বলে  
 অধর চাঁদকে ধরা না গেল  
 তারে ধরতে গেলে ধরা না দেয়  
 পাগল কানাই ঠেক্যাছে দায়  
 কত ফকির বৈষ্ণব মনি গোসাঁই  
 দৃষ্টি কর্যা রথ চালায়  
 এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায় পারিয়া ফেলায়  
 কেউ ভয় খেয়ে ভাই ডুব দিয়ে পালায় ।  
 তিন সখী আর সখীদল  
 চম্পা দিয়া গড়েছে ডাল  
 টানত্যাছে রথ বাহুবলে কাছি  
 ওরে ষোল সখী সঙ্গে করে  
 তিন ঠাকুরে করে নাচানাচি  
 বলবো কি আর ভাইসাহেবরা  
 সাধ মিটে যদি ন বাঁচি  
 মাঝে মাঝে হাউসের<sup>১</sup> জালায় আগিও নাচি  
 যাহোক রথের বাহারে আছি ।  
 শ্রবণ মণ্ডল এর চূড়া  
 ভুবন মণ্ডল এর ভূরা  
 ধন্য সে ধন্য কামিলকর  
 বাহামজার রথ গড়েছে নাম হোল তার সৃষ্টিধর  
 সৃষ্টি দৃষ্টি কর্যাছেন তৈয়ার  
 ছুতারের তারিফ করা সাধ্য কি আমার ।

<sup>১</sup> হাউস—সখ ।

( ৩৯ )

ভাইরে, তারিফ করি কামিলকারের  
 বানাইছে এক আজব রথ  
 দুই পাটিতে গড়ন সারা  
 ও জন হয় ঠিক সাড়ে তিন হাত  
 ও তার নয় দরজা দেখতে মজা  
 চলত্যাছে পবনের সাথ  
 নীচের দুই চাকা ঘোরে  
 ছয়জন সেই রথের পরে  
 মাঝখানে বিরাজ করে  
 ভাইরে, বসে ত্রিজগতের নাথ ॥

যেদিন, হেলবে চুড়া হবে গুড়া  
 চলবেনা রথ টান দিলে  
 সাত সমুদ্রে হাল হবে লড়বড়ে  
 রথের খিল খসে প'ড়ে ।  
 পাগল কানাই বলে ভাই সকলরা  
 দেখেছ তোমরা তাহারে  
 কালিমকারের নাগাল পালি  
 ঘুচাতাম মনের কালি  
 ফিরে লাগাতাম তালি  
 ভাইরে, ঘোড়া চলতো খুব জোরে ॥

কামিলকার কত গুণ ধরে  
 থাকেন সেই কাজের পরে  
 নামটি দীন-নাথ  
 ও সে আপনি গড়ে আপনি ভাঙ্গে  
 ভালমন্দ তার-ই হাত

কেউ চেনে কেউ চেনে না  
 বায়ু পিত্ত কফ তিন জনা  
 রথের দিন থাকে না  
 ভাইরে, সারথী পালালে ॥

( ৪০ )

ফাস্তন মাসের ২৪শে তে তারিখ মঙ্গলবার  
 হাল বইতে গিয়াছিলাম খাট্যামারার চর  
 কোন থাক্যা যান যুক্তি কর্যা  
 ঠাস্যা ধরলো দারুণ জ্বর  
 ইচ্ছা হয় হাল ছাড়ি  
 তাড়াতাড়ি বাই বাড়ী  
 চাকাতে আট বাঁধে না রে  
 ওরে রথ হয়েছে লড়বড়ে ॥

যখন এরথ নৃতন ছিল চাকা ঘুরাতি  
 এখন লড়বড়ে হয়্যাছে রে ভাই রথের সারথী  
 রথের দ্বার ক'রে খাড়া ছেড়ে গেছে মিস্ত্রী  
 মিস্ত্রীকে নাগাল পেতাম যদি চাকা নিতাম সারি  
 আমরা চলতাম বাহার দিয়া রে  
 লাগায়ে দুই মোমবাতি ॥

আগরাত খাগরাত সেই রথেরই পত্তন  
 মেটে তক্তায় চানকা কাটা কি মজারই মিলন  
 ওরে মুর্শিদে কয় পাগল কানাই  
 ঘুরিয়া আসো ত্রিভুবন  
 বলাই যাবে রথ ছেড়ে  
 গোপাল নিবে চুরি করে  
 বাতিটা নিবে গেল রে, পথে হবে তোর বিসর্জন ॥

( ৪১ )

কলের রথ গইড়ে দিছে দীনবন্ধু করছে কোন কাম  
 রথের চূড়ার'পর লেখা আছে দীনবন্ধুর নাম ।  
 গড়েছে রথে আধার মোকাম ।

যখন রথ ছিলরে নূতন ও আরও চলছে দুগুণ  
 দেখতে পরিপাটি  
 আজ রথের খসেছে খিল কাঠি  
 আরও নইড়া গেছে দুই খুঁটি ।

তাই পাগল কানাই কর  
 দিনে দিনে তৈল ফুরাইয়া ঘোর হইয়া আ'লো  
 —সেই নবীর রথ দিক-ভুলা হইল ॥

( ৪২ )

পাগল কানাই বলে আমার বুড়ো কাল হলো,  
 ভবে কার লেগে করলাম এত,  
 ভবে এসে প্রেমে মজে আমার পরকাল গেলো,  
 আমি লোহা লয়ে ঘুরে বেড়াই কামারের কাছে,  
 আমি শুনেছি লোকের মুখে

রথখানি গড়ে ছুতার—সে গেছে উপর তালাতে ॥  
 সেই রথের চৌষটি জোড়া  
 তার কোন তক্তায় নাই পোড়া  
 বিনা পোড়ায় সার মিলাচে  
 সে ছুতার লা শরিক আল্লা ॥  
 সে ছুতার এমনি গুণবান  
 সে একলা করে ভবের কাম  
 যদি তার নাগাল পেতাম  
 ভাইরে শিখে নিতাম কাম ॥



আর রথগড়া কমিলকার যদি নাগাল কেহ পাতো,  
 ভবে তার মানব জনম বাঞ্ছা পূর্ণ হোত,  
 ও সেদিন পবনহীন পালে উড়ে ছুতার বাড়ী যেতো ।  
 সে রথ দেখতে পরিপাটি—তার সর্ব অঙ্গ ঝাঁঝাড়া কাটা  
 খোপে খোপে জ্বলছে বাতি  
 কোন দিন যেন সেই সাধের রথ ফেলে  
 আমার হবে যাতি ॥

( ৪৩ )

বাওয়া এক কলের রথ গড়ে দিছে দীননাথ—  
 এমন রথ আর কভু দেখি নাই  
 সে রথের গড়েছে আনন্দ খুঁটি  
 দেখতে বড় পরিপাটি দেখতে চমৎকার  
 এই রকম রথ কভু দেখি নাই  
 এ রথ-গড়া কামিলকারের—যদি নাগাল কেহ পাতো  
 তবে তার মানব জনম বাঞ্ছা পূর্ণ হোত ।  
 ভবে সে রথে চড়ে সূতার বাড়ী যা'ত ।  
 রথের চাকা ও চূড়াতে গাঁথা আছে এক সূতে  
 না হলে রথ চলতে পারে না ।  
 ও রথের সারথি আর ইচ্ছা-মন  
 যখন বলে চাকা ঘোর  
 কোথায় চলে যার,  
 সেই রথের সঙ্গে দেখি সৃষ্টিধর  
 রথে কথা কয়,  
 এ বড় সে গৌরবের কথা  
 তাই পাগল কানাই কয় ॥

( ৪৪ )

শোন ভাই আজব একটি রথের কথা বলে যাই।  
 কামিলকার উত্তম ব্যক্তি দীনবন্ধু সাঁই,  
 দিয়ে তিনশ বাইট জোড়া রথ করেছে খাড়া ছুই চাকার পর,  
 এমন রথ কভু দেখি নাই, আছে কোটি চন্দ্রতারা—  
 রথ করেছে খাড়া বাওহা মজা তাই  
 ও রথ গড়েছে দীন-বন্ধু সাঁই।  
 ও দয়াময়, ও রথে কি কাজ করিতেছে,  
 দ্বিদল অষ্টদল শতেক দল রথের জুইটাছে,  
 আরও করেছে ছুই মাশাল  
 বিনে তৈলে জ্বলে রাত্র দিনে বসে  
 বাওহা একি দীন-বন্ধুর কল  
 সে রথের কতই মণিগণ—ও সে করিতেছে ভ্রমণ  
 রথের চুড়ার 'পরে লিখা আছে ঠাকুর মদন ও মোহন,  
 রথের মধ্যে যমুনা নদী তার তীরে বৃন্দাবন  
 অশেষ কোটি দেবতার সনে করিতেছে আগমন  
 আছে মস্তক সাপো লাগবে সঙ্কট—করেছে সেই রথে গঠন  
 তাই পাগল কানাই বলে শুনতে পাই শতেক দল  
 সেই সূতারের সিংহাসন।

( ৪৫ )

শোন ভাই একটি রথের কথা বলে যাই  
 কামিলকার উত্তম ব্যক্তি দীননাথ গোসাঁই  
 দিয়ে তিন শত বাট জোড়া, রথ করেছে খাড়া  
 ছুই চাকার পর  
 এমন রথ কভু দেখি নাই

আছে কোটি চন্দ্র কত ইন্দ্র  
 সে রথে বিরাজ করে চৌষটি গোসাঁই  
 দয়াময় সেই রথে কি কাজ করিতেছে !  
 দ্বিদল অষ্টমদল শতেকদল রথে যুইটাছে  
 আরও শতেক দলের সারথী বস। চূড়োর পরে  
 সদায় বিরাজ করিতেছে,  
 কত উত্তম উত্তম ব্যক্তি থাকতে বিন্দু চোরা প্রধান হয়েছে  
 আরও রথখানি ভাই কন বেশী নাই মাপলে হয় সমান ;  
 রথের চূড়ার পরে লেখা আছে  
 হায়াত, মউত, রিজিক আর দৌলত ;  
 এ রথে বস। শতেক দল আরও মন হেলালে ঘুরছে কাল  
 বাহবা মজার কল আরও জ্বলে ছুই মশাল  
 আর বিনা তেলে জ্বলে পাগল কানাই বলে  
 বাহবা এ ত দীনবন্ধুর কল ।

( ৪৬ )

হায় হায় কি হ'ল  
 আর ঘোরে না রথের চাকা রে ;  
 এখন উপায় কি করি,  
 পাগল কানাই কয় রথের চাকা  
 হয়েছে বাঁকা ।  
 দীনবন্ধু কয় ওরে কানাই  
 আজ কেন রথ চলে না  
 সাধের রথে বইসা রে  
 ও তুই কি করিস ভাবনা !  
 গুপ্ত ভাবে রথ গড়াইছে  
 কামিলকার এমন

দেশ বিদেশে তালাস করি  
 পাই না তাহার অন্বেষণ  
 দিয়া তিন শত চৌষটি জোড়া রে  
 কইরাছে সেই রথের পশুন।

( ৪৭ )

ওরে পাগলা কানাই বলে  
 উদ্দা গঠন রথখানি ভাই চাকায় চলে  
 রথের মধ্যে রথের গঠন  
 পাগল কানাই তাই বলে  
 আর দশমাসে রথ গড়িয়া সারে ॥

সে রথের জোড়ায় জোড়ায় মিল  
 চানকা কেটে রথ গড়েছে নাইকা কোন চিন  
 বা'নে বা'নে সূতা ধরে রথখানি করেছেন খাড়া  
 রথের গুছা বাঁকা একই কথা  
 মাঝখানে দিছেন গোড়া  
 রথেক সামনে টানে মন পবন দ্বারা ॥

সেই কথা কই দশের কাছে  
 ইল্ল-পুরী সারি সারি কুঠুরী কাটতেছে  
 নীচ কুঠুরীত বসে মন উড়ায়  
 সদাই বিরাজ করতেছে  
 আমি তারিফ করি কামিলকারেক  
 কি হেকমতে রথ গড়ে  
 হাজার সা'রে তিন হাত রথখানি গড়ে ॥

( ৪৮ )

তোমরা মিছে ক্যান কর গোল  
গোলমাল করো না মমিন ভাই সকল  
তুই চাকায় এক রথ গড়েছে,  
এমন রথ আর দেখি নাই  
আমি তারিফ করি কামিলকারেক  
কি হেকমতে রথ গড়ে  
সে রথ চলতেছে পবনের ভরে ॥  
সে রথের আঠারো মোকাম  
আগে চলে বলরাম কানাই বলাই সব ছেড়ে গেলে  
রথের হুউং মউং রেজেক দৌলত  
খাটবে না ভাই চীং হলে  
চাঁদ সূর্য উড়িয়া যাবে কানে লাগিবে তালি  
সেদিন রথ খোলায় বেঁধে হবে বড় গোলমালি ॥  
ও সে পাগল কানাই তাই বলে  
নতুন এক রথ তৈয়ার হইছে  
পুরাণ রথ ভাই কেবা টানে  
সে রথ তৈয়ার হইছে দশমাস দশ দিনে ॥

( ৪৯ )

দেখ ভাই রথ গড়েছে দীননাথ ছুতর  
কত বৃক্ষ আদি তরুলতা সেই রথের উপর ।  
আবার সারথি এর মধ্যে বসে যখন  
বলে চাকা ঘোর ওরে ঘোর  
ছুতরের কথায় চলে  
বিনে দড়াতে চলে চাকার এছা জোর ॥

আর রথখানি গড়েছে ভাল ভাবতে দিন বয়ে গেল  
(কি জানি হয়) শেষকালে রথ ভাঙলে, দেশী

ছুতার তালি দিতে পারবে না।

তাই বলে পাগলা কানাই রথখানি বাঁকা  
আমি নূতন রথে চড়েছি ভাই জোর চলে চাকা  
রথ পুরান হলে জাট নড়িবে হবে না এথায় থাকা  
রথ ভাঙ্গিলে তখন কি খাটবে তালি  
সারথি উড়ে যাবে পড়ে রবে রথ খালি।

( ৫০ )

পাগল কানাই বলে ভাইরে ভাই  
ছোট কাইলা দিন আমার নাই  
—এখন পড়াছে ভাটি।

রথের চাকা চূড়া মুড়া হলে টিলা হ'ল সব কাঠি  
খালি হস্তে এখন কি দিয়ে আটি ॥

ও ছুতার দিছিলো এক রথ গইড়া  
মূর্থ হলাম আমি চইড়া  
—কোন মজা পা'লাম না  
ভেমা কাঠের তক্তা ছিল—মুগুর কেন দিল না  
আমি নড়তাম চড়তাম থাকতাম ব'সা  
লাগাইতাম জোড়ায় দুইচার ঘা  
তবু সেই রথ খসতে দিতাম না।

সেই ছুতার সকল তারই হাত  
পাগল কানাই টাইনা বেড়ায় শুধু খাইটা রথ  
উহার রথী থাকে উপরখোপে পাগল কানাই তার দোপে  
এখন বইসা তাই ভাবে

ঘোল চুঙ্গী বুদ্ধি কানাইর—গেল এক চুঙ্গীর মধ্যে  
পাগল কানাই ব'সে ভাবে দেখ ভাই দিনে আর রাতে ।

নিম্নের গানগুলোতে ঘর হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে :—

( ৫১ )

এক ঘরের দুই ঘরামি  
করতেছে টানাটানি  
কার বা কতই বল ;  
আর এক ঘরের দ্বার হস্তে ছাদ  
ঢেকেছে তিরপল  
হস্ত পদ নাই ঘরামির  
বান্ধাছে বান্ধাছে নির্মল  
ঘর নাই তার ছাউনি ভাল  
সে ঘরে জগৎ আলো হয়্যাছে উজ্জল ।

একজনের পতি দাতা,  
আর একজনের সঙ্গে কথা পাগলা কানাই কয় ;  
দুই জনেতে এক মিলনে সেই ঘরেতে রয়  
দুই ঘরামি যুক্তি করে কখন যেন ঘর ভাঙ্গা লয়  
দেখে সেই ঘরের গঠন  
মন আমার হয় উচাটন, পলকে পালায় ॥

ঘর বাঁধা শূণ্য ভরে  
হস্ততল পদতলে হাওয়াতে মিলন  
ঘরের মধ্যে বোঝাই আছে অমূল্য রতন  
পাগলা কানাই বলে, একই কালে  
করগা<sup>২</sup> করগা সাধন,

সাধন না করলে পরে  
পড়িবে বিষম ফেরে  
কি হবে তখন ।

<sup>১</sup> হস্তে = হতে ।

<sup>২</sup> করগা = করগিয়া এর সংক্ষিপ্ত রূপ ।

( ৫২ )

চার পাতায় এক ঘর বেঁধেছে  
ঘরানি তার সৃষ্টি-ধর  
আড়ে দীঘে আছে প্রমাণ  
ঠিক সমান সে ঘর  
আছে ঢাকা ঘর মধ্যস্থলে  
মুর্শিদাবাদ সদরে তার  
আছে কত অলি, শোন বলি,  
চৌরটি গলি, চার বাজার  
কানা কালা বোবারই কারবার  
দেখে সন্দ<sup>১</sup> হয় আমার ॥

চার কালেরই চার দোকানদার  
করতেছে কারবার এসে  
দোকান মাথায় নিয়ে চলে যায়  
কানা দেখে হাসে । <sup>২</sup>

বোবায় তাহার জিনিস কিনে  
ডাকছে তারে মূল্য নিতে  
কানা কালা করছে খেলা  
খেলছে দিবস নিশিতে ;



সংসারের পর তাইতে বসে  
ভেবে পাই না আর দিশে ॥

সেই যে ঘরে বসত করে  
জেন পরী একজনা  
আছে কর্ণমূল নাক নাই তার  
চক্ষু দুটি কানা  
অপর মুখে কয় কথা  
হাতে না লেখি চোখে না দেখি  
মুখে নাই বলার ক্ষমতা  
আমি যে অবশ্য কানা-ই  
সাধু জানে তা  
আছে তার আজ্ঞাকারী ত্রিপুরারি  
হরের মাতা  
শুনে লাগে ধন্দ ভাল মন্দ  
গন্ধ মালুম হয় তথা  
মাতালে কি জানতে পারে তা  
অপর মুখে কয় কথা ॥

১ সন্দ = সন্দেহ

২ তুলনীয় :

আন্ধলে দোকান দিয়া  
খরিদ করে কালা ।  
—গোরক্ষ বিজয় পৃঃ ১৩৮ ।

( ৫৩ )

পাগল কানাই বলে এই না ঘরে  
 বসত করি আমি  
 কত ঘাশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াই  
 না পালান ঘরামি  
 যদি ঘরামি পাতান সারিয়া নিতান  
 যত বেশী কমি  
 ঘরের উচা নিচা সকল কোনাকুনি ॥

ঘরের মধ্যে চব্বিশ খুঁটি ভাই  
 সদর আলার পেলা<sup>১</sup>  
 যেদিন আসবে রে পশ্চিমা ঝড়ি  
 মারবে বিষম ঠেলা  
 পড়ে রবে আমার এ সাধের ঘর  
 মিছা ধূলা খেলা  
 বন্ধ আছে সদর তাল। ॥

ঘরের মধ্যে অকূল নদী ভাই দেখে পরাণ ফাটে  
 আমি গুনেছি মুর্শিদের কাছে  
 কত যোগী মহাস্ত জপ করত্যাছে সেই ঘরে বসে  
 প্রাণ চম্‌ক্যা চম্‌ক্যা ওঠে  
 কখন বা নদীত্‌ তুফান ছোটো ।

<sup>১</sup> পেলা—অবলম্বন, ঠেস ।

( ৫৪ )

আজব একখান ঘর বেঁধেছে মজার কিবা গুণী  
 দুই খুঁটি পরিপাটি মধ্যে আগুন পানি  
 এক পাড়্যামে পাড়্যাম<sup>১</sup> সারা  
 বাতাস বয় রাত দিনই

ওরে বাতাস বন্ধ হলে পরে  
 সে ঘর থাকবে না তা জানি ॥

আগুনে পোড়ে না সে ঘর পানিতে পচে না  
 বিধির আজব লীলা সে এক  
 আজব কারখানা

যে জানে না ঘরের সন্ধান সেও তো আধকানা  
 দিন থাকিতে মুশিদ ধরে হওরে জানা শোনা ॥

অধম কানাই বসে সেই না ঘরে করছে আনাগোনা  
 সাধের ঘর যে পড়বে থাকে সেও তো এক ভাবনা  
 নতুন কালে ছিল ভাল এখন জল মানে না  
 খুঁজি<sup>১</sup> দিয়া রাখতাম সে ঘর  
 এখন আর ঘরামি মিলে না ॥

<sup>১</sup> পাড়াম = ঘরের চাল বসানোর জন্য বাঁশ বা কাঠের ফ্রেম ।

<sup>২</sup> খুঁজি = যেখান দিয়ে পানি পড়ে সেখানে তালি দেওয়া ।

( ৫৫ )

শোন বলি ভবের পর  
 ঘরামি বানায় কলের ঘর  
 কোন ঘরামি গোপনেতে বানায় কলের ঘর  
 ঘরের একটি প্যাড়াম দুইটি খান্সা রে  
 দেখ নয় ছয়ার ॥

যে জন সে ঘরামি, সঙ্গে ফেরে রাত্র দিন  
 খ্যানে হয় সে জন্মদাতা খ্যানে জননী  
 খ্যানে হয় সে পরম গুরুরে  
 সে যে কালের ঘরামি ॥

এ তো বড় আজব কথা  
 না খুঁজিলে পাবা কোথা  
 ঘরের তিনটি সুরমা বত্রিশ রুয়া রে  
 দেখেছ্যাও কোথা ॥

( ৫৬ )

কি মজার ঘর বেঁধেছে সাধের কামিলকার  
 ঘরের ভাব দেখে ভব নিরন্তর  
 কামিলকরের ভঙ্গী বোঝা ভার  
 আড়ে দিঘে একই সমান  
 সমান সমান বাঁধা ঘর  
 এক প্যাড়ামে প্যাড়াম সারা  
 বেঁধেছে দুই খুঁটির পর  
 সেই যে ঘরে বসত করতেন  
 আমার নবাব মনোহর ॥

চব্বিশ চন্দ্র ঘরেতে আছে  
 আগার গুরু গোসাঁই কয়েছে  
 নিঃশ্বাসের কাজ বিশ্বাস হয়েছে  
 যে জন তারে করে জিজ্ঞাস তার কি বিশ্বাস হয়েছে  
 কৈলে ভক্তি পাবে মুক্তি ভক্তি যেজন কর্যাছে  
 গুরু শিষ্য হয়ে একস্তর তারা জলে গিষ্ঠাছে ॥  
 মনরে সেই ঘরে অধর ধরা চিনলি না মন চোরা  
 কেউ তা চিনলি না  
 কারও যোগে যাগে হয় সাধ্য সাধনা  
 কেউ যোগ ছাড়া তাক পাবি না।  
 নজরের সাথ করো সাধনা

যে জন মরণ কালে উজান ধরে সেও তো আজব কারখানা  
 অধম পাগলা কানাই কয় ওরে লালচাঁদ<sup>১</sup>  
 তোর ভাগ্যে তা হোল না  
 মিছা অমূল্য ধন করিসরে যতন  
 বসে দেখরে দিনকানা ॥

১ লালচাঁদ—কবির শিষ্য।

( ৫৭ )

ভেবে যত অবিরত বলছি কথা সভা সমুদয়  
 ভবের পর এক ঘর বেঁধেছে ঘরামি ভব দয়াময়  
 পবন ভরে চলে সে ঘর তা দেখে কত সাধু লোকের ধন্দ লেগে যায়  
 রেখে ঘর এক পা'ড়ের পর দুই খুঁটির পর  
 মিল করেছে জোড়ায় জোড়ায়  
 ধন্য বলি দয়াময়  
 পাগল কানাই বলছে রে ভাই  
 সে ঘরে বসতের সুখ হয় ॥  
 সে ঘরে বসত করে মোহন ব্যাপারী  
 আট কুঠুরী নয় দরজা সদর আবার হুকুম ভারী  
 ঘরের মধ্যে বহুত আলো দিচ্ছে কত তারা আদি  
 ঘরের মধ্যে চার দরজা সদর জেলায় হয় কাছারী  
 ধন্য কামিলকার বলিহারী  
 ভবের পর এসে মন মিছে কান করছে তাড়াতাড়ি ॥  
 ঘরের মধ্যে ঘর বেঁধেছে থেকো জুঁশিয়ার  
 আঠারো নল ঘরের মধ্যে মতি দিছে তিরিশ তার  
 ঘরের মধ্যে ত্রিবেণীর ঘাট, ঘাটে যাওয়ার সাধ্য কার  
 আছে কে বালুর চরে ক'টা কুমীর সেও পহরদার  
 ধন্য বলি সমাচার  
 মাণিক রতন পাবে সৃজন যদি যাও সেই ঘাটের উপর ॥

( ৫৮ )

আজব এক ঘর বেঁধেছে কামিলকার  
 আমি দেখে হলাম চমৎকার  
 আট কুঠরী নয় দরজা দেখতে কি বাহার  
 ওরে ঘরের মধ্যে বইছে পানি  
 ঢেউ খেলাচ্ছে অনিবার  
 বিনা তেলে জ্বলছে বাতি মট্কার উপর ॥  
 দুই খুঁটির পর রেখেছে ঘরখানা  
 চার জেলা বার থানা  
 চার বাজারের পর দোকানদার করে বেচাকেনা  
 ও এক বোকার জিনিস কিনবার কালে  
 ডেকে তার মূল্য নেয় না  
 লুলার<sup>১</sup> মাথায় দোকান থুয়ে  
 হাসত্যাছে কানা ॥  
 সেই ঘরের সৃষ্টিকর্তা আল্লা নিরঞ্জন  
 সে ঘর এক পা'ড়ে করেছে পত্তন  
 ঘরে বসত সুখ হোল না বলে কানাই অভাজন  
 যেদিন পা'ড় ভাঙ্গিবে ঘর পড়িবে  
 দোকানী করবে পলায়ন  
 দিন থাকতে সারো রে ভাই যে পার যেমন ॥  
<sup>১</sup> লুলা=হাত বা পা অকেজো হয়ে যাওয়া ।

( ৫৯ )

বাহা মজার ঘর বাঁধ্যাছে কামিলকার  
 একঘরে দুইজন বসত কেমন চমৎকার  
 ভবে এসে সুখ হলো না রে  
 আমি পেলাম না ঠিকানা তার

ছনিয়ার ঘরে এসে পাগলা কানাই  
 হল্যাম ধন্দকার ॥  
 ও সে ছনিয়ার ঘরে দশমাস বসত ক'রে  
 সেও ঘর ছাড়িয়া আল্যাম ভবের পরে  
 ভবে আস্যা সুখ হোল না যেতে হবে কব্বরে  
 নিদানে সেই দীনবন্ধু কি জানি করে ॥  
 আমার সদাই চিন্তা মনে তাই শোন ওরে ভাই  
 নেকির কথা শোনা আছে মুর্শিদের ঠাঁই  
 নেকি করলে যাবে তরে রে  
 পুলসিরাত হয়ে যাবা পার  
 দোজখে পড়ে কাঁদে যত গোনাগার ॥

( ৬০ )

অধম পাগল কানাই বলিয়া দিচ্ছে এই সভার মাঝার  
 তোমরা দেখ ভবের পর  
 ওরে আজব রঙ্গের ঘরখানি বেঁধেছেন কামিলকার  
 তারিফ করি কামিলকারের  
 দুই খুঁটিতে ধরে রাখছে ঘর  
 একা পা'ড়ের উপর ॥  
 কি হেকমতে এক ঘরের মাঝে  
 বানছে আরেক ঘর  
 এ সব ক্ষমতা তাহার  
 ওরে কতই রকম কারিগিদি করছে সেই ঘরের মাঝার  
 আট কুঠুরী নয় দরজা দেখতে ঘর আচ্ছা মজার  
 চামের ছাউনি তার ॥  
 ওরে অন্ধকারে ঘরের পত্তন যেজন দিয়াছে  
 তারে কেউ চিনতে না পারে

কত ফকির বৈষ্ণব আলেম ফাজেল সন্ধান না পাইছে  
 আমলাগণ সঙ্গে লয়ে  
 মন বড় সেই যে ঘরে  
 হামেহাল বসত করত্যাছে ॥

আমলাগণের মধ্যে ছয়জন আছে বড়ই দাগাবাজ  
 করে সব দাগাবাজী কাজ  
 ওরে এমাম রতন অমূল্যধন  
 আছে যে সেই ঘরের মাঝ  
 মন তুমি থাকো চেতন  
 জুয়াচোর সেই যে ছয়জন  
 জো পোলে করবে সর্বনাশ ।

( ৬১ )

শোন বলি এই ভবের পর  
 দেখরে ভাই চৌদ্দ পোয়ার ঘর  
 নাজানি কোন ঘরামি গোপনে বেঁধেছেন ছাদ তার  
 একখানি পা'ড় দুটি খাম্বারে আছে নয় দুয়ার ॥  
 যে জন সেই ঘরামি সঙ্গে ফেরে রাত্রিদিনই  
 খ্যানে সে হয় জন্মদাতা খ্যানে জননী  
 খ্যানে হয় সে পরম গুরুরে ও সে সর্বগুণী ॥  
 এ বড় আজব কথা না খুঁজিলে পাবা কোথা  
 সে ঘরে বিনে সূতায় চার আটন ছাটা  
 এ বড় আজব কথা রে কানাই ভাবছে শুনে ॥



( ৬২ )

ওরে ভাবতে ভাবতে প্রাণ বাঁচে না বলতে দশের হুজুরী  
 সাধের ঘরে বসত করি আমরা লাভের খাতেরী  
 ওরে ঠগ বাজারের চার বোম্বটে বেটারা বড় কুয়ারী  
 লাভে মালে বিনাশ করে

বাগে পা'লে করতে চায় চুরি  
 তোমরা সব থাকো হুঁশিয়ারী ॥

ওরে ছয় খোপেতে নয় দরজা ষোলজন তার প্রহরী  
 রাতভর করে সরকারের কাছারী  
 থাকতে প্রহরী দারুণ চোরা সেই না ঘরে করে চুরি  
 ওরে দেশ জুড়ে সব চুরি করলো না হোল গেরেপ্তারী  
 চোরাক দেখে পলায় প্রহরী

তোমরা থাকো হুঁশিয়ারী ॥

চোরা থাকে কোন্ দেশে  
 চোরার কীর্তি দেখে পাগল কানাই রাত্রদিন ভাবছে বসে  
 প্রাপ্ত বস্তু সব লুটে নেয় এমন যে সে সর্বনেশে  
 দারুণ চোরা থাকে কোন্ ঘাশে  
 ভেবে পাই না তার দিশে ॥

( ৬৩ )

ওরে ঘরের মধ্যে ঘর বেঁধেছে গজার কামিলকার  
 বসত দেখি কালে কালে  
 বোবায় ডাকে শোনে কালে  
 পাগল কানাই পাশা খেলে শূণ্যেরই উপর  
 মেঝে নাই তার বিছান পাতা একি চমৎকার ।

দেখে জ্ঞান নাই আমার  
 ওরে আগুন সেথা রাত্রদিন জ্বলে  
 পুড়ে না সে ঘর  
 ঘরের মধ্যে নাইকো পানি, তবু চেউ খেলে রাত্রি দিন ।  
 বাতাস নাই তা আমিও জানি রাত-দিনই হয় ঝড়  
 বিনে তেলে জ্বলে বাতি মাথার উপর  
 মজার কামিলকার  
 সেই সে ঘর আছে শূণ্যের পর তার শত পদতল  
 সাগরের মধ্যে হাট দিলাইছে বুক ভেসে যায় তার  
 নেংড়া একজন দৌড়ে চলে  
 শুকনায় একজন খেলে সাঁতার ।  
 পানি ঠাণ্ডা করব বলে আগুন নিয়ে একজন যায়  
 আর একজন তার ঘরে বসত বাইরে নিদ্রা যায়  
 সে কবার কথা নয় ।

( ৬৪ )

শোন বয়্যাতী আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করি  
 তোমার ঐ দেহের কারখানা  
 তোমার দেহের মাঝে কেবা থাকে তাই ভেঙ্গে ক্যান বল না  
 বিজ্ঞ লোকের পুত্র হও তো কুণ্ঠিত হয়ো না  
 স্পষ্ট করে বল রাজসভায়  
 না বলিলে সভাস্থলে ঘটবে বিষম যন্ত্রণা ॥  
 চারটি আঙ্গুল দেহের মাঝে বোয়াল্লিশ হাজার দ্বার  
 এক হাজার মেরুদণ্ড রয়  
 কোন্ দরজায় কেবা থাকে সেই কথা কও আমায়  
 না বলিলে বয়্যাতীর ছাও ছাড়বো না তোমায়

নাভীর নীচে কোনজনা আছে

বাহাত্তর সেজদা তোমার দেহের মাঝে কোন্ জায়গায় ॥

চার কুঠরী দেহের মাঝে তাই বল আমার কাছে

দেহের মধ্যে ছয়জন রিপু কোন্ জায়গায় আছে

কোন্ দরজায় কে বা থাকে সেও কথা কও শুনি

মুখ' পাগল কানাই বলে তোর বাপ ছিল সম্মানী

তারই ছাওয়াল কেন রে তুমি মাঠে পরে ঘাস খত্যাছাও

গিঠে বত্যাছাও চিদি ॥

নীচের গানগুলোতে দেহকে জাহাজ অথবা তরী হিসেবে কবি কল্পনা করেছেন। জাহাজ বিষয়ক একটা উৎকৃষ্ট গান দেহতত্ত্বমূলক গানের প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে -

( ৬৫ )

পাগল কানাই বসে করত্যাছে ধিয়ান

তুই দাঁড়ে এক জাহাজ চলে

সে জাহাজ পানি ছেড়ে চলে শুকনার পর

ভাইরে, সে এক আজব কল

সে জাহাজ শুকনাতে ভাসে আর তার মধ্যে জল ।

জাহাজের মধ্যে আগুন পানি বোঝাই মালামাল

ও ভাই মাঝি হাল ছাড়ো না হও সামাল সামাল

যেদিন শমন আসবে জাহাজ ডুববে

মাথা কাঠে হবে হাঁটু জল

দাড়িমাল্লা সব ছা'ড়ে পালাবে

সাধের তরী শুকনার পরে হবে রসাতল ।

তুলনীয় : বালুচরে ঠেকে গুরু বাহ গজ গড়ি

—মীনচেতন, পৃঃ ২০ ।

( ৬৬ )

পাগল কানাই বলে সাধের তরীরে চলছে ধুমাকলে  
 কখন যেন বাঙসেছে এসে কাত করে ফেলে  
 ওরে সামাল সামাল সামাল নাখি নাও লাগাও সকালে,  
 বিষম পাক সে নদীর ঘাটে  
 খোকনা<sup>১</sup> দিও ডাঙ্গায় এঁটে  
 কাছি দড়ি মান্বে নারে ভাই শেষে প্যাচ পড়ে ॥  
 এতই সাধের মালমাতরী রে গুড়া সারি সারি  
 কোন ঘাটে লাগাব ডিঙ্গা রে বল ব্যাপারী  
 যেমন নৌকা তেমন নাখি তেমনি নাওয়ের গুণারী  
 ভুল না মন পরের ফৌসে  
 নষ্ট হবে আপন দোখে  
 কখন যেন ভাটায় পড়ে রে এ ডুব্যা মরি ॥  
 লাভ করতে আল্যাম ভবে রে  
 ব'ল্যাম পাপের ভাড়া  
 দিনে দিনে নৌকা আমার হচ্ছে বা'ন এয়ারা  
 এখন কি ধন লয়ে ঘরে যাবো রে  
 ও মন চোরা ॥

<sup>১</sup> খোকনা—নৌকা ঘাটে বাঁধবার জন্ত মাটিতে যে খুঁটি  
 পোতা হয়।

( ৬৭ )

তোরা আজব তরী দেখবি যদি আয়  
 তরী শুকান দিয়ে বয়ে যায়  
 মন পাগেলা বসে কল চালায়  
 সেই তরীখানা গড়ছে ছুতার  
 করছে সারা কার্য আদি সমুদায়।

তরীর তিনশ' চৌষটি জোড়া  
 আড়ে পাশে জরীপ সারা  
 সে তরী ছয় জনা চালায় ॥  
 যেদিন আসবে তরীর খরিদার ব্যাপার  
 তরী কেন্দ্রে হবে জারেজার  
 দাঁড়ী মাল্লা সব দিবে সাঁতার  
 ভাই বেরাদার আগু বন্ধু কাঁদবে কত বেহুমার  
 কেন্দ্রে মরে ঘরের পরিবার  
 ওজু গোছল করাবে জানাজার নাগাজ পড়াবে  
 সেই দিন হবে রে অন্ধকার ॥  
 তরী ত্রিবেণীর উজান বাঁকে বয়  
 ছয়জন গুণ টেনে যায়  
 দুই মুড়া দুইজন মাল্লা বসেছে সদায়  
 ভব সাগরের তুফান দেখে পাড়ি দেওয়া হোল দায়  
 পাগল কানাই বলে হায়রে হায়  
 মন মানিক কাণ্ডারী ক'রে স্রবাতাসে বাদাম টেনে  
 সে তরী পাড়ি দেওয়া যায় ॥

( ৬৮ )

পাগল কানাই বলে ভাই সকলরে কি আজব তরী  
 এক রঙ্গের মিস্ত্রী তরী গড়ল কোন ফিকিরী,  
 আব্দুল আসটেক খইটা আশা গড়াইছে তরী  
 হলো এক বেটার পর তিনি বিটি চড়া —  
 আমি তাই ভেবে মরি ।  
 তরীর আগা নৌকায় একজন থাকে আর একজন ডুওয়ায়  
 ও আর একজন পাছা নৌকায় রয় ।  
 আমি ভাবতেছি সদায় ।

তলে পড়ে বিজ্ঞো বিটি বলছে হায়রে হায়  
 তাই পাগল কানাই বলে তোর গুণটানা বিটি  
 কোন দিন জান পালাইয়া যায়।  
 আরও পদ্মা নদী বিষম নদী খেলেছে তুফান।  
 আরও মন সুখে দেও না পাড়ি বইসে রইছ কেন?  
 তরীতে সদায় উঠে জল ও তরী করছে রে টল্‌মল্  
 ত্রিবেণীর ত্রিধারায় উজান বচ্ছে জল  
 তাই পাগল কানাই বলে তোর গুণটানা বিটি  
 তারে রাখিও সাবধান।  
 ( মঃ উঃ সঃ )

( ৬৯ )

আজব একখান তরী দেখলাম সৃষ্টদ'র মাঝার  
 হোল তিনজন নারী নৌকার চড়নদার  
 আর একটি পুরুষ আছে তরীর মাঝার—  
 আরও সেই বেটাকে ঠাসে ধরে রাখছে নিরন্তর  
 সে বেটা আদত কুড়ে উঠতে চায় নড়ে চড়ে  
 আবার সেই তিনবিটি বলছে তারে  
 শোন মিনসার রক্ষা নাই এবার।  
 সুবাতাস পাইলে তরী গুকনায় বাইচ খেলায়—  
 আরও পানাউল্লা ঠেকছে বিষম দায়  
 ও সে পবনা বেটা মরে বাইরে একটু আফসোস নাই  
 হাতাউল্লা বাদাম তোলে—হাইল ধরে মোনাই।  
 ধোনাইউল্লার বুদ্ধি মোটা ও কথা কয় চটাচটা  
 ও রাগ কইরে আসল মাল হারায়—  
 সে যে তিনজন নারীরে ভাই বইছে সদায়—  
 আরও কুড়ে বেটা সেই রমণীরে কয়—  
 এমন সুখের সময় ছেড়ে দেও হে ধরি তোমার পায়।

রমণীকে বলছে কুড়ে ছাড়ব না তোমায়—  
 সে বেটা আদত কুড়ে কথা কয় ধীরে ধীরে  
 দাঁতগুলি গেছে পড়ে ও ছাপ ছিঁটে আসে আমার গায়।

( ৭০ )

বলব কিরে ভাই সকলরা কি আজব তরী,  
 বিনে লোহায় গড়ন যারা কোন্ ফিকিরী  
 ১৬ দাঁড় ৩২ জোড়া গুড়্যা দুই সারি,  
 গড়ায় কোন্ মিস্ত্রী ও সে কোন্ মিস্ত্রী  
 তরীর মাল খোপেতে বোঝাই আছে মালেক এক রতন  
 ও দাঁড়ে ভাই মন বেপারী থাকিও চেনন।  
 ও পাগল কানাই বলে  
 ভাই সকলরে খুব হুঁশিয়ারি মহাজনের ধন।

( ৭১ )

ভবের পর এক জীর্ণ জাহাজ, গড়ে দিছে সাঁই দীন  
 জাহাজ দেখে হায় কি করি, গড়ছে অবিকল,  
 দেখতে শোভা পরিকারী সেই দমের জাহাজ  
 নিশ্চয়ই সারেঙ বসা আছে. যখন বলে তখন চলে  
 ও রং বেরংয়ের বাতি জ্বলে, জাহাজের মাথায়,  
 জাহাজের মধ্যে সিংহাসন—বসা আছে সাঁই মহাজন,  
 ও বেপার করে আনবে যে ধন—করিবে ওজন,  
 বাক্সা আছে কাঁটা দাঁড়ি, চোরাশির ওজন,  
 ও নিকাশে মাল কম পড়িলে,  
 ধরবে রে দারুণ আজরাইলে,  
 বান্ধে ছান্দে নিয়ে যাবে করিয়ে বন্ধন,

নিকাশের দায়ে ঠেকনি তখন  
 ও উপায় কি করনি রে মন  
 ও পাগল কানাই কয় ভেবে দেখে,  
 ও চালাও জাহাজ হুঁশিয়ার হয়ে—  
 দিন থাকিতে মুরশিদ ধরে ও মন হও রে চেতন

( ৭২ )

(বল) তুই কেমন করে যাবি রে তর !  
 ও তোর জীর্ণ তরী তুফান ভারি  
 তরী বুঝি ডুবে যায়রে ॥  
 তরীর নয় স্থানেতে ছিদ্র ন'টা,  
 ঐ দেখে উঠছে তাতে বারি সদা ভাই রে !  
 তরী হয়েছে রে ডুব ডুব  
 ও তা দেখে প্রাণ কাঁদে রে ॥  
 যে দশজন আছে দাঁড়ি,  
 তারা মনের স্রুখে গাচ্ছে সারি বসে ।  
 ওরে মহাজনের মাল বলে রে  
 তাদের তিলেক ভাবনা নাইরে ॥  
 ওরে বড় বোকা মাঝিটেরে,  
 সেতো জলের গতি বোঝে নারে ভাইরে !  
 আবার হালে পানি মানে নারে  
 এবার বুঝি প্রাণ যায়রে  
 পাগল বলে নাই আর উপায়  
 বিনে রে সেই দীনদয়াময় ভাইরে  
 ভবের নাবিক তিনি চিন্তামণি  
 ও তুই ডাকরে ত্রায় তারে ॥

( বাঙ্গালীর গান )



( ৭৩ )

ধন্য একটি জাহাজ দেখলাম ঝালুকাটিতে  
 তিন তলায় ছুকানী সারেঙ বসা জাহাজে ।  
 সেদিক পেরন্ত সাড়ে তিন হস্ত নাই বেশী কমী ;  
 সারেঙ বাবু জাহাজ চালায়, ধন্য তাহার ছুকানী  
 চতুর্পাশে খেলা করে পবন পানি  
 তামার পাতে মালোস করা কিসের নাল কমী !  
 দুইধারে দুই থুস্বা করা, ধূমা চালায় কামিনী ;  
 কানাই বলে, বেশ গুণমণি  
 আছে সপ্ত নদী সপ্তসমুদ্রের ওর আছে লোনা পানি ।  
 সে যে কার কোম্পানীর জাহাজখানি দেখতে চমৎকার  
 উনচল্লিশ খালামী আছে সেই জাহাজের পর  
 ইচ্ছামত করে গগন যথায় দরকার ।  
 দুইটি আলোর বাতি জ্বলতেছে ঐ জাহাজের পর  
 ওদিকে এদিকে পাতাম মেরে কোষে রাখিয়াছে দুই দুয়ার  
 যেদিন আসবে চিঠি জানবা খাঁটি যাবে ইষ্টিমার ।

( মঃ উঃ সঃ )

( ৭৪ )

ও ভাইরে দুই পারের তরলী  
 বহিতেছে ভাটানী উজানী  
 সে বড় বিষম নৌকারে  
 শুকনাতে বা'চ খেলে রাত্রদিন ॥  
 সে নৌকার মাল্লা ছয়জন  
 কলেতে আছে গুণটানা  
 ঘোল দাঁড় বত্রিশ গুড়্যা ব্যাপারী মোনা  
 সে বড় বিষম নৌকারে  
 জনম ভরে বোঝাই হোল না ॥

পাগল কানাই তাই ভাবে  
 যে দিন যোগ লাগিবে কলে  
 সে দিন অচক্ষিতে নৌকা পড়বে হেলে  
 সে দিন খোদার নাম ভুলে যাবে  
 কি আরে ও সেদিন শুকনায় তরী তল হবে ॥

( ৭৫ )

কি ওরে ভাই  
 তিনজনে দিয়াছে নৌকার পত্তন  
 সে নৌকা বেঁধে দেখি সিংহাসন  
 ভাই সে কেমন  
 সে নৌকার মাঝি হয়ে বসে আছে  
 মন পবন ॥

কি ওরে ভাই  
 অসময়ে নৌকা বাঁচায় দুইজনে  
 বড় জুলমাত দেখে সামনে তার গুণ টানে  
 ডুবলোরে সাধুর ভরা  
 ভাইরে কাণ্ডারী বিনে ॥

কি ওরে ভাই  
 বড় শূন্য দেখি নৈরাকার  
 ভোলা মন আমার  
 নাও যেদিন ডুববে ভবে  
 কাণ্ডারী কাঁদবে বসে ওবে  
 পানি সৈঁচবে চরণদার ॥

( ৭৬ )

কি এক আজব কথা মেটে তক্তা হাড়ের গাঁথা  
 চামের ছাউনী  
 বিনে পোড়ায় সারি মিলাছে ছুতার গুণমণি  
 দিন তারিণী  
 কে তারা ভব তারা মা নৌকা গড়েছে সৌদামণি ॥  
 সে নৌকার বোঝাই আছে হীরাকাঞ্চন  
 মাণিক আছে অমূল্য রতন  
 বিচার করেন ভাই সাহেবরা যত মোমিনগণ  
 আমি বলি বিবরণ  
 যে দিন আসবে শমন বাঁধবেরে কষে  
 তোমার আসল বুঝে নিবে তখন ॥  
 চারজন মানুষ জোরে টানে  
 চারখান বৈঠা জোরে পরে উজান পানির পর  
 যে দিন আসবে জোয়ার পড়বে ভাটি  
 পড়ে রবে চারখানা দাঁড়  
 সেই নৌকার উপর  
 মাঝি মাল্লা সব ছেড়ে যাবে  
 ঠিক রবে শুধু মালেক সদাগর  
 সে দিনের কথা ভেবে, কানাই কয়  
 মন আমার হোল ভাবান্তর ॥

পরের গানগুলোতে কবি দেহকে ফুল, ফল এবং গাছ হিসাবে কল্পনা করেছেন। দেহতত্ত্বমূলক সকল গানেই রূপকের মধ্য দিয়ে কবি মানব জীবনের এক নিগূঢ় সত্যকে উদ্ঘাটন করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

( ৭৭ )

আজব এক গাছের কথা লোক মুখে শুনে  
 সে গাছ দেখতে এলাম দেখে গেলাম  
 খুশী হয়্যা রলাম মনে মনে  
 গাছের ভাব ফকির বৈষ্ণব জানে  
 সংসারে নাইকা তুল্য অমূল্য গাছের  
 ফল বা ভাল কোথাও মন্দ বা কোনখানে  
 কোন্ ফুলে ফল তা কি সকলেই জানে ?

যখন গাছের মধ্যে স্থিতি হয়  
 তখন দয়াময়,  
 দিচ্ছে ব্যাটা বিধি নিধি পরয়াদী গৌরী কোথায় রয়  
 তবে সে চৌদ্দ চৌদ্দ পুরুষের জ্বালায়  
 গাছের সময় হলে শোন বলি  
 কুতাঞ্জলি ফল পড়ে গাছ তলায়  
 তা শুনে কত ও মনভোলা দেখতে এলো ভিস্তি আলা  
 কয় পাগল কানাই এ সব বন্দেগীর খেলা ॥

( ৭৮ )

শূণ্ডের পর এক দেৱাক্ত' পরদা দেখতে কি মজা  
 সেই দেৱাক্তে বসত করে এসে চার রাজা  
 মাসে মাসে ফুলটি ফোটে আজব তামাসা ॥

পূর্ণিমার যোগেতে জোয়ার করছে টলমল  
 সামাল করে বেঁধে রেখো মন-পানির বান্ধার  
 আসমানে সেই গাছের শিকড় জমিনে ডাল তার ॥

সে গাছের বারমাসে তের ফুল সর্বলোকে কয়  
 পুরুষের ঋতু কোন্ দিবসে কয়ে দ্যাও আমার  
 পাগল কানাই বলে বল দেখি  
 কয় রোজেতে ফুলের গঠন হয় ॥

১ দেবাক্ত—বৃক্ষ ।

তুলনীয় : শূন্য ভরে এক দারাক পয়দা তা দেখে লোকে হাসে  
 শিকড় কাটলে গাছ মরে না, ভাইরে আজব রং  
 মরি ছত্যাশে ॥  
 (হারামনি ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫)

( ৭৯ )

তোরা দেখবি যদি গাছের মধ্যে  
 নদীর পাশে বিকশি জবা  
 সরল সে গাছ পাপড়ি পাপড়ি গড়ন ছিল জবা  
 পুত্রবদন বংশীবদন বদন ভরে দেখতে পাবা  
 সে ফুলের সৌরভে হয় জগৎ আলো বাপ্প্রে বাবা  
 (ওরে) ধন্য বলি সেই জবা  
 থাকে যাহার কপালেতে, একদিন ফুলযোগে ফল পাবা ॥  
 সুরাসুরীর গন্ধে মদন নরে করে বাঞ্ছা সে ফলে  
 মাটির উপর লগ্ন যোগে দুই গাছ যদি মেলে  
 স্বর্ণ বর্ণ আদি স্বর্ণ হয়ে পিপাসা ফুলের মূলে  
 ঈশ্বর ইচ্ছায় অমূল্য ধন ফুলে ফলে (জন্মে অর্থ্যে)  
 ওরে থাকে যাহার কপালে  
 ভাগ্য জনম সফল হবে  
 যদি ফল একবার লয় সে কোলে ॥

ও সে ফুল ফল  
 যার সৌভাগ্য কপাল  
 দুঃখ জ্বালা তার দূরে যাবে হবে নিহাল  
 জীবনাত্মা তার পরমাত্মা ছাড়া না ফল  
 ও তাই পাগল কানাই বলছে রে ভাই  
 আছে ফলের ইহকাল পর পরকাল  
 শিশুকাল যৌবনকাল মধ্যমকাল  
 শেষ কালেতে হয় চারিকাল  
 কবে হবে জীবন কাল  
 যে দিন প্রভু ছাড়িয়ে যাবে  
 সেই দিন পাবারে অন্ধ কাল ॥

( ৮০ )

আজব এক দরাক্তের কথা ভাই আমি কই দশের কাছে  
 সে দরাক্ত কোন্ জায়গায় আছে  
 হাজার বছর এলফাৎ জুড়ে দরাক্তের চার ভাল গেছে  
 দরাক্ত কোন্ জায়গায় আছে  
 একখান ডালে দুটি পাতা খোদার নাম আছে গাঁথা  
 সেই পাতার মাঝে ॥

আরেকখান ডালে আছে ভাই দেখ মেওয়া অতি সার  
 সে মেওয়া দেখতে কি বাহার  
 সে মেওয়া যদি কেহ খায়  
 পেটের ক্ষুধা ভেগে যাবে ছয়মাস থাকবে অক্ষুধায়  
 মেওয়া আছে কোন্ জায়গায়  
 কার লাগ্য সে মেওয়া রেখেছে বল তাই আমার কাছে  
 শুনতে ইচ্ছা হয় ॥

আরেকটা ডালে আছে ভাই দেখ করটি পাতা  
 তা জানে নালেক বিধাণ  
 সেই পাতার মাকারে আছে সকলের ধড়ের আত্মা  
 সেই গাছ<sup>১</sup> থাকে যথা  
 ওরে আজরাইল তার নীচে থাকে  
 পাতাটি যখন পাকে  
 টান দিয়ে নেয় সে কোথা ॥

<sup>১</sup>তোবা গাছ—ঈষ্টব্য, কোরান শরীফ, সূরা ১৩, আয়েত ২৯।

( ৮১ )

দেখ দেখ ভবের পারে  
 চারটি ফুল ফোটে দ্বারে দ্বারে  
 বার বার চক্ৰিশ পক্ষ ফুল ফোটে যুব নারীর ঘরে।  
 সে ফুল আছে সবারই ঘরে  
 তাই পাগলা কানাই বলে,  
 ফুল চেনে না দিনকানা  
 কেন ঘুরে, মিছে ভা-না-না-না ক'রে মরে।  
 শক্তি শক্তি বিদ্যাহীন ব্যক্তি থাকতি ফুলের বিশ্বাসধরে।  
 দেখ দেখ নিরন্তরে আছে ফুল মঞ্জুতের ঘরে  
 সাড়ে সাড়ে সাড়ে চক্ৰিশ  
 বন্দ বন্দ ফুলের দ্বারে  
 এর কোন ফুলটি কোন রাগে  
 এক আধ খোল মানে  
 আধ মূলাধারে বসেছে গুলের পারে।  
 ও তারে কেউ না চিনতে পারে।

আর ভাসিল রসে মদিত রঞ্জে রতি করে টলমল।  
আর মূলপদে সে মূলাধার সে বসে মূলের পার।  
ক্ষীরদ নুতন ঘটে ফল।

ফুলে ফল মেলন করে  
তার শমন অনুযোগের কালে।  
উর্ধে উর্ধে চারটি ফুল ফোটে চার ভাগে  
তাহা আছে রে চার ভাগে।

রাধাকান্ত ফুল কৃষ্ণকান্ত জালি  
চার যুগ ধরেছে ভরে।

( মঃ উঃ সঃ )

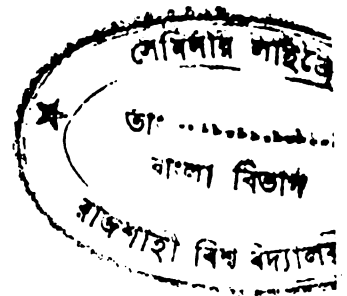
( ৮২ )

শুন ভাই গাছের কথা,  
সে গাছের এক ডালে এক পাতা  
আসমান দিকে গাছের শিকড়  
জমিনে তার মাথা।

ঠিক জেনো ভাই গাছের গোড়া কাটা  
তবু ভাই সে গাছ দিবি থাকে তাজা ;  
এক জাগাতে গাছ থাকে না

সে গাছ নড়ে চড়ে  
গাছের মধ্যে দম রহিয়াছে ভ'রে  
দমটি যখন বাহির হবে

সাধের গাছ অগনি যাবে ন'রে  
পাগলা কানাই বলছে খাঁটি  
দিন কানা তুই চিনলি না রে  
মইলে গাছ অগনি দিব মাটি।





( ৮৩ )

এক আজব তামাশা দেখে এলাম  
 কালীদহের ঘাটে ;  
 বার মাসে বার ফুল ফোটে,  
 যোগী যারা যোগে তারা বসে ঘাটে ।  
 আমি ফুল দেখে হয়েছি আকুল ;  
 তুলব বলে সেই ফুলের মূল  
 ডুব দিয়ে হল্যাম নামাককুল,  
 ডোবে না ভেসে ওঠে ;  
 কতজন সেই যে ঘাটে হয়েছে লটপটে ।  
 ঘাটে আছে নোনা পানি  
 আর কটা কুস্তীরের ভয় ;  
 দেখে আমার মনে সন্দেহ হয়,  
 যে জন ভাল ডুবাক হয়,  
 ডুব দিয়ে ফুলের মূল তুলে নেয় ;  
 না করি কুস্তীরের ভয়  
 কুস্তীরেই সে করে জয় ;  
 আবার কতজন সেই যে ঘাটে  
 আসল মূল হারায় ।

( ৮৪ )

ছুই জন নারী তারা বসত করে ছানছেনির নিচে  
 ওরে তার নিচেতে শলা দিয়া ঘর বেঞ্চেছে জোকারে ।  
 পাগল কানাই বলে ভাই সকল রে, বসত করি পানির উপরে  
 খেনে ডোবে খেনে ভাসতে আছে তুফান মাঝার  
 ওরে দোনের মায়া বড় মায়া পানির ভরা ভইরাছে ।

ইসলামপুরে হাটের শিংয়ে  
 সদা সে তো নূরি ধরছে  
 গাছে গোড়া ধ'রে বাঁকি দিলে  
 কি ফল পাওয়া যায় ?  
 গাছের ডাল ধ'রে বাঁকি দিলে অমূল্য ধন পাওয়া যায় ।  
 ওরে গাছ বড় কি ডাল বড় ভাই  
 সে কথাটি পাগল কানাই কয় ।

( মঃ উঃ সঃ )

( ৮৫ )

ও ফুল ফুটেছে বটে, দেখে প্রাণ চমকে উঠে,—ও আচ্ছা  
 মজার ফুল,  
 সে ফুল নাগরে না সাগরে  
 মহিভাষ বারে কুলুকারে, ফুলে ফল ধরে  
 আছে দশ মাসে দশ যুক্ত ভবেতে হয়ে পুঙ্ক্ত  
 সে ফুল যে পাড়ে সেই হরে—অন্যে কি সন্ধান পাবে ?  
 এক ফুলের হয় হায়াত কবুল—পরদা হইছেন দীনের রছুল  
 সেই গাছ গড়ান নয় বিধির ফল  
 পানির মধ্যে গড়া ফল—  
 আরও জল পানি হাল পানি—পানিতে সেই ফুল ভাসে  
 ফুল ফুটে হয় জগৎ আলো ও তারে দেখে প্রাণ শীতল হলো  
 ও হায় কি হলো—  
 পাগল কানাই বলে ভাই—ফুলের সন্ধান কর তাই  
 দিন থাকিতে মুরশিদ ধরে—ফুলের সন্ধান করা চাই ।

( ৮৬ )

আজব একটি ফুল ফুটেছে কালিদায়  
 গোপনেতে আছে সে ফুল অষ্ট নয়  
 দেখে রয়রে সে ফুল আবার সে বাধ্য এই মালেকুল  
 ফুলটি যথায় তথায় আছে রসুল  
 লাল জরদ ছিয়া ছবেদ চার রঙ্গে বেকার আছে সেই ফুল ।  
 আরও অমাবস্থা পূর্ণিনাতে উদয় হচ্ছে সে ফুল  
 ত্রিবেণীতে বসি আছে মাজত যোগ ছাড়া ফুটে না  
 সে ফুল রে দেখ ।

রক্ত চন্দ্র গরল চন্দ্র আছে চন্দ্রে মিসকাত করা সে ফুল  
 ভাই পাগলা কানাই সভার আগে বলতেছে  
 আবার হস্ত ধরে সরল চক্র শিখাইছে  
 সরল চক্র আছে আমার কাছে  
 তুই ভাঙ্গিস না দশের কাছে রে স্থলতান—তুই যাবি  
 অনেক দিন পাছে

জল পদ্ম স্থল যে ভাবে রইয়াছে  
 যে না জানে সরল চক্র—তার কেবল গল্প করা মিছে ।

( ৮৭ )

গাছ কাটেও ভাই গাছি -তুই চার কথা তোমায় বলি  
 হুঁশ থাইক্যা চাঁচ দিয়ে গাছে—ঠিক রাইখো কপালি ;  
 অনুরাগের ছড়ি জ্ঞানের ছুরি—ভাড়া যেন হয় না খালি  
 ও যেদিন লাল চম্কা লাগবে গাছে  
 বস্তু হয় না রস জ্বাল দিলি  
 পাগল কানাই বলে পাবি সে ধন  
 চেতন গুরুর সঙ্গ নিলি

আরও অজ্ঞানী গাছি যারা—গাছ কাটে তারা চারা  
 সে গাছ তখন বাঁচে না  
 চেইকা গাছের রস হইলে জ্বাল দিলে ওঠে ফেনা  
 আরও যোগ চিনে গাছ কাটো ভাই—  
 সে গাছ হবে মিছরি দানা।

ও ষোল ফোঁটা রস আইলে মায়ের চতুর্দলে কর স্থাপন  
 অনুরাগের অগ্নি দিয়ে করো সে দাহন  
 ও তার এগারো ফোঁটা কইমা যাবে—পঞ্চ ফোঁটে মিঠাই হবে  
 —চার ফোঁটে চিনির গোলা  
 তাই দিন থাকিতে মুরশিদ ধরে—তার সন্ধান জানরে  
 ভাই মনা।  
 (মঃ উঃ সঃ)

( ৮৮ )

এক কুসুমের বার বাসা—সাতটি পক্ষ হয়  
 ও তার কতক ধলো কতক কালো মুরশিদ দেখে কয়  
 এই দুহা লইয়া আমি ঠেকলাম বেঘম দায়।  
 আবার শিকার পক্ষ আসমানে ভাল জমিনে পাতা,  
 ফকির উদয়চাঁদ কয় পাগলা কানাই ভাঙ্গিস না কথা  
 আবার উমি লোকে বলে ছল হয় আসলে ছলের কথা নয়  
 ও যোগী মহন্ত বলে এই যৈবন বৃথা।  
 আবার আস্মানেতে অমাবস্তা থাকি নিরঞ্জন,  
 ও থাকি হয় চেতন,  
 যোগ যোগান্তি উদাসিনী হইয়াছে মিলন  
 আবার বান্দার দেহের প্রতিপদ হয়—  
 সেও কথাটি কেও না কয়  
 ও সকল ঠিক পাবা যখন হইবে মরণ। (মঃ উঃ সঃ)



( ৮৯ )

পাগল কানাই বলে যদি ভাঙ্গি ফুলের মাথা,  
 সাধু লোকের হয় রে খোঁটা।  
 ফুলে ফলে ঢেউ খেলেছে,  
 পাগল কানাই তাই বলে।  
 বলে ভাই সকলে  
 পাগলা কানাই গাহান করে  
 বুঝতে পারলাম না।  
 পাগল কানাই বলে, যদি ভাঙ্গি গুপ্ত কথা  
 পাছ বাড়িতে আগুন লাগে।  
 উত্তরেতে গেরস্ত ঘর  
 পশ্চিমেতে অন্ধিকার  
 শুনছি গুরু ঠাঁই,  
 দক্ষিণেতে ঢোল সমুদ্র হিসাবেতে পাই;  
 কোন্ খানদান ধ'রে তুমি কার কাছে হইছ মুরিদ?  
 চিস্তিয়া, কাদিরী, মোজাদাদ, নক্সাবন্দী  
 কোন্ খানদান ধ'রে তুমি কার কাছে হইছ মুরিদ?  
 কোন্ ফুলেতে আদম তৈরী হয়  
 কোন্ ফুলেতে হাওয়া তৈরী হয়  
 হাওয়া আদম কিসে হয়?  
 তোমার নূর ছিল কোথা,  
 যখন মায়ের উদরে ছিলে  
 তোমার পূর্ব পশ্চিম কোথায় ছিল  
 বলে দাও বয়াতী।  
 মাতা পিতা না থাকিলে কিসে তুমি হল্যা  
 তোমার নূর পয়লা কোথায় ছিল?  
 সেই নূরেতে আদম তৈরী।

পাগল কানাই বলে  
 শুকনা সারা খাপড়ার মতো মুখ  
 দেখ্যা মনে লাগে দুঃখ  
 ওই নাকি রে পাগল কানাই  
 ধূয়া জারী গান।

( ৯০ )

ফুটছাও ফুল সরবরে দেখ নাই তৌফিক করে  
 অমূল্য ফুল নাই তার মূল  
 সে ফুলের সন্ধান কে করে  
 ফুলের সৌরভে জগৎ মোহিতং  
 অলিরাজ তাই ভেবে ভীতং  
 যোগে যাগে ছুই গাছে এক ফল ধরে  
 কপালং কপালং ফুলের নষ্ট হয় গাছের গোড়ে  
 ধরতে গেলে না দেয় ধরা যায় সরে  
 তোর ধরবি ফুল কেমন করে ॥

ফুলের সাধন করছে কতই জনা  
 অশেষণ কেউ পাবে না  
 আসবে যেদিন ভবের পরে সেদিন গোপন থাকবে না  
 ঘোলায় গড়ে ঘুরছে কত দিনকানা  
 ফুলের সাধন করছে দীন দয়াময়  
 ছুই গাছ এনে যোগে মিলায়  
 যোগ ছাড়া অযোগে ফুল ধরে না  
 আজ পাবে যেকোন অমূল্য ধন

ঘুচবে মনের যন্ত্রণা  
 অধম পাগলা কানাই তাই ভাবে কখন  
 আছে ফুল যার কপালে

সে বিনে অন্য কেহই পাবে না ফুল সকালে  
 জগৎপতি লিখেছে যার ললাটে  
 হাত বাড়াইলে পাবে সে ফুল তার ঘাটে  
 মানব জীবন সফল হবে যেদিন ফুল নিবে কোলে  
 কৃতাস্ত নিতাস্ত শাস্তি সেই ফুলে  
 কারও অকাল হবে সকালে ॥

( ৯১ )

আজব একটি ফুল ফুটেছে প্রেম সরবরে  
 লক্ষ যে জন ফুলের গোটি সেই ফুলেতে বিরাজ করে  
 যোগীন্দ্র মহেন্দ্র যারা তাঁরা বসে তপজপ করে  
 ও সে তরঙ্গের উপরে  
 তার উপর মানুষ হ্যাল ডুব খেলে,  
 জলে স্থলে এক সাথ হয়ে সমুদ্রে ঢেউ খেলে  
 সে মানুষের বসত শূন্যে ঢেউয়ের পরে ॥

গুরু শিষ্য এক সাথ হয়ে ঢেউ খেলতে পারে  
 তারে বলি সাধু বটে যাবে সে প্রেম নদীর ঘাটে  
 যারা সেই ফুল তোলে ও সে কামিনীর গুণে  
 গরল আছে তারই নীচে খেয়ে তা মানুষ মরে  
 জ্বয়েন গরল খেয়ে জীর্ণ করে  
 সেই যাবে ভব নদীর ওপারে ॥

সেই যে নদীর তুফান ভারী কেমন করে ধরবে পাড়ি  
 পাগল কানাই বলে আমি ডুবে মরি  
 সহস্রদল পদ গাঁথা সেই ফুলের মধ্যে  
 আমার মনের বাঁদী অনুরাগী  
 আমি গরল খেয়ে অমনি থাকি

ওহে অলি আর ফুল যদি তুলি  
 যদি ভাঙ্গি ফুলের বোঁটা সাধুর ফুল হবে ফোটা  
 সেই জন্ত ঘুরো নদীর কূলে কূলে  
 দরশন পাবি মানুষ ঠিক হলে ॥

( ৯২ )

ভবের পর এক দেৱাক্ত পয়দা  
 ফুল ফুটেছে সেই গাছে  
 চার চৌকিদার ষোলজন তার পহরী আছে  
 গাছ রয়েছে উদ্ভাভাবে পাতাল মুখে ডাল গেছে  
 সে গাছে অমূল্য ফল ধরতেছে ॥

মনভোলা এ ছ'জন তারা বড় আনন্দ  
 ভমর উড়ে গাছে পড়ে হয়েছে বন্ধ  
 সারদ কোকিল গৃধিনী আর থাকবে না শীত বসন্ত  
 বুঝি বিদেশী এক মহন্ত ॥

গাছে ফুল ফুটিয়া মহর আঁটিয়া ধরে নানান ফল  
 চারদিন পরে ভাটার জলে বন্ধ পদ্মার খাল  
 ছড়া সাগর, মেঘনা নদী, যমুনায় হয় আটুজল  
 কানাই বলে, ও তাতে লোক চলে যায় হামেহাল ॥

( ৯৩ )

ভাইরে বিধাতার কি কল  
 আমি তাই ভেবে হলেম বেহাল  
 দেৱাক্ত পয়দা করছে মতিলাল  
 কোথায় ঝতু-ছাতু গগনে মূল ভুবন ডাল  
 দুইখানা ডাল ইন্দ্রাদী গাছের মধ্যে ধরে চিরকাল



পাতায় পাতায় চন্দ্র উদয় ডাল ছাড়া মাঝখানে ফুল  
বেশ তো দেখা যায় ॥

মাসে মাসে ফুল আসে, তিনদিন ছাড়া পূর্ব পাশে  
কতই ফুল পড়ে যায় বাতাসে  
কারও মর্মযোনে অল্পরাগে দুইগাছ মিলন হয় এসে  
দুইগাছে এক ফলের স্থিতি হবে অনায়াসে  
পাতায় পাতায় চন্দ্র উদয় ডাল ছাড়া  
মাঝখানে ফুল পানিতে ভাসে ॥

ফুলের যখন হয় স্থিতি আমি করি অতি মিনতি  
দুই গাছে এক ফলের উৎপত্তি  
পাগল কানাই বলছে ভাইরে ফুল ফুটিলে  
ভ্রমর হয় স্থিতি  
দয়া কর মহেশ্বরী অন্তরে ফুটবেরে ফুল  
থাকে যার পত্তি ॥

নিম্নে আরও কয়েকটা দেহভঙ্গ বিষয়ক গান দেয়া হোল । এ গানগুলোতে  
কবি মানব দেহকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে কল্পনা করেছেন ।

( ৯৪ )

আমার যে জমি আবাদ হয় না—ছয় বলদে কথা শোনে না  
ওরে আমি যখন হালে জুড়ি যাইত কইলি থাইত মানে না  
ও সদায় লাঙ্গল ছাঁটে, জোঙ্গাল ছাঁটে—চঙ্গো টানে না  
—দেহ জমি পতিত রইল শস্য ফলে না  
গেলি সেই বলদের কাছে রুইখা আসে  
ধরতে চায় ঠাসে

আবার মদনা এড়ে ছুঁই ভারী ও সে ভিটে খুঁচে ধচায় দিছে  
পাগল কানাই বলে ওগো মণি কইরে দেও দিশে ॥

( ৯৫ )

পাগল কানাই কয় এ দেহের মধ্যে আছে আরেক মহাজন,  
আমি নিরবধি নদী-স্থিতি পাই না তাহার নিরূপণ ।  
আমি খেনে হরি, খেনে ফিরি, খেনে যোগাই সাধুজনার মন ।  
ওরে মহাজন সামান্য কথা মর্ম কথা মনে ভাই দূরে তাই ।

সাধুজনার দয়া হলে ত্রিবেণীতে হয় জোয়ার  
আছে লালিত চন্দ্র ইন্দ্রগুলি সকল তারা একই তারের তার ;  
কালে চন্দ্র আছিল ভাই মণিকুঠার কাছে  
তার আত্মা চন্দ্র নষ্ট হলে বিমান্তি হয় শেষে ।  
তুমি শাস্ত্র মানো দিন গা গণো

গুরুর বচন মিথ্যা নয়  
আছে চান্দ্রের কিরণ সূর্যের কিরণ গণকেতে গুণে কয় ;  
পাগল কানাই বলে ভাই সকলেরে  
আমার পুরান দেহ, কি হবে রে উপায় ।

( মঃ উঃ সঃ )

( ৯৬ )

পাগলা কানাই কয় শোন রে সুখের পাখী  
তোরে হৃদয়ের মাঝে যত্ন ক'রে রাখলাম বড় সুখী  
ওরে কি দোষ দিয়ে যাবা ছেড়ে দিয়ে নোরে ফাঁকি,  
তুমি রয়ে রয়ে মার ছিকল ফাঁকি,  
ওরে শোন বলি রে ওরে পাখী তুমি নিগূঢ় কথা ধর  
তুমি খাঁচার পাখী খাঁচায় থাক্য সাধ্য সাধনা কর

ওরে পথ ছেড়ে অপথে গেলি ও পথে ডুবে মর  
সদায় দীনবন্ধুর নাম জপনা কর ।  
পাখীর কেমন ছায়া বুঝতে পারলাম না ;  
রূপের খাঁচার সোনার পাখী  
প্রেমের পাখী জোরে ছুই আঁখি  
মোরে ছেড়ে যেও না  
গেলে দেখা শুনা আর বুঝি হবে না ।

( ৯৭ )

এই ভবে এই না ভবে  
আজব এক ফুল ফুটে হয় জগত আলো  
ওরে হিন্দুল বরণ ফুলটি ফোটে  
দেখতে সে ফুল নীল বরণ আলো  
ফুলের ভ্রমরগণ সব পাগল হোল  
হিন্দুল বরণ ফুলটি ফোটে  
ফুলগো ফুল, ফুলে ঘোচে জীবনের কালো ।।

ফুল সে দেখতে যেমন আকাশের তারা  
ফুলের স্পর্শ পেলে ছুঁখ ব্যথা সবই হয় হারা  
ওরে ফুলের যখন জোয়ার আসে  
এক কালে ফুল ফুটে হয় সারা  
ফুলের ভ্রমরগণ সব পাগল পাগা  
হিঙ্গুল বরণ ফুলটি ফোটে সাধের ফুল গো ফুল  
সে ফুলে ধরা হয় গো জীবনের ধারা ॥

এই ভাবে এই না ভবে  
আজব এক তরী বিধি গড়েছেন হেথায়

সেই তরী মানব দেহ কানাই বলে যায়  
 মাধের হিন্দুল বরণ ফুলটি তুলে  
 রাখো যদি সেই তরণীর গোড়ায়  
 তরী আলো পাবে, ছঃখ ব্যথা দূরে যাবে  
 চলবে তবে উজানী হাওয়ায়  
 ধন্য বটে সেই তরী  
 যেই খানেতে মালেক আল্লা  
 মাঝি হয়ে তুফানে চালায় ॥

সেই মাঝির খবর যে জন পেয়েছে  
 ফুল আর তরী ফেলে  
 তার দিকে ছুটে ধেয়েছে  
 কানাই সে অন্ধ বলে ভেবে ধন্দ  
 ভেবে সে বিষম খেয়েছে ॥

( ৯৮ )

কি মজার গড়েছে হাওয়া গাড়ী  
 আমি তার হাজার তারিফ করি  
 গাড়ীর মধ্যে গাড়ীর গঠন  
 গড়েছে কোন ফিকিরী  
 আট কুঠুরী নয় দরজা  
 ষোল জন রেখেছে প্রহরী  
 তীর্থ ধাম গাড়ীর ভিতরে আছে  
 শুনেছি মুরশিদেরও মুখে  
 আরও ৫২ ধাম শাস্ত্রে প্রমাণ  
 কোন্ ধামে কে আছে ?  
 কোন্ ধামে কে বিরাজ করে  
 শুধাইলাম বয়াতিরও কাছে

কোন্ ধামে আছে মধুসুদন  
 কোন্ ধামে আছে মথুর বৃন্দাবন  
 কোন্ ধামেতে ব্রহ্মার আসন  
 কোন্ ধামেতে পঞ্চানন  
 পাগল কানাই বলে ওরে আমার মন  
 কোন্ ধামে লাগে চন্দ্রগ্রহণ ।

( ৯৯ )

বাওহা মজার জমিখানি দেখতে চমৎকার  
 জমিখানি দেখতে ভাল, মধ্যে আছে বিষম কাল  
 হয় কি করি তার  
 চান্দে চান্দে মাসে মাসে সেই জমিতে আসে জোয়ার  
 সে যোগের সময় জোয়ার বয়  
 কতজনের মাল হারায়  
 বিধির লীলা বুঝতে পারে সাধ্য কার  
 সেই সমযোগে অনুরাগে, দৈবীজমির হয় পত্তন ।

সেই জমিনেই কতজন হাবুডুবু খায়—  
 অজ্ঞানী হইলা যারা, মাথায় ধরে কাঁদে তারা  
 এখন কি করি উপায়  
 এই বেলা মুরশিদ ধরে উপায় কর  
 মদন রাজার দফা সার  
 ও ছয় বলদ বড়ই পাজি  
 ভাবে মন কর তারে রাজি

ধার চিনিয়া ধারার খবর ঠিক কর  
 নইলে পড়বি মারা ; সকালে কাজ সার  
 ও রসিক যারা জানে তারা,  
 কোন্ জাগায় সেই কল  
 কলকৌশলে ঠকঠকায়, ভক্তি রসের জোঙ্গাল আইনে  
 ও সেই ছয় বলদের ঘাড়ে দ্যাও লাঙ্গল  
 ছয় বলদে করবে নড়াচড়া  
 পিঠে মার ভক্তির কোড়া,  
 কোড়া খেয়ে ঠিক হবে  
 ও দীন পাগল কানাই বলে  
 বিধির ফাঁড়া কাইটে যাবে অনায়াসে  
 এবার জমিটারে চাষ করে  
 ঢেঁপা মার, চিনে মার ঘাসে ॥

( ১০০ )

আমার দেহ জমি আবাদ হইল না  
 গুরুর বীজ বুনতে পারলাম না  
 ও বীজ বুনতে পারলে হোত কামরাজ্য ফল  
 পুষ্ট হত দানা  
 গুরুকে নিবাদের প্রসাদ ভাই  
 তাই আমার ভাগ্যেতে হোল না ।  
 চিরদিন ক্ষেতে মইলাম খেটে  
 বে জোতে লাঙ্গল লইলাম জুটে  
 আমি লাঙ্গল জোঙ্গাল নিয়ে গেলাম স্বর্ণধামের মাঠে  
 পাগল কানাইর কাচি পাহলি ভাই  
 বীজের দাম দিতে জীবন ফাটে ।

ও চাবার প্রেম ভাঙলে না লয় জোড়া  
 ও গুরুর প্রেমের এ অঞ্চল হামেরা  
 আগে জানতে পারলে দিতাম ক্ষেতে  
 জ্ঞান-প্যারাকের বেড়া  
 গুরুকে না দিয়ে বস্তু ভাই  
 খাইতাম সেই গোপন রসের পেড়া।

( ১০১ )

শোন বয়াতি মায়ের উদরে ছিলেন যখন, নামটি ছিল কি ?  
 কোন্ পালি তার আসন ছিল নামটি তখন জপ্ছ কি ?  
 শুনি চব্বিশ চান্দ—আদি চন্দ্র কিসে হইল  
 আলীর বাপের কি নাম  
 কোন্ চান্দে হয় চাঁদের খেলা  
 কোন্ চান্দে হয় কয় মোকাম  
 দেহে আরও চারটি খান্দান আছে  
 খান্দানের কি নাম।  
 আরও আছে মক্কা মজিদ ঘর  
 সে ঘরে আজান দেয় কোন্ পয়গম্বর  
 তাই পাগল কানাই কয়, সভায় এসে বয়াতি বল তার খবর।

( ১০২ )

এই সে দেহ মানুষ ঘুড়ি, তিন শ ঘাইট জোড়ার হাড়ি  
 সেই ঘুড়ির কামানী,  
 সে দীর্ঘ পাশে, সাড়ে তিন হাত পাখা ছুখানি  
 তিন শ ঘাইট রাগের বন্ধন, তাহা দেখে লাগে ধন্দ,  
 আরও চামড়ার ছাওনি।

সেই সে ঘুড়ি তৈয়ার করে, কামেলা তার ভিতরে  
 সে উর্ক ভাবে সূতা রাখে নীচে উড়াইছে,  
 উড়তেছে হাওয়ার জোরে, কামেলা তার ভিতরে  
 সেই জোরে ঘুড়ি উড়তেছে।  
 তাই পাগলা কানাই বলে  
 দেখে সেই ঘুড়ির ছবি, সদায় প্রাণ বিদরে  
 বাতাস যে দিন বন্ধ হবে  
 ঘুড়ি সে দিন ধাপ্পা খাবে  
 উড়বে না যুগযুগান্তরে।

( ১০৩ )

শোন ভাই বয়াতি তুমি  
 জিজ্ঞাসন করি আমি দেহের কারখানা  
 ৩৬০ টি আছে জোড়া ৩৬০ আছে টানা  
 আদিমূল আর একটি টানা  
 সেই টানার সঙ্গে ঘটনা  
 সেই টানাটি কোথায় রে ভাই  
 তাই আমার শুনতে বাসনা।  
 আছে ভাগীরথ আর কাল যমুনা  
 আছে ত্রিবেণীর ঘাট ত্রিকোণার হাট কোথায় ঠিকানা  
 তোর নাকের নিঃশ্বাস কেবা টানে তাই কেন ভাঙ্গা বলনা  
 মন মণি আর দুইজনা  
 তারা কি নাম করে জপনা  
 ঘুম আসিলে দেহ ছেড়ে বাহিরে থাকে কোনজনা ॥  
 মায়ের উদরে জন্ম নিয়ে ভেসেছিলে দুখ্ সাগরে  
 তখন আসন ছিল কি



কি খাইয়া জীবন বাঁচালি গুরে ছিলি কোন শিওরী  
 তাই বল ও ভাই বরাতি  
 তোমার দেহে ছিলি কোন কালি  
 কোন কালিতে চোখ মাজিলে, জন্মের আগে দেখল্যা কি ॥  
 পাগলা কানাই এ ধূয়া বান্ধাচ্ছে  
 মথুর্মদি<sup>১</sup> তাই বলত্যাছে  
 দেহের অর্থ বহু আছে বেশী বলবো কি  
 দুই চার কথা জিজ্ঞাস করি জবাব দে ভাই বরাতি  
 আমি অতি মূর্থমতি আগে করি মিনতি  
 শাস্ত্রমত জবাব না দিলে  
 শেষে ঘটাই কুমতি ॥

<sup>১</sup> মথুর্মদি :—পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার বারুপুর গ্রামে এঁর  
 জন্মস্থান। তাঁর কথা অন্যত্র বলেছি। ১৯২৫-৩০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ইনি  
 মারা যান। এঁর বহু গান আমি সংগ্রহ করেছি। এ গানের-সর্বশেষ পয়ার  
 বোধকরি এঁর রচনা।

( ১০৪ )

শোন ভাই সকলরারে তোরা শোন গাড়ীর খবর  
 এক গাড়ীতে ছত্রিশ জাতি করতেছে স্তম্ভল  
 ও তোরা শোন ভাই সকল।  
 তাই পাগল কানাই কয় রাস্তায় গাড়ী পত্তন হবে যখন  
 বাতাসে মিশ্বে যোগীগণ।  
 আর আছে যত যাত্রীগণ বাতাসে হবে মিলন  
 আরও কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভোম, মদন  
 যেদিন তারা সকলেই ছাইড়্যা যাবে—একা বসে র'বে মন।

আবার বিলাতে যখন গাড়ী করিবে গমন  
 যোল যোল বত্রিশ জনে চালাও গাড়ী রাত্র দিনে  
 —ও মনের মতন  
 সে গাড়ীর টিকেট মাষ্টার যে জন হয়  
 —ঘাটে ঘাটে টিকিট লয়  
 তা দেখিয়া ছয় পাগলে কর্ছে গোল—শোনরে ভাই সকল  
 আবার আল্লা হরি কিছুই বলে না—ও সেই নিত্যধামের  
 পাগল ।  
 যখন গাড়ী বিলাত থেকে ফিরে আসবে  
 অন্ধকার ধন্ধকারে কুয়াকায় নৈরাকারে—সেদিন ছিল কেমন  
 আরও দশমাস দশদিন সেইখানে থেকে  
 —ভবে এসে বলি চেতন ।

( ১০৫ )

মানুষ জমিন ভাই  
 যতন তার করা চাই  
 যতন না করলে ফসল মিলে না  
 এমন বাগানেতে কতই না ফুল  
 ফুটালে ফুটবে জবা চাঁপা বকুল  
 গন্ধে অতুল  
 হায়রে বাতুল  
 তুমি তার খবর পেলে না ॥

নীচের গানগুলোতে সাধনতত্ত্ব এবং ধর্মতত্ত্বের বিভিন্ন দিক কবি তাঁর  
 বক্তব্যের মধ্য দিয়ে উন্মোচন করেছেন—

( ১০৬ )

পাগল কানাই বলে ভাই সাহেবরা  
 কত রঙ্গ দেখলাম এই ভবে এসে ছুই চোখে

আমি যতই করলাম ধর্ম কর্ম সকলই ফাঁকি জুকি  
 একটু ভাল কইতে হোল, সার কেবল আল্লাকে ডাকি ॥  
 ও এক নারী আর এক অস্থ পুরুষ  
 দুইজনারে এক কবরে মাটি দিয়া খুইছিল  
 আমি শুনতে পাই মুরশিদের গুখে  
 জেন্দা তার ছেলে হোল  
 ছেলে হলে শোন গো বলি  
 তারা তিন জন এই ভবেতে এলো  
 শুনে প্রাণ কান্দে ডরে আমি কান্দি থরে থরে  
 জানিলাম আলার লীলা খেলা যা ইচ্ছা তাই পারে ॥  
 তোমরা রাখো কথা খুট করো না  
 পুছ কর আলেমের ঠাঁই  
 সত্য কি মিথ্যা কথা  
 তোমরা যেন জান যেন মান  
 সকলি আলার ক্ষমতা  
 আলি শোকর মেরা দরগায় তেরা  
 দলিল কভু না হবে বুখা ॥

( ১০৭ )

খশুরের সঙ্গে মজিয়া সঙ্গে এক নারীর দেখ গর্ভ হয়েছে ।  
 তার পতি এসে কোলে বঁসে মা বোল বলে ডাকতেছে ।  
 স্বামীকে বলছে বাবা আমার দুগ্ধ খাবা স্বামী তারে হরণ করত্যাছে ।  
 সেই সতী নারী ভবের মাঝে কার ফুলে পয়দা হয়েছে  
 ব'লে যাই দশের কাছে শাস্ত্রে প্রমাণ আছে ।  
 ও তার জিজ্ঞাসা নাও পণ্ডিতের কাছে ।  
 আর সেই যে নারী দীনবন্ধু পয়দা কর্যাছে ;  
 কত ফকির বোষ্টম আলেম ফাজেল রাতদিন ঘুরতেছে ;

সেই যে নারী ভবের পরে কেউ চেনে তারে কেউ তো চেনে না  
 তাই বুঝে আপন কাজে মজে ঠিক রাখ বোল আনা  
 পাগল কানাই বলে, নারীর চরণ তালাশ ক'রে পাল্যাম না ।  
 যদি নারীর চরণ প্যাতাম ভবের কাম সারা নিতাম  
 ভবে আমার বিপদ থাকত না ।

( ১০৮ )

দিগ্বিজয় করতে রাবণ রাজা গিয়াছিলেন কৈলাশভুবন,  
 বিধির লিখন—লম্বা পতি দিল দরশন ;  
 লম্বাকে ধ'রে জোরে রাবণ তার হরণ করে,  
 সেই কথাটাই কই, শোনে সর্বজন ।  
 লম্বা পতি আর ভগপতি তারা শাস্ত্রেতে এক অংশ ছিল,  
 কার স্মৃতেতে আদ্যাশক্তি বহুবিধ হইল ।  
 মহাদেব বিষপানে বড় কষ্ট পাইয়্যা ম'ল  
 দুগ্ধ খাইয়া জীবন দান পাইল ।  
 সেই যে নারী শোন সব প্রীতি-কথা মিথ্যা ;  
 জগতের পতির সঙ্গে জগতেরও কণা-বিবাহ হয় ।  
 সম্পর্কে বসুমতী সে দেখ রামের শ্বশুড়ী হয়  
 সে কথাটি বিচার ক'রে পাগলা কানাই ক'য়ে যায়  
 ব'লে যাই দশের কাছে শাস্ত্রে প্রমাণ আছে  
 রাম শ্বশুড়ী মিথ্যা কথা নয় ।  
 ( মঃ উঃ সঃ )

( ১০৯ )

শোন বয়াতি একটি কথা শুধাই তোমারে  
 এক মৃত্যু নারীর গর্ভ হোল লেখা আছে শাস্ত্রে  
 ওরে মৃত্যু ম'ল মাটি দিল ছেলে হয় তার কবরে  
 শুনে ছরস্তু কথা প্রাণ কাঁপে ডরে

পাগল কানাই বলে জহিরদ্দি <sup>১</sup>

একথা পালি কোন্ দ্যাশে ॥

তিনটি ছেলে জন্ম নিয়ে গেল তিন দ্যাশে  
দিবস কয়েক বাদে উহার মায়ের শরীর যায় পচে  
সংবাদ পায়্যা আসলো ধায়্যা বসলো তারা মা'র পাশে  
পচা মাংস দেখে ওরা তিন জনা হাসে  
কানাই বলে জহিরদ্দি কথাটা বলছি প্রকাশে ॥

<sup>১</sup> জহিরদ্দি—এঁর সঠিক পরিচয় জানতে পারিনি। তবে পাবনা জেলা থেকে তাঁর কয়েকটা গান সংগ্রহ করেছি। তিনি পাগলা কানাইয়ের একজন ভক্ত শিষ্য ছিলেন।

( ১১০ )

ভবের পর এক সতী কন্যা পয়দা হয়েছে  
চারদশকে চল্লিশ দিনে বিয়ে হয় তার সত্তরে  
তিন মাসে গর্ভ ধরে সেই না নারীর উদরে  
তবু তো সে সতীকন্যা সতী নাম ধরে  
উহার পতিক নিয়া গর্ভ হোল, অসতী কে বলে তারে ॥  
এই যে সতী কন্যার পতি সে যে পুরুষ মন্দ নয়  
পাগল কানাই বলছে বেটা পণ্ডিতি করেন সভায়  
ওরে দিনে খাটে ভূতের বেগার রাত্রিযোগে ছেলে হয়  
মায়েক কোলে কাঞ্চা ছেলে যেমন দুগ্ধ খায়  
ঐ রকম আওরতের কোলে পুরুষ সে রজনী পোহায় ॥

তাতে যদি না বোঝরে যত অদভুত  
স্বামী হয়্যা গেলা পেটে ভবে এসে খেল্যা দুধ  
হে রে নির্বুদ্ধি উন্টা চাষা তারাই বোঝে উন্টা বুঝ  
নারীর জন্ম খাটতে খাটতে পিট দিয়া বের হয় সূত্  
মায়াজালে মত্ত হয়ে পরকাল হারালি তাবুদ ॥

( ১১১ )

শত রঙ্গের দেখি রে গাভী এক রঙ্গের দুধগো দেখি  
 তবে কেন ত্রিজগতে মানবিচ করত্যাছি  
 এক মায়ের দুধগো আমরা বাপে বেটায় খাত্যাছি ॥

সে বড় আজব কথা, কথা শুন্যা লাগে ধান্দা  
 এক মায়ের দুধগো দেখো খায় বাপে বেটা  
 তার সাক্ষী শাস্তরেতে লেখা আছে, জরু হয় মাতা ॥

কথা শুনে লাগে ভয়  
 সেও কথাটি শুনতে উল্টা শোনা যায়  
 আগে হয় ছেলের জন্ম, তার পাছে পিতা জন্ম পায় ॥

ছেলের বড় একজন আছে থাকে তার মায়ের কাছে  
 গুপ্ত রূপে রয়  
 কেউ চেনে কেউ চেনে না এই দুনিয়ায়  
 লাল রঙ্গ তাহারি সুরত, তাতে সেই ছেলে জন্ম পায় ॥

পাগল কানাই যখন ধূয়া বাকি, মানে করে বসে কান্দি  
 দিবারাত্রি ; ও ধূয়ার মানে করতি  
 থাক পড়ে মুখ কহিবে, কত পাণ্ডিতের লাগে ধাক্কি ॥

( ১১২ )

অধম পাগলের মনে কত কথা কয়  
 কথা উল্টা শোনা যায়  
 শোলা ডোবে পাথর ভাসে রে  
 পূর্ণিমার দিন অমাবস্তা হয় ॥

পূর্ণিমার আলোক দেখে চক্ষু হয় কানা  
 আমি না পা'লাম সেই আলোর ঠিকানা

আমি কানার মত ঘুরিয়া বেড়াই রে  
 না জানলাম সেই পথের নিশানা ॥

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের কথা বান্দা লোকে কয়  
 হুকুম কর্যাছেন খোদায়  
 ফজর জহর আছর মগরব এশা রে  
 কোন্ অক্স তার আগে পরদা হয় ॥

এই ধুরার অর্থ জিজ্ঞাস করলে  
 কথা না বললে তো নয়  
 ওরে মা'র বিয়ার দিন বাপের জন্ম রে  
 সেই কথাটি সভায় বলতে হয় ॥

( ১১৩ )

ছিদামপুর গেরামে ছিলাম নীল দরিয়ার পরে  
 নীল দরিয়ার তুফান দেখে বাপের মস্তকে ব'লে  
 কৃষ্ণকলি ছেদ করিয়ে রক্ত জবার পড়ে  
 মায়ের গর্ভে ছিলে ॥

মায়ের গর্ভ যন্ত্রণা বিষম যন্ত্রণা  
 ভবে এসে রে মন সব গিয়াছ ভুলে  
 ভাইয়ের স্রবাদে পিতারে মন কবরে কার কাছে  
 বাপের শরীরের রামনা লোচন মা'র শরীরে আছে  
 স্ত্রীর গর্ভে পতির জন্ম মা বলে ডাকাত্যাছে  
 কোলে দুধ খাত্যাছে ॥

স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে রে বাবা  
 ও দুধ খাবা  
 কানাই চাঁদ তাই বসে ভাবত্যাছে ॥

বিন্দু বাড়ীর রাজ মিস্ত্রী মঠ তৈরী করেছে  
 বাতাসরে সে বন্দী করে যে ভাবে রেখেছে  
 ঠাকুরদাদা জন্মদাতা শাস্তুরে লেখেছে  
 কথা কব কার কাছে  
 বিধির সব কাণ্ড দেখি অতি সুন্দর  
 কানাই তাই বসে ভাবত্যাছে ॥

( ১১৪ )

কোন্ দিবসে রাত্র পয়দা  
 কোন্ দিবসে দিনবাসী  
 কোন্ দিবসে চন্দ্র সূর্য  
 কোন দিবসে মা খাকি  
 আর পানির তলে আছে মানুষ  
 সেই মানুষের আহার কি ?  
 সেই পানি শুকাইয়া গেলে  
 সেই মানুষের উপায় কি ?  
 দুইটি ডিম্বু ছয়টি কুসুম  
 বার বাচ্চা শুনেছি  
 তাই পাগলা কানাই বলে ভারে ভারে  
 ধূয়ার মানে কর বয়াতি ।  
 ( মঃ উঃ সঃ )

( ১১৫ )

শোন বয়াতি তব্ব কথা তোমায় জিজ্ঞাসি  
 সত্য বলিও দিও না ফাঁকি  
 ওজুদ ভাণ্ড কর খণ্ড  
 দেখি মধ্যে আছে কি



কয় কোটি তারা আছে  
 তাই বল দেশের কাছে  
 কথা না বললে পড়বা পাঁচো  
 তোমায় জিজ্ঞাসি  
 আরও আছে মক্কা মজিদ ঘর  
 আজ্ঞান দেয় কোন্ পয়গম্বর  
 বল বয়াতি তারই সন্ধান ।  
 আরও আছে সাত সমুদ্রের তের নদী  
 মধ্যে মধ্যে দেগি চর  
 কোন্ চরে তোমার বাড়ী  
 কোন্ চরে সাঁইয়ের কাচারী  
 আবার কোন্ চরে তোমার বাড়ী  
 বল কথা তাড়াতাড়ি  
 পাগলা কানাই বলে  
 শুনব বলে বাজ্জা হইয়াছে আমার ।

( ১১৬ )

পাগল কানাই বলে ভাই ও বিধাতার লীলার সীমা নাই  
 ওরে মনেরও আত্মলাদে আমরা গান করি আর সখ দাবড়াই  
 আরও দুই হস্তে দুই খুজুরী বাজাই ।  
 আচম্বিতে এক কথা শুনে রে আমার প্রাণ বাঁচে না ভাই ।  
 ও একটি দিব্যপুরুষ ঘাটে গিছিল  
 সে যে ডুব দিয়ে কথা হ'লো ।\*  
 ও সওদাগরে ধরে নিল  
 বার বৎসরের কালে তিনটি সন্তান তার হ'লো  
 আবার ফিরে সেই ঘাটে আ'লো  
 সেই ঘাটে স্নান করিয়া রে আবার পুরুষ হ'লো ॥

আবার পুরুষ হয়ে বাড়ীতে চলে যায়  
 ও আমার মনে বলে হায় রে হায়  
 কি হলো কি হলো রে আমার  
 আমি পুরুষ হয়ে নামলাম ঘাটে  
 কথা হয়ে চড়লাম নায়।  
 বার বৎসর করলাম বাণিজ্যের সদায়  
 সে জনা কোন ব্যক্তি ছিল রে ও বরাতি বলে দাও আমার।

\* তুলনীয়— ডুব দিল নিজ ঘাটে  
 ভিন্ন এক দেশে উঠে  
 নারীরূপে পানির উপর।

( হেয়াতমামুদ আশ্বিয়াবাণী )

( ১১৭ )

আমি বলবো কিরে একটি সাধুর কথা বলে যাই সভাতে  
 হাইটা যাইতি কত সাধুর কোপনীর ছিঁড়ে চড়ে  
 উজ্জ্বল্যে মারে কোপনীর ছিঁড়ে ও মদনা পর্যা যায় মাঠ্যালে  
 কত এটুক্য সাধু পেটুক্য সাধু পেটের জ্বালায় কত সাধু  
 পেটের জ্বালায় কলাল কলাল করে।

ও আবার ক্ষিদে লাগলে খেতে বসে-ও খাবার দেব্য কত আছে  
 লালমন বলে লটকা চোখে খাওয়াইয়া মন্দ না  
 তা থুইয়ে মদন ত খায় নাইটানা।

চিরদিন মদনা চোরার স্বভাব জানি  
 চুপে চাপে চুপ করে খায় কাম নদীর পানি  
 কাম নদীর ও কুষ্ঠা পানি মদনা খাইয়া করে বমি  
 শেষটায় হয় কলেরার বেরামী  
 পাগল কানাই কয় কয়জন সাধু ভবের 'পরে আছে ?

মদন তো নদীর জলে ছান করে না ডুবে পারে মাঠ্যালে  
 আবার কত সাধু ফোটা তিলক করে  
 উপরে করে তিলক মালা কাম জ্বালায় মদের মদেলা  
 ও সদায় হাট বাজারে ফেরে ।

( ১১৮ )

ওরে ‘মা’ ‘মা’ বলে রোদন করো না  
 তুমি সাধন ভজন জানো না  
 ওরে বাপ খুইয়ে কর মায়ের সাধনা  
 বাপ হচ্ছে জন্মদাতা তারে তুমি চেন না  
 আবার বাবা বলে ডাক দেও ভেড়রে—শুধালাম ওরে দিনকাণা ।  
 হ’লো মাতাপিতার এক জায়গাতে স্থান,  
 তুই একজনকে রাখ’লি সম্মান—আরেক জনকে কর’লি অপমান  
 ও তোর বাবার নামটি জিজ্ঞাস কর’লি  
 বলিস না তোর বাবার নাম  
 আবার বাবার নামটি গোপন রাখ’লি  
 এই কিরে লায়েক বেটার কাম  
 তাই পাগল কানাই কর দশের হুজুরে—এই পিতাই বড় সংসারে  
 তুই বোকা চেনস না তারে ।  
 আমার পিতা পাগল হয়ে জন্ম দিল তোমারে  
 আমি ভারে ভারে বলতেছি তোরে—ও তোর মা ছিল কোথাকারে ?

( ১১৯ )

মুক্তি কিসে হবে গো জীবের ভক্তি বিহনে  
 ভক্তি হইছে অমূল্য ধন গুরুর কাছে লওগো জেনে  
 গুরু হয় জ্ঞানের দাতা সে জানে গর্মব্যথা  
 গুরু বিনে আর কে জানে ?

ও দেহ মন সঁপিলে, আমার মন পাইবে সেই দিনে  
 আরও তিন মন্ডরে একমন করা সামান্য নয় সে বেষ্ম লেঠা  
 এক মণের ফের ছয় পাহারী কাওড়া বাজায় মদনা বেটা  
 তস্থলদার হচ্ছে মদন অমূল্য ধন হ'রে নিচ্ছে মালের কোটা  
 মদনকে না চিন্লে ঘুরবে না ফেরের কাঁটা ।

তাই পাগল কানাই কয় ভবে আইসে

—ওকি কাম করলি মন

তোমার এইভাবে দিন যাবে না ।

ও দিন থাকতে ভজরে গুরুর চরণ ।

( ১২০ )

ওরে তোর কালী 'মা' তার গুণপনা ভাল

সে স্বামীর বুকে পাও দিল

সেও কথাটি সভাতে বল ।

আমার মা বরকত যিনি আলির বুকে কি পাও দিছিলো ?

এমন বেজাইতা মা তোর কোন্ দেশে ছিলো ।

আরও নবীর বেটি বেহেন্তেরও দেওয়ান— তারে

মা বইলাছে দোস্তে ছোবেহান

সে যে পার করবে উম্মতের ভরা

তুই তারে চিনলি না কেন ?

ও তোর ঘাড়ে আছে আসল শয়তান—শোন্‌রে বেটা অজ্ঞান

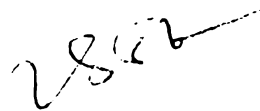
তোরে নাগাল পাইছে বেলগাইছা ভূতে—

ঠিক রাইখো ঈমান ।

মণি, এই হলো তোর নি পথ কাজারী

তুমি পণ্ডিত হইছ ভারী—অনুগানে তাই বুঝতে পারি

পাগল কানাই বলে ভাই সকলের বাজাইরা বিরোল বেপারী



‘নি’ আকারে আকার দিয়া পয়দা হইল কাদের গনি  
নয়কে বরকত ভবানী তা বলিস কিসের জ্ঞি  
পেটে নাই মানসের চিহ্ন—মিছা যাগ্জারী ॥

( ১২১ )

আরও গুপ্তকথা ভেঙ্গে দিল সভায় এসে বয়াতি  
একজনের পাঁচটি মুণ্ড কথার মানে কি ?  
আমি সে কথাটি তোমায় জিজ্ঞাসি  
আরাক জনার মৌল মুণ্ড আরও ছিল অষ্ট পাও  
আমার ছুহার জবাব দিয়ে সভায় ছুহা গাও  
না হলে পর দেশে চলে যাও  
কত আলেম ফাজেল ফকির দরবেশ বসে বসে ভাবছে তাই  
কত কিতাব কোরাণ ভারত পুরাণ কথা মিথ্যা নয়  
পাগল কানাই বলছে কথার মানে চাই  
—না হলে ও ছাড়বো না তোমায় ।

( ১২২ )

শোনরে মন তোরে বলি বাপের মস্তকে ছিলি  
কাল রূপেতে রতি হয়ে মায়ের উদরে আসিলি  
যখন ছিলি রক্ত বরণ সে সব কথা নাইরে স্মরণ  
দেহ পয়দা করেছে আল্লা ফিকিরে  
ও মন শুয়ে ছিলি কোন্ শিউরে  
সত্য করে বল দেশের ভজুরে ॥

দেহ পয়দা মন বেদনা

দেহ জরীপ করে ছয় জনা

এক বেটা কুয়ারী এসে সদাই বলে তাইরে না  
 আরেক জন তার কাছে বসে সদাই বলে তাইরে এসে  
 জেনে কি তা জান না  
 ঘুমালে বাহিরে জাগে কোনজন  
 বরাতী তাই ক্যান্ ভেঙ্গে বল না  
 ঘুমালে বাহিরে জাগে কোনজন ॥

পাও নাই সে দৌড়ে ফেরে পাখা নাই উড়াল ছাড়ে  
 মুখ নাই সে আহা করি শুনলাম কথা সন্ধানে  
 পাগল কানাই তাই ভাবিয়া বলে মা যখন নানীর পেটে  
 আমি তখন আছিলাম ভবের হাটে  
 কথা বলে পরে লাগে ধাঁধা বুকে দেখ অস্তরে  
 সে সব কথা লেখা আছে শাস্তরে ॥

### ৬. হেঁয়ালী

সাধন তত্ত্বমূলক গানগুলোর মধ্যেও এ জাতীয় গান কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে উল্লিখিত গানগুলোর যতটুকু পারা যায় অর্থোদ্ধার করেছি। সব গানের অর্থ ঠিক বোঝা দুরূহ।

( ১২৩ )

শুনে আশ্চর্য কথা প্রাণ তো বাঁচে না  
 আমি ভেবে পাইনা ঠিকানা  
 সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টি করলেন না  
 ভবে একস্তরে আছে ভাই তারা দুইজন  
 একজন ছাড়া আরেকজন চলে না  
 পাগল কানাই বলে ভাই সকলে  
 ভবে আর পাই না ঠিকানা ॥

তারা এক-অঙ্গে আছে দুটি ভাই  
 তারা একনাম ধরে ছুজনাই  
 লোকের মুখে শুনেতে পাই,  
 হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ নাক মুখ তাদের কিছুই নাই  
 বেদ পুরাণে নাম পাবা না  
 কে দিয়াছে তাদের জন্ম, সে কথা কারে বা শুধাই ॥

দুইটি ভাইয়ের মস্তকের উপর  
 দুইটি শিঙ্গা আছে কি বাহার  
 দেখ নাকি অসম্ভব কারবার  
 দিলে বোঝা হয়ে সোজা অমনি চলে অনিবার  
 বিনা সোয়ারে চলন নাই তাহার  
 বলে কানাই সবারে ভাই সে মর্ম পেলাম নারে আর ॥

টীকা-- গানটা খড়ম সম্পর্কে লিখিত।

( ১২৪ )

আশ্চর্য এক কথা শুনে বাঁচি না প্রাণে  
 আমি ভাবি রাতদিনে  
 তোমরা বিচার কর ভাই সাহেবরা বল তার মানে  
 ভবে এক জনার জন্ম বুঝি না তারই মর্ম  
 আমার এই কর্ম-দোষ গুণে ॥

রাত্রিদিনে দুইখানি পা আছে তার খাড়া  
 তারে ডাকলে নাই সাড়া  
 সে অপরের পায়ে করে যুদ্ধ ভেবে হই হারা  
 ছাড়ে না আপন জায়গা করে সে হেলাডোলা  
 দেখ ভাই এ কেমন ধারা ॥

কবি পাগলা কানাই

তুমুল যুদ্ধের কালে তারে করায় পানাহার  
ছই পায়ে একটি লোক তাহার  
লম্বায় দেবী কাটার সেবী চারটি কান তাহার  
রাত্রদিন ভাবছি বসে  
না পেলাম তারই দিশে  
চারপায়ে বদন খানি তার ॥

যার সাথে করে যুদ্ধ নাই তার চেতন  
কানাই কর সে কথা কেমন  
মরার সাথে করে যুদ্ধ বলছে পাগল অভাজন  
একি বিপরীত কথা অস্তুরে লাগে ব্যথা  
কার কাছে করি জিজ্ঞাসন ॥

চার যুগেতে সেই যে বীর এক নামে আসে রণে  
তারে পূজা দেয় সর্বজনে  
নাক আর চক্ষু কর্ণ বিধি তাক দিলেন না ক্যানে  
কে দিল তারই জন্ম পেলাম না তারই মর্ম  
আমার সেই কর্ম-দোষ গুণে ॥

টীকা—টেকি-কে লক্ষ্য করে এ গান লিখিত ।

( ১২৫ )

আজব এক সখস্বর কথা ভাই  
আমি এই সভায় বলে যাই  
হস্ত পদ কর্ণমূল তার কিছই নাই  
শূন্যভরে হাওয়ার লড়ে পবনে সে চলে যায়  
ও তার বাতাস বিনে কোনই গতি নাই  
গূর্যমতি আমি কানাই জিজ্ঞাসা করি ভাই  
তাই বলি সভায় ॥



খোদায় পয়দা না করে তায় ভবের পরে  
 ভারতে লেখে ভারে  
 মস্তকে ছুই শিঙ্গা গাড়া দেখে ভয় করে  
 অঙ্গে চারখানা বসন পরা সর্বদা থাকে  
 বিনে মুখে বাজায় বাঁশী  
 ও তার বাঁশী বাজে কোন্ তারে ॥

শোন ওরে পালি দোহারগণ  
 কথা করি জিজ্ঞাসন  
 সেই সখ্‌স চলে যখন  
 শৃঙ্খলে হাওয়ায় লড়ে বাউলি পারে কি কারণ  
 বয়াতি বল তাই এখন ॥

টীকা—গানটা চার নিশান ধারী এক রকম ঘুড়িকে লক্ষ্য করে লিখিত।  
 পাবনা জেলায় এর প্রচলন প্রচুর।

( ১২৬ )

আজব এক সখ্‌স পয়দা দেখি ভবের পরে  
 উব্দা ভাবে জন্ম বেটার শুনি কথা শাস্তুরে  
 সোয়া ছুই চোখ পৌনে তিন কান বিধি দিলেন তারে  
 পাঁচ মাথা তার ঠ্যাং আড়াই খান  
 চার লেঙ্গুর একই সমান দেখে ভয় করে ॥

ঠেলে তাক নড়ান যায় না উড়ে যায় বাতাসে  
 খুঁজলে নাগাল পাওয়া যায় না আপন মনে আসে  
 মণির কুলে জন্ম ব্যাটার আপন মণির ঔরসে  
 কত যোগী লোকের যোগ ভঙ্গ হয়  
 শুনে ভয় পাই রে তরাসে ॥

একমাসে তিনবার মরে ফিরে সে জেন্দা হয়  
 মণির জোরে বেঁচে আসে ফিরে রাজসভায়  
 সবে বলে পাগল কানাই সভায় এসে মিথ্যা কয়  
 কত মানুষ দেখে ভয় করে না

রাত্রিদিন সে সদরেতে রয় ॥

টীকা—গানটার অর্থোদ্ধার করতে পারিনি। তবে বাতাসে জন্মে এবং স্বপ্নায়  
 এমন কোন প্রাণীর দিকে ইঙ্গিত আছে বলে মনে হয়।

( ১২৭ )

নতুন এক ধূয়ার কথা কি বলিব আর  
 পাগল কানাই বাঁধছে ধূয়া মানে করে লেও তাহার  
 আধহাত ছেলের দেড়হাত দাড়ি কে দেখেছে ভবের পর  
 শাস্ত্রে তাক পাওয়া যায় না

কেবল তার গল্প করা সার ॥

আরেকটা দেবতা রে ভাই এই ভব মাঝে  
 ছেলে হয়ে মাতা মরে গুনেছি গুরুর কাছে  
 আরেকটা সখস রে ভাই সোয়া শও পা তার আছে  
 মাথার উপর শিং ছুটি তার বিধি দিয়াছে  
 গাও দিয়া তার চেংটা গন্ধ

জন্ম তার উড়া বাতাসে ॥

আরেকটা সখস রে ভাই দশ হস্ত তার  
 আগা পাছার নাই ঠিকানা পাগড়ি বাঁধা মাথার পর  
 মধ্যে নায়ে কপাট মেরে বসে আছে সদাগর  
 নীচে কুঠুরী কাটা দেখতে কি বাহার

কোন্ সখ্‌স সে কও বয়াতি  
বল তাই সভারই মাঝার ॥

টীকা—এখানে দ্বিতীয় পরারে উল্লিখিত প্রাণী সম্ভবতঃ বহু পদবিশিষ্ট প্রাণী  
ক্যাপ্তা। অথু ছপয়ারের অর্থোদ্ধার সম্ভব হয়নি।

( ১২৮ )

ভবের পর এক সখ্‌স পয়দা  
খোদার পয়দা নয়কো সে  
আস্‌মান আর জমিন না ছিল পবন পানি  
ত্রিভুবন জুড়ে রয়েছে  
পাগল কানাইর বাড়ী তার কাছে।  
মহম্মদের নয়কো উম্মত আদমের নয়কো বুনিয়াদ  
ভবের পর বুট মুট খেলায় সে।  
ওরে ভাই সকলরে পাগলা কানাই কয়ে যায়  
কত ফকির বৈষ্ণব আলেম ফাজেল পড়ে গেছে তার ঠেলায়—  
গেল চারিটা কাল হয়ে গেল সে বেহাল  
কারো পরকাল হল না পাগল কানাই মিথ্যা কয় না  
শোন ভাই আমার তো বুদ্ধি জ্ঞান কিছু নাই  
দশ ছনিয়া যেদিন পয়দা  
সেই সখ্‌স সেইদিন পয়দা  
বেদ পুরাণে খুঁজলে পাবা না  
ওরে ভাই সকলরে তার সন্ধান করলে না  
অসন্ধানে থাকলে পরে সেতো কারে ছাড়বে না  
যাবে বুদ্ধি, হবে সব রসাতল  
এক সখ্‌স বসে আছে গাছের তল ॥

গানটার অর্থোদ্ধার সম্ভব হয়নি।

( ১২৯ )

শুনে আজব কথা প্রাণে ব্যথা  
ভেবে আমি হই অবাক  
এই ভবের পর এক সখ্‌স পরদা হয়েছে  
তার গাধার মত ডাক  
হরিণের মত চলে বাঘের মত মারে লাফ  
নাই জমিনে নাই পাতালে  
যেদিকে যায় সেই দিক চলে  
তাই পাগলা কানাই বলে ॥

ভাইরে তোরা মাস পাঁচ ছয়গে থাক্  
এক ফারসী কথার মানে করে  
বলে দাও আমারে  
কেউ বলে ও বুটা কথা আমি ভেবে মরি সেই গোলে  
সে কি পরকান্ন পাবে, পাগল কানাই তাই বলে ॥  
শোন ওরে ভাই সকলরা  
আলেনের গুণ কই কারে  
চারি রঙ্গের এক জানোয়ার রয়েছে ভবের পরে ॥  
ত্রিভুবন করত্যাছে অসার আসি ছয়মাস অন্তর  
আমি উন্মি হয়ে কয়ে গেলাম  
বুঝে ছাখ ভাই সকলে  
দলিল কি মিথ্যা হবে ইমান তার বুখা যাবে  
পাগল কানাই তাই বলে ॥

( ১৩০ )

ও শোন ভাই সকলের একটি মজার কথা পইড়াছে মনে  
আবার এক বেটাকে ঠেসে ধরে তার উপরে তিন বিটি বসে  
এই কাল কাটাইল হাসে রসে ঐ চারজন ভবেতে আইসে

তিন বিটি জগত মাল সেও চারজন কেউ কম না  
 ও তার একজন মইলে শোন বলি এই দেহ খাড়া রবে না  
 সে মুনস্কা ভাই যে তলে পড়ে গোড়গাড় পইড়া উঠতে পারল না ।  
 উঠতে পারলে শোন বলি ও তিন বিটির প্রাণ বাঁচাইত না  
 চিরদিন বিবাদ করে সেই যে চারজন  
 তবু তার উপিত গেল না ।  
 ও যে দিন ভাঙ্গব পিরিত হইব বিপরীত  
 সূখ সাগরে সরত বকে না ।  
 পাগল কানাই বলে ভাই সকলরে  
 কাল কাটাল হাসে রসে সেই  
 চারজন এসে ।  
 ( মঃ উঃ সঃ )

( ১৩১ )

আশ্চর্য একটি কথা করি রচনা  
 আমি ভেবে পাই না ঠিকানা  
 চাপানের জবাব সভায় বল না  
 আজব একটি সখ্‌স পয়দা কে বটে তা জানে না  
 এক পদ তার হাত হাজারখানা  
 খোদা তারে সৃষ্টি করে মানুষে মেরে ফেলে  
 ফের তো জীবন পেল সেই জনা ॥

তার সর্ব অঙ্গ কাঠেরই আকার  
 ছই মুরা ছই মুখ তাহার  
 লেজ একটা তার আছে পিঠের পর  
 সমারে' খায় দশ সের জিনিস  
 দেখে হলাম চমৎকার

ছই মুখেতে আটখানি পাও তার  
 শত শত মণ খেতে পারে বলি ভাই দশের কাছে  
 না দিলে থাকে বারমাস ॥

যে দিনে কে করবেরে আহা  
 তা দেখে কানাই হোল চমেংকার  
 যত দিবে ততই খাবে পেট ভরে না তার  
 বিধির লীলা বোঝা বিষম ভার  
 হাদিস দলিল কেতার কোরান  
 বলি ভাই তাহার বয়ান  
 সব জায়গায় প্রমাণ আছে তার ॥

যে দিন বান্দার মউত হবে  
 সেই দিন যাইবা তার কাছে  
 কিয়ামৎ পর রোজ হাসরে ময়দান পরে  
 একে একে বুঝে নিবে  
 মুখের কথা কয় না সে  
 ইশারাতে বুঝবে সকলে  
 দিন গেল ভাই বৃথা কাজে  
 কখন বা যাবো তার কাছে ॥

সমার<sup>১</sup>—একবার (সমাহার থেকে)

( ১৩২ )

ভবের পর একি রে ভাই আজব ঘটনা  
 পাণির তলে এক দেবতা থাকে সে চেনে কেউ চেনে না  
 মরা হয়ে তাজা আহাির ধরে খাচ্ছে সেই জনা  
 মার্গ দিয়া বাহ্য ফেরে চলতে পারে না  
 সে বাহ্য খাচ্ছে লোকে তাতে কেউ ঘিন্মা করে না

সমস্ত শরীর রে ভাই কাঁকড়া কাটা তার  
 রাত দিনে সে আহার করে পেট ভরে না সে বা কার ॥

আরেকটি সখ্‌স রে ভাই শিং ছুটি তার মাথার পর  
 হাত পাও নাই লড়ে চরে দেখতে ভয়ঙ্কর  
 যোগী সাধু হয়ে ভীতু তারা সব ভাবছে নিরস্তর ॥

পানির তলে তিন দেবতা থাকে যে সদাই  
 মুখ দিয়া সে আঙা পারে কইতে আমার লাগে ভয়  
 সাধু কি তা চিনতে পারে পাগল কানাই কয়ে যায়  
 পানির তলে তিন দেবতা থাকে যে সদাই  
 কোন দেবতার কি নামটি হয়  
 বয়াতী বল চাঁদ সভায় ॥

টীকা :—প্রথম পয়ারে উল্লিখিত দেবতা সম্ভবতঃ মাছ ধরবার ‘দোয়াড়’।  
 পাবনা জেলায় এর প্রচলন আছে। দ্বিতীয় পয়ারের সখ্‌সটি  
 ঘুড়ি। তৃতীয় পয়ারের তিন দেবতার মধ্যে দুটো দেবতার নাম  
 উদ্ধার করা গেছে। তারা যথাক্রমে শামুক এবং কাঁকড়া। তৃতীয়  
 দেবতাটির নাম উদ্ধার করা যায়নি।

নিম্নের গানগুলোতে কবি প্রেমের মহিমা ব্যক্ত করেছেন।

( ১৩৩ )

হায় কি গজার দোকান পেতেছে নিতাই  
 তোরা কেউ দেখতে যাবি ভাই  
 প্রেমরসে ভেজেছে বুরি  
 যে খেলে সে বুরছে তাই ॥

কানে কানে দোকান ভরা হরিনাম মনোহরা  
 তাপিত প্রাণ শীতল করা স্নান পাবা যত খাই  
 যাতায়াত সহজ সোজা খাজা গজার মুখে ছাই

ভাবরসের কারবারী, না জানে দোকানদারী  
 যে খায় এস্তার তারি প্রেমের বলিহারি যাই  
 সম্মুখে সাজান মাল, ধরতে ছুতে নাই বমাল  
 দোকানী এমনি সামাল, খুঁজলে হাতে হাতে পাই ॥  
 ( বাঙ্গালীর গান )

( ১১৪ )

পাগল কানাই বলে—প্রেম বিচ্ছেদে প্রেমের জ্বালায় সখিরে আমার  
 প্রাণত বাঁচে না।  
 আমি বলে গেল মথুরায়—আরতো ফিরে আলো না আমার প্রাণে  
 প্রবোধ মানে না।  
 আর কত কাল স'ব জ্বালা সখিরে, ঘরে আর রইতে পারি না।  
 আস্ত যদি চেকুণ কাল সখিরে যাইত এ ভাব যন্ত্রণা।  
 বন্ধুর সঙ্গে প্রেমরসে খেলিতাম প্রেমের খেলা আমি বলি এল না কাল।  
 আমি কার গলে ঝুলান সখিরে এমন ফুলের মালা।  
 আরও শীত গেল বসন্ত আলো সখিরে মদন ত তসিলদার ভারী—  
 সে মাসে মাসে ঋতুরাজা এসে করে ডিগ্রীজারি বল প্রেমের  
 উপায় কি করি  
 আমার মনে বলে প্রাণ তেজিব সখিরে গলে দিবরে ছুরি।

( ১৩৫ )

পাগলা কানাই বলে ভাই সকলরে  
 প্রেম কেউ ছা'ড়ো না  
 কৃষ্ণ-প্রেমের পদ বিনে কিছু হবে না  
 এই সংসার থাকতে মর্ম  
 এই সংসার থাকতে ধর্ম  
 প্রেম ছাড়া সাধন ভজন কিছুই হবে না।



( ১৩৬ )

রত্নাকর প্রেমের যোগে সৃষ্টি হলো দস্যু হতে

জ্ঞাত মাত্র ভবে ।

রাম রাম হিতপদে রাম শিবরাম রাম

বললি কি রাম ভবে ।

রাম লক্ষণ শ্রীবিভীষণ লক্ষায় ছিল সবে

প্রেমের ঘরে আঘাত করে

রাবণের বংশ গেল তবে

পিরিত যেমন তুল্য রতন অমূল্য ধন ভবে

ধরায় আর কি এমন হবে ।

পিরিতি স্তম্ভদ বটে সর্বস্বাদে যুতং

প্রেম ভিন্ন মাতৃগণ্য ভিন্ন কোথা জিতং

পিরিতং পিরিতং

ধন্য প্রেম মাতৃ করি ব্রহ্ম স্বরূপ হিতং

যে জন করে অমাতৃ এই সৃষ্টি-হেতু প্রীতং

তার বংশ নিপাতিতং

পাগলা কানাই বলে ভাই

পিরিত বিনে স্তম্ভদ নাই

আছে সে যামিনী যোগে, কর্মভোগে

রত্নাকর প্রেমের যোগে

স্রষ্টা হ'ল দস্যু হতে জ্ঞাত মাত্র ভবে

প্রেম আর কি এমন হবে ।

তুলনীয়—Through love, the earthly body

Soared to the skies.

(Math Navi, Edited by R. A. Nicholson.)

( ১৩৭ )

পিরিত পিরিত পিরিত কেমন জন  
 পিরিত তুই চিনলি না রে মন  
 ওরে নারীর প্রেমে মত্ত হয়ে  
 আবার হারালি অমূল্য ধন  
 ভেবে দেখরে মন  
 প্রেমের চাবি হাতে করে  
 বসে আছে গালেক মহাজন ॥

পিরিতের আলোতে রশ্মিলুলা কর্যা গেছে জগৎ উজালা  
 সে পিরিত জানেন সেই বারেক আল্লা  
 আমি যে মূখমতি সে পিরিতি  
 বুঝতে নারি সীমা তার  
 তাই এ ভবে এসে তাঁর চরণ কর্যাছি সার  
 ভব দরিয়ায় রশ্মল হইবেন কাণ্ডার  
 পাগল কানাই বলছে শোন  
 তত্ত্ব লও আমার এই কথার ॥

তুলনীয়—মন কি ইহাই ভাব—আল্লা পাব নবী না চিনে ?

(হারামনি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৯)

ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধীয় গানগুলো পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেয়া হোল। এ গুলো  
 ছাড়াও অগাণ অনেক গানে ইসলাম সম্বন্ধে কবির মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।  
 বিভিন্ন পর্যায়ে সে সব গান দেয়া হয়েছে।

( ১৩৮ )

পড় রব্বিল আলমিন যত মোমিন মুসলমান  
তোমরা ঠিক রাখো ঈমান।

সংসারের পর সারিয়া চলো

ঘটবে যে দিন তুফান

ভয় রাখো ভয় রাখো বলে ওরে মন

ডাকত্যাছে মালেক ছোবহান—

অপার মহিমা যাহার

সে বড় করণেআলা কুদরতে বাহার ॥

গেল দিন, শুন মুসলমান মোমিন

পড় রাব্বিল আল আমিন

দিন গেলে কি পাবি ওরে দিন ;

দীনের মধ্যে প্রধান হোল মোহাম্মদের দীন

সেই দীনের দীন করলে একিন

সুখে রবি চিরদিন

নাইকো আলা ও মনভোলা

পাবিরে পার হাসরের দিন ॥

তুই পুলসিরাৎ যদি ববি পার

তিরিশ মতি পঞ্চ গাণিক সঙ্গে পুঁজি কর,

কত ফকির বৈষ্ণব আলেম ফাজেল

তারা পুঁজি করছেন বহুতর,

আমি কানাই সুপথে নাই

কি যেন করেন পরওয়ার

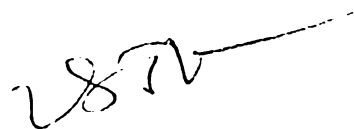
ভোলা মন তাই বুঝে কর কারবার ॥

( ১৩৯ )

পাগল কানাই কয় এসে ভবের বাজারে  
 এই রোজা নামাজ যে জন না করে  
 সরাবী এক লাহনত পাবা হিসাবের কালেতে।  
 নামাজ দায় আস্বে সগন বাঁধবে তোর  
 নিগ হার বা  
 সেদিন কতই কাঁদবি আফছোছের কান্দন  
 ভবে আইসে কি কাম করিলি ওরে আমার মন।  
 হেলায় হেলায় গেল জীবন  
 ও আমি করলাম না সাধন ভজন।  
 কোনদিন হইল ছুনিয়া সৃজন  
 এই দেহের মধ্যে কোন্ জাগাতে আমার  
 আল্লাজীর আসন।

( ১৪০ )

হিংসা নিন্দা দূর কর হে মমিন মুসলমান।  
 হিংসা নিন্দা দূর না করলে কি মতে পাবি আছান।  
 আদম সেজদা না করে আজাজিল হয়েছে শয়তান  
 মন তোর পাকা বাড়ী দালান কোঠা সব পড়ে রবে  
 এ রাজ্যভার ত্যাগ করে একলা যেতে হবে  
 সে দিন মাতাপিতা দরদবন্ধু কেউ না শুধাবে  
 মন তোর যাবার বেলা সাদা ধুতি খেল্কা টুপী সার  
 তাই পাগলা কানাই বলছে মনি আপন আপন কর্মসার  
 চার যুগ ভরে থাক্‌বি অন্ধকার দেখ্‌বি সেই বিষম অন্ধকার।



( ১৪১ )

ও আমার নামাজ পড়ে হল না কোন কাজ  
 কেমনে পড়ব এই নামাজ  
 ও রে তছবী হাতে টুপি মাথে করেছি মুসল্লির কাজ  
 আবার কোন তরিকে পড়ব নামাজ ভাই, না জানি  
 ইসলামী কাজ।  
 আবার আকামত ছালাম সে সময় পড়ি  
 মন আমার যায় পড়শী বাড়ী  
 আরও দয়া করে বল গুরু কি দিয়ে মন ঠিক করি  
 আমার মন হতে চায় দিল্লীর বাদশা  
 ও মন বাধ্য করতে না পারি  
 ও পাগল কানাই বলে সভার মাঝারে  
 এই নামাজ ছিল কোথা কারে  
 এ নামাজ কোথায় ছিল কে আনিল বল দশের হুজুরে  
 আবার সত্য করে বল গুরুধন  
 ও কোন্ নবী কোন্ ওয়াক্ত পড়ে।

( ১৪২ )

ওরে আল্লা বল পন্থে চল সরল দেলে  
 ও লাভ করিবার এই সে ভরে আসল খোওয়াইলে  
 কি জবাব দিবা মহাজনের হিসাবের কালে।  
 ও যে দিন আইজরাইল এসে দোন হস্তে ও করিবে বন্ধন,  
 ও চুমকে উঠে কাঁদবি রে মন ও আফছোছের কান্দন,  
 ও সে দিন বেরাদর দরদবন্ধু ও কি করবে তখন,  
 ও তাই বুঝে আমার মন করলে না সাধন আর ভজন,  
 তাই পাগল কানাই বলছে—ও বৃথা গেলরে জীবন।

( ১৪৩ )

যেদিন মোর বিয়া হোল  
বিসার রাতে প্রাণপতি বাসর ঘরে ম'ল  
কাল ঘুমে ধরলো ঠেসে  
দেখে না দেখলাম তারে ভালবেসে  
মন আমার পাষণ হয়ে র'ল ॥

ছুই কাঠের যন্ত্রখানি  
কোলে বসে বাজাও তুমি  
বল খোদার ধ্বনি  
যাক দিয়া জগৎ আলো  
ঘুচে যায় মনের কালো  
জলেতে আগুন হয় যান পাণি ॥

যেদিন চোর এলো ঘরে  
পাড়ার লোক সব জেগে থেকে  
কাঁপছে থরে থরে  
তবু রাত এক পহরা  
সেও চোর তো না দেয় ধরা  
সিঁধ কাটে আনন্দ নগর পুরে ॥

( ১৪৪ )

শুনে কোরাণের মানে দেখি নয়ানে  
আছে চারটি নাম  
তাতে পয়দা চার কালাম  
ইঞ্জিল তৌরিত আ'লো

কোরাণের চল্লিশ হরফ দশ হরফ নাই  
কোন্ চোরায় করবে চুরি  
তার কোন্ খানে বাড়ি  
ধরতে চাই চোরাক চিনতে না পারি ॥

সেই চোরাক ধরতে পারতাম  
নিতাম অনুপাম  
সেই চোরার জন্ত রে কানাইয়ের বারে দুই নয়ান ॥

( ১৪৫ )

ও একটি মানুষ দেখলাম ত্রিবেণীর ঘাটে,  
ও আমি বলি দেশের নিকটে  
মাটি ছাড়া শূন্যে সে হাঁটে  
ও তার শিরে জটা বড় লেঠা সিঁদুর ফোঁটা ললাটে—  
তিনটি সন্তান আছে তার পেটে—  
সে নিজের দুগ্ধ নিজে পান করে ও দুগ্ধ নাই হস্তনীর বোঁটে  
গো-মাংস সে করত্বেছ আহার  
ও তার জাতি কুলের নাই বিচার  
সর্ব দেবতার পূর্বে পূজা তার  
সে যে অনুরাগী সর্বত্যাগী বক্ষ স্থলে জুনের ধার  
আহা মরি রূপেরই কারবার  
তাই পাগল কানাই বলে ভেবে দেখে  
ও লীলার নাইরে পারাপার ।

( ১৪৬ )

পাগল কানাই বসে এসে ধর্মরাজ সভায়  
অমাবস্তা পূর্ণিমাতে কাম নদীতে জোয়ার বয়  
ও কাল কুস্তীর সব ঘুরিয়া বেড়ায়

নূতন জলে ছান করতে গেলে

ও তারে কাল কুস্তীর ধরে খায়

ও তার ভেদ জেনেছে সাধুজনা ভবের বাজারে

ও সে যে মদন রাজার ধারে ধারে

আছে অনুরাগ ধরে

কি করিবে তার কাল কুস্তীরে

নদীতে লাগল ভাটা, নাই কোন লেঠা

অনায়াসে ডুব সাগরে

তাই পাগল কানাই বলে—

বাছা শোন্ রে কোরবান শোন

আজ ম'লে কাল দুই দিন হবে

না ভজ্জলি গুরুর চরণ

কোন দিন যেন আসবে তোর কাল শমন ।

শমন দমন কর বাছা হে ঠিক যেয়ে কর দুই নয়ন ।

( ১৪৭ )

নতুন মাসেতে হল উদয় নতুন চাঁদ

চাঁদেরও কিরণে হয়েছে আলো ভুবনময়

ও তাইতে বলি দশের লজ্জুরী থাইকো তোমরা হুঁশিয়ারী ।

লেইগা আইল চাঁদের গেরন

ও সেদিন অন্ধকার হবে বসতি

ও গোর হবে নয়ন

সেদিন ছেড়ে যাবে হীরামন তোতা

ও দেহ হবে শ্মশানের সমান ।

ও সেদিন চাঁদের কিরণ হয়ে যাবে অন্ধকার

মাতাপিতা ধরা শুধু কেও না হবে তর

সেই দিন পইড়া রবে পাকাবাড়ী



ঝাড় ফানস ইলেকটারী দেখবিরে ঘোর অন্ধকার  
 সে দিন খ্রীখোলা লাগবে তালা  
 মিলবে না বাজার  
 পাগলা কানাই কয়, থাকতে বাজার  
 ও কোরবান দিন থাকতে সদাই সার  
 যে দিন আদি চল্ল বান্দা দেহের মাঝে উদয় হয়  
 গোল চল্ল, রক্তচল্ল বয়েছে সদায়  
 এই হতে দিন থাকতে মুরশিদ ধরে  
 চাঁদের খবর জানতে হয়,  
 তোমার দিনে দিন ফুরাইয়া যায়  
 এ দিন আর হবে না তথায়।

( ১৪৮ )

ইসমাইল ও কান্দ্যা বলে ওরে বাপজান, বলি তোমারে  
 ও তুমি জলদি করে দেও কোরবানী আল্লাজীর রাহের পরে  
 কেনে তুমি কর দেবী ও বেজার হবে আবে বারী,  
 দেও কোরবানী যাই ছুইয়া ছাড়্যা  
 এই ছুতাদারী সব নৈরাকার, কেবল অকারণ,  
 আজ মরিলে কাল মরিলে মরণ হবে একদিনই,  
 এই মরণে মরণ ভালা, রবে না আর কোন জালা,  
 এই মরণে না রবে শমন।  
 আর জলিল ও জব্বারে নাম তোর, কোরাণে শুনি,  
 ও আমার আল্লাজী দিয়াছে হুকুম, দিতে বলেছে কোরবানী  
 এই হস্তপদ বন্ধন কর, দস্ত ধরে জবাই কর,  
 পাগল কানাই বলে—রহমত করবে আবে রক্ষানী।

( মঃ উঃ সঃ )

( ১৪৯ )

কত জনার কুদশা হইছে--তা আমি বইলে যদি দেশের কাছে  
 —তারা রোজা নামাজ ছাইড়া দিছে  
 তুদের টাকা বড় হইছে রাত হইলে মন কতই বুঝে  
 দিন হলে শরাই' বলে—কাছা ছাইরা দিয়া তান্‌রা মুসলমান হইছে ।  
 আবার যখনই যাই মেজমান বাড়ী আবার অজু করি তাড়াতাড়ি  
 লোকের কাছে চালাকি কইরা নামাজ আদায় করি  
 আবার তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ি হাত ধরিয়া দরুদ পড়ি  
 গোস্ত খাবার যোগাড় করি ।  
 তাই পাগলা কানাই বলে দেশের হুজুরী  
 বিধাতার কাছে খাটবে না আর এসব চাতুরি ।  
 আবার যখন সেই রোমজান শরিফ হয়  
 আবার জুত কইরা কেও তামাক খায়  
 সে সব কথা বলি আমি ধর্মরাজ সভায়  
 আবার জিজ্ঞাসে কবিলার কাছে—হুকাডা তাই কেমন আছে  
 —হুকাডা ছুয়্যারের মাঝে  
 চাপে চুপে খাওয়ান যায়  
 সেই কথা সভায় এসে বললাম সমুদয় ।

( ১৫০ )

গাছ কাটে ও ভাই গাছি—তুই চার কথা তোমায় বলি  
 হুঁস থাইক্যা চাঁচ দিয়ে গাছে ঠিক রাইখো কপালি ;  
 অনুরাগের ছড়ি জ্ঞানের ছুরি—ভাড়া যেন হয় না খালি  
 ও যে দিন লাল চম্কা লাগবে গাছে  
 বস্তু হয় না রস জাল দিলি  
 পাগল কানাই বলে পাবি সে ধন  
 চেতন গুরুর সঙ্গ নিলি

আরও অজ্ঞানী গাছি যারা—গাছ কাটে তারা চারা  
 সে গাছ তখন বাঁচে না  
 ঢেইকা গাছের রস হইলে জ্বাল দিলে ওঠে ফেনা  
 আরও যোগ চিনে গাছ কাটো ভাই—সেই গাছ হবে  
 মিছরি দানা ।

ও ষোল ফোঁটা রস আইলে মায়ের চতুর্দলে কর স্থাপন  
 অনুরাগের অগ্নি দিয়ে করো সে দাহন  
 ও তার এগারো ফোঁটা কইমা যাবে—পঞ্চ ফোঁটে মিঠাই হবে  
 —চার ফোঁটে চিনির গোলা  
 তাই দিন থাকিতে মুরশিদ ধরে  
 —তার সন্ধান জানোরে ভাই মনা ।

( ১৫১ )

অধীন পাগল কানাই কয়, চৈরা পুরা প্রেমের নায়  
 রাত্রদিন বৈসা ভাবি আমি হায়রে হায়  
 ডুব ডুব ডুব সাধের তরী  
 কখন যেন ডুবিয়া গরি  
 কখন যেন হেঁচলা টানে আমার প্রাণও যায় ।

একেতে মোর জীর্ণ তরী পাপের বোঝাই হইছে ভারী  
 কেমনে দিব পাড়ি আমার পারের সম্মল নাই  
 এই ভাঙ্গা নৌকা বাইতে বাইতে আমার দিনও যায় ।

শোন ওরে মন ব্যাপারী—এ ভব নদী দিবি পাড়ি  
 ত্রীশূল যার আছে কাণ্ডারী—তার পারের ভয় নাই  
 অনায়াসে সে পাড়ি দিয়ে পারে চলে যায় ।

( ১৫২ )

ও নামাজ পড়বি যদি ও মন রসনা  
 আগে ঠিক কর পঞ্জগানা  
 ও নবীর তরিক ধরে পড় নামাজ  
 ঠিক হবে ষোল আনা  
 আরও বজ্জ'খ ধরে সেজদা কর ভাই  
 নইলে নামাজ হবে না ।  
 ও ইস্কু ছাদেকে বাজেহে ইমাম বজ্জ'খ ঠিক রাখো নয়ান  
 আহকাম, আরকান তের ফরজ আলেমের ঠায় সন্ধান জান  
 নবীর তরিক ধরে পড়গা নামাজ রাইখা ইসলামী কাজ  
 হলো নামাজ রে এমনি ধারা আলেফের মতন হও খাড়া  
 আরও 'হে' হরফের মধ্যে রুহ, দালের মত সেজদা কর ।  
 তাই পাগল কানাই কয়, জাকাত কোরবানী সার  
 হলো তার নামাজ পড়া ।

( ১৫৩ )

ধর্মকে সাঙ্গী করে আসিলাম রাজ আসরে  
 জিজ্ঞাসা করিলাম তোরে  
 আমার ধূয়ার অর্থকথা বল সবার গোচরে  
 আগি সন্ধ্যাশ্বে যাই প্রকাশ করে  
 নব্বই হাজার পারা ছিল গো নূরনবী খোদার দীদারে ॥  
 পঞ্চাশ হাজার গুপ্ত র'ল বাকী চলিশ কোরাণ হলো  
 নব্বই পারা ছিল কোরাণ হাদিসে পাওয়া গেল  
 ও তার দশ সেপারা কোন্ জায়গায় ছিল  
 পাক পাঞ্চাতন হক নিরঞ্জন মিনকুলে  
 কোরাণ কোন্ বস্তু হোল ॥

মাঝখানে আদম পয়দা করেছে আবে খোদা  
 বেহেস্তু তাহার বসতি ছিল  
 কোন্ বা দোষে দোষী হয়ে আদম বেহেস্তু ছাড়িল  
 বেহেস্তুের দরজার পর কোন্ বস্তু ছিল  
 মূখ্ কানাই জিজ্ঞেস করে বেশ গো বেশ  
 বয়াতী তার মানে বল ॥

( ১৫৪ )

লায়লাহা পড় নেক পথে চল  
 বদ পথে হয়ো না খাড়া আজাব হবে বড়  
 দোয়া গঞ্জল আরশ পড়  
 তিরিশ রোজা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কেন ছাড়  
 অমন পাগলার বেশে ফের  
 তিন শ ছুরার মোজাম নিয়া রে  
 নবীর তরীক কর ॥

ভাইরে ইমান আছে কারে  
 তোমরা দেখ বিচার করে  
 মুন্সী মৌলভী তারা ছোয়াল করে ফেরে  
 তারা বেঈমানি করে  
 বেদাত লোকে ধরে নিয়ে কাফেরানা করে  
 তারা নিজের তফিল ভরে  
 দুইটা পয়সার লালস করলে পরে  
 নছিহত হবে কেমন করে ॥

ভাই রে নামাজে কর নেগা  
 তাতে ভেস্তুে পাবা জাগা

সোনার খাট পালঙ্ক আছে ভেস্টের সামিয়ানা

আছে সোনার বালাগান।

নেকীর কাছে হারাম দোজখ

বদীর কাছে নানা

আছে চার কেতাবে জানা

তাই বুঝে মন ঠিক পথে চলো

কানাই কর, একদিন সব হয়ে যাবে ফানা ॥\*

ভাইরে গোর আজাবের কথা

আমার হৃদয়ে গাঁথা

থেকে থেকে প্রাণ চমকে ওঠে যা করে বিধাতা

আমার মুখে সরে না কথা

হাতে পায়ে কয়ড়া দিয়ে গোরে করবে খাড়া

মারবে জুলুমতের কোড়া

হাড়ে মাংস একত্র করবে

থাকবে না কোন জোড়া

কানাই তাই ভেবে ভেবে হয়েছে নজর ধরা ॥

\* তুলনীয় : এক ফুকে নারিবে যতেক জীব ধারী

পড়িবে সকল বৃক্ষ গিরি ঘরবাড়ী—

( হেয়াতমামুদ, হিতজ্ঞানবাণী )

পরের গানগুলোতে জীবনের অনিত্যতা ও মৃত্যু সম্পর্কে কবি তাঁর চিন্তাধারাকে রূপ দিয়েছেন। অবশিষ্ট পাগলা কানাই জীবনের অনিত্যতা সম্পর্কে এতো বেশী চিন্তাশ্রিত যে, এ গানগুলো ছাড়াও অল্প অনেক গানে তার অভিব্যক্তি ঘটেছে। বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত গানের মধ্যে খুঁজলেই তার প্রমাণ মিলবে।

( ১৫৫ )

পাগল কানাই তাই ভাবে  
 আজ মরিলে কা'ল দুদিন হবে  
 হুকুমেতে আচ্যাও রে ভবে  
 হুকুমে যেতে হবে  
 ভাই বন্ধু ইষ্ট কুটুম কেহ সঙ্গে না যাবে  
 ছল'ভ জন্ম আমার মিছে গেল রে ভবে ॥

দারুণ মায়াজাল গায়াতে ঘটালো জঞ্জাল  
 পুত্র পরিজন মাতা পিতা ভাই বোন  
 ক্ষণিক কেন্দ্রে বলবে  
 জলদি কর মাটির তল  
 আজ হতে মিটলো রে আমার  
 জীবনের কাঁদা হাসার ছল ॥

( ১৫৬ )

পাগল কানাই বলে  
 আমি মিছামিছি আসিলাম এই ভবে  
 আমার আখেরে কি হবে  
 কোন্‌দিন যেন শমন রে এসে  
 দুই হস্তে রশি দিবে ॥

সেদিন ইষ্টকুটুম দরদের ভাই বোন তারা  
 তফাৎ বসে কাঁদে  
 কেউ খাটের বাঁশ বাঁধে, কেউ গোর খোদে  
 আহা ! বে দরদের বাপ মাও  
 শিওরে বসে কাঁদে ॥

সেদিন কাপড় চাদর  
ফেলে রেখে খেলকা দেয় মোর গলে  
সেদিন জোরকোকনি পরায়ে  
এই অবধি নিভিল স্মৃতির অনল,  
মা'র কোলে চাঁদ দিলাম তুলে ॥

( ১৫৭ )

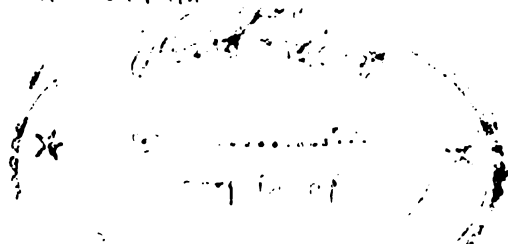
আল্লার এই আলম নিরমিল খোদার কলম  
কলমে যা লিখেছে সাঁই  
কোনদিন যাবে ছনিয়া ছেড়ে  
সেই ভাবনা তোর মনে নাই ॥

মহাজনের পুঁজি লয়ে  
সব গেলাম খোয়াইয়ে  
সে কথা তোর কিছুই মনে নাই  
তোর গলায় দেবে প্রেমের ফাঁসি  
সদায় বসে টানবি তাই ॥

সেদিন থাকবে না তোর পারাপারি  
ছুই হস্তে লাগাবে দড়ি  
দাখিল করবেন হুজুরে  
হাতে দিবে হাত কয়ড়া  
পায় লাগাবে জিন বেড়ি ॥

( ১৫৮ )

দেহ ছেড়ে মহা আত্মা যখনেতে যায়  
সেদিন দেহ কেঁদে কয়  
বল দেখিরে প্রাণ-সখা চলে যাও কোথায়





আমি দিবা রজনী হেরে গুণমণি  
 লালন পালন করেছি তোমায়  
 এখন কি দোষ দিয়া যাবাগো ছেড়ে  
 তাই বল আমায় ॥  
 ও খড় তোর আশায় আশায়  
 বড় প্রেম করেছিলাম,  
 বড় যত্নেতে ছিলাম  
 ধরবে প্রেমের ফল খাব চিরকাল  
 সাধ করেছিলাম ।  
 সে আশা নৈরাশা হোল  
 কাল শমনে নেয় ধরে  
 ও খড় তুমি থাকো মা থাকীর জিম্মায়  
 আমি চলিলাম সরকারে ॥  
 শোন্‌রে বলি তার লীলা বহু রূপেতে  
 কারো দশে পাঁচেতে  
 কারও হয় সর্বনাশ গর্ভেতে বিনাশ  
 কারও পঞ্চাশেতে  
 শও পুরিলে যাবাগো চলে  
 আল্লার ধনি বলি মুখেতে  
 অধম কানাই বলে দেখা হবে ভাই  
 পরকালেতে ॥

( ১৫২ )

মহাআত্মা বলে দেহ ভাই  
 তোর তুল্য বন্ধু কেহ নাই  
 আমি ফকির বেশে পরবাসে ছিলাম রে এক ঠাই  
 যেদিন আসবে হুজুরের চিঠি, বাঁচার তো আর সাধ্য নাই

চেয়ে শমন আ'লে! আনায় বেক্কে নিল  
আর বাঁচার আশা নাই ॥

মন-রে আসবার বেলায় এলে এক সাথে  
এখন যাবার বেলায় চলে আনায় থুয়ে মাথাপথে  
জন্মের মতো দেখাশোনা মিটলরে তোমার সাথে  
আহারে প্রাণ সখা  
ফিরে কি হবে দেখা  
এই ছিল কর্মের লেখা মোর ভাগ্যোত্তে ॥

ঘুত মাখন দমি দানা  
তাও খাওয়ালাম কতই রকম ছুধের ছানা  
মন তোমায় যেতে দেব না  
আট কুঠরী নয় দরজা, দশে দশে বালাখানা  
ঘরে ঘরে কপাট প'ল দরজা বন্ধ হোল  
কানাই বলে সাধের খেলা ভেঙ্গে গেল  
আর হবে না ॥

( ১৬০ )

দিন গেলরে খোদার বান্দা বসে ভাবলে হবে কি  
যেদিন আসবে শমন করবে দমন  
হস্তে দিবে প্রেম ডুরী  
কোথায় রবে দয়ার বাপ মা  
কোথায় রবে ঘরবাড়ী ॥

একম ঘর ভাই বাপের মস্তক ছয়োম ঘর ভাই মা'র উদর  
তিনম ঘরে ছনিয়ায় বসত থাকির তলে চারম ঘর  
শিশুকালে মায়ের কোলে স্তন ধরিয়া ছন্ধ খায়  
বালক কালে ধূলায় পড়ে হাসতে খেলাতে দিন যায়

বয়সকালে করায় বিয়া রঙ্গের খেলা খেলতে হয়  
 শেষকালে মাথায় করে ছুঃখের ডালি বয়  
 বৃদ্ধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রবি সোম আর মঙ্গলবার  
 কানাই বলে এর কোনদিন ভাল জানেন আলা পরোয়ার ॥

( ১৬১ )

আনুকা সুরের ধূয়া বেঁধে

হারে ও গাওয়ার শক্তি নাই  
 চুল' পেকে দাঁত পড়ে গেছে কোন্‌দিন মরে যাই  
 বলি হায়রে হায় কি করি উপায় বসে ভাবছি তাই  
 চৈতের শেষে বৈশাখ মাসে ম'ল সোন্ধের ভাই  
 ভাই, ভাই বলিতে হারে ও ভবে লক্ষ্য নাই ॥

ভাইয়ের কথা হৃদে-গাঁথা হারে ও সদা হয় মনে  
 আমি দিবানিশি জ্বলে মরি বিচ্ছেদ আগুনে  
 ইচ্ছা হয় মনে যাই বনে ভায়ের অন্বেষণে  
 যার মরেছে সোন্ধের ভাই রে সেই কেবল জানে  
 অন্ত্র লোকে হারে ও জানবে কেমনে ॥

পাছে এসে আগে গেলি হারে ও আমার ফেলে  
 দিবানিশি কেঁদে মরে তোর শিশু ছেলে  
 বাঁচে কেমনে তোরে না দেখে কাঁদে বাপ বলে  
 দেখে জীবন যায় জ্বলে  
 ভাই মরিয়া এত ছুঃখ আমার কপালে  
 উঠে আয়, আয় ও মিয়াভাই বলে ॥

যার মরে প্রাণপতি  
 কাঁদে বসে দিবারাতি, যুবতীর মনের আবেশে  
 সমুদ্রে প'ড়ে যেমন ত্রিলোক ভাসে

মরে হুতাশে প্রাণ-পতি নাই দেশে  
আসি বলে গেছে পতি আমাকে আমাকে ছেড়ে  
আরে ও, তোর স্ত্রী ভাসত্যাচে অমনি ভাব ধরে ॥

( ১৬২ )

পাগলা কানাই বলে আমার সুখের দিন বয়ে যায়  
কোন্ দিন যেন আসবে কাল শমন রায় ।  
যখন আসবে কাল শমন রায়  
যখন বসি নিরালে  
ধরে থেকে চিন্তা করে ।  
পরের ভাবনা ভাবতে আমার দিন যায় ।  
যখন ছিলাম গাতৃগর্ভে  
গুরু ভজব বলে ছিল মনের বাসনা ।  
সেও আশা নিরাশ হ'ল,  
কাল যম আশ্রা ধরে নিল ।  
বিধি কি দায় ঠেকাল যন্ত্রণা ;  
ভাই ভেবে ও আমার মন,  
পরের ভাবনা ভাব কি কারণ  
এই পর কি আপন হবে  
সকলই ছাড়ে' যাবে  
অসময় সাথী কেউ হবে না  
তাই বুঝে চলরে মন রসনা ।  
( মঃ উঃ সঃ )

( ১৬৩ )

পাগল কানাই বলে শোনরে ময়না ও সুখের পাখি ।  
কত রত্ন ভেবে যত্ন করতেছি পালন করতেছি  
কোন্ দিন যেন যাওরে ও আগরা দিয়ে ফাঁকি ।

যে দিন ময়না যাবা ছেড়ে  
 সে দিন পড়ে রবে ধড়  
 সে দিন খাট পালঙ্গ পড়ে রবে  
 সুখের বাড়ী ঘর ।

সে দিন ইষ্টি কুটুম দরদ বন্ধু সকল হবে পর  
 কার তালুকে বসত কর ময়না হাকিম চেন নি ।  
 কত বাগ বাগিচা লুটে খাইলি ময়না  
 ও মাল খাজনা দিছাওনি  
 আখেরে কি জবাব দিবা ও সদায় মউতির বেলা ।

( ১৬৪ )

পাগল কানাই কয় পুত্র শোকে হলেম অজ্ঞান,  
 কান্দে মায়ে বাহু তুলে বেটার কাঙ্গালী হয়ে,  
 হায়রে দারুণ বিধি কোন্ দোষে বৈমুখ হলি,  
 দিয়ে ধন কেড়ে নিলি—প্রাণে কত সয়,  
 তোর শোকে কান্ধে কান্ধে গেলো ছই নয়ন  
 সার করলাম ধরাতে শয়ন, রইয়াছে পুড়া জীবন,  
 ও যেমন শক্তিশেলে লক্ষণ মলো  
 সেই দশা আজ আমার হলো  
 ও যেমন রাবণের চিতার মতন—ও সদায় জ্বলতেছে ।  
 ও বিদেশে যদি থাকতো—ও একদিন মনে প'লে  
 বাড়ী আসতো  
 ও আমার ঠাণ্ডা হতো প্রাণ  
 যখন রই সোনার খাটে—তাইতে কি ঐ শোক মেটে  
 ঐ শোকে প্রাণ বাঁচে না বলবো কার কাছে ।

( ১৬৫ )

শোন ভাই বেরাদর, এলে এই ভবের মাঝার  
 তাই বুঝে কর সদাই কারবার  
 ইহার নিকাশ দিতে হবে গোরের মাঝার ॥  
 মোনকের নেকী দুইজনে উঠাইবে যখন  
 মউত গোর নিয়ে হবে খাড়া সামনে  
 পুছবে রে তুই বান্দা কার  
 ছিলি কার দীনে ?  
 নেকি বান্দা যে হবে  
 পুছিলে উত্তরে দিবে  
 খোদার বান্দা ছিলাম আমরা রসুলের উম্মৎ  
 রোজা নামাজ হজ্জ জাকাৎ তাই এনেছি সাথ  
 কানাই কয় কবরেতে করবি যাপন অনন্ত রাত ॥

( ১৬৬ )

পাগল কানাই কয় দিন ত বয়ে যায়  
 সে রথ চলে মাত্র যথা তথা  
 যে ঠেলেবে সে ঠেলে না  
 ঠেলেতে ঠেলেতে দিন গেল ভাই ঠেলা আসে না  
 কানাইর রথ চলে না  
 শোন আমার মন রসনা ॥  
 মরার আগেতে মর, শমনকে দমন কর  
 শমনকে দমন করলে ভবপারে যাবা রে—  
 মন চিন্তা থাকবে না  
 তুমি জেন্দা দেহ মৃত্যু করে মরে কেন দেখ না  
 মরার সময় মলে রে ভাই কিছুই হবে না

মরার ভাব জান না

শোন পাগল মন রসনা ॥

আমি কানাই মরে দেখেছি

দিবস কয়েক বেঁচে আছি

চোখ বজিলে মলক দেখি মেললে পরে আঁধার হয়

পাগল কানাইর নাইকা রে মরণের ভয়

তোরা মরবি কে বা আয় ॥

নিম্নের গানগুলোতে কবির ব্যক্তি জীবনের বর্ণনা ধরা পড়েছে। কবির জীবনী রচনায় এ গানগুলোর মূল্য কম নয়। বিশেষ করে কবির শেষ জীবনের প্রতিচ্ছবি এসব গানে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

( ১৬৭ )

লেখা পড়া শেখবো বলে

পড়তে গেলাম মন্ত্রবে

পাগলা ছ্যাড়ার হবে না কিছু

ঠাট্টা করে কয় সবে

ছ্যাড়া চলে ফেরে তাড়ুম তুড়ুম

নারে সবার গাড়ুম গুড়ুম

বাপ এক গরীব চাষা

ছাওয়াল তার সর্বনাশা

সে আবার পড়তে আসে কেতাব কোরাণ ফেকা

পাগল কানাই কয় ভাই রে পড়া হোল না শেখা ॥

( ১৬৮ )

শোন ভাই আমি দুঃখের কথা কই  
 ছুঁষ্ট রোগে যোগাযোগে যে অবস্থা হই,  
 গরমী জ্বরে ঠাস্যা ধরে  
 করলো আমার দিগ্বিজয় ওরে দিগ্বিজয় ওরে ও দিগ্বিজয়  
 আমি বলি জ্বর হয়্যাছে  
 কতদিন বাদে আরাম বুঝি হই  
 জ্বর বলে তোকে ছাড়বো না রে  
 বা'র করবো পুরানা দই ॥

বিধি মোরে একই কালে কর্যাছে বদডিল  
 হাত পাও বেঁধে বসে থাকি যেমন ঝড়্যা চিল  
 লোকে দেখে ডরিয়ে চলে  
 পেড়ির মত দেখা যায় ডিল ওরে দেখা যায় ডিল  
 ডিল দেখে কেউ ডরাও না শুনে লেও ধুয়ার মিল  
 বদডিল কর্যাছেন আমার আলামিন রাব্বিল ॥

আফসোস যত পেয়েছি ছাড়বো না  
 গাচ্ছো জারি বাবুগিরি এবার খাটবে না  
 কত মিষ্টি অন্ন রহমতুল্লা<sup>১</sup>  
 খেয়েছে কত মাখন ছানা  
 বিলাতী আলু কাঁচকলা খেলে  
 পুরানা রোগ কিছুই থাকবে না  
 শোন ভাই রে আমি খাওয়ার কষ্টে বেঁচে র'লাম  
 প্রাণে মলাম না ॥

<sup>১</sup> রহমতুল্লা—কবির একজন শিষ্য ও পালিদোহার।



( ১৬৯ )

সন ১২৮০ সনে বাঁদেছে বিষম খরা  
 ক্ষেতের শস্য যায় শুকায়া ধান পাটের কর্ম সারা  
 ছাড়লাম রে ভাই কাজকর্ম করা,  
 এবার পাট লেগেছে গরম, এই ইস্তক লেগেছে সরম  
 মরব বলে খাই পচায় বারা ।  
 আবার পরিবারে কেঁদে বলে হায়রে আল্লা কি করি,  
 আমি সারারাত শিয়রে বসে কার মাথায় ঢালি পানি ।  
 ও বাঁচাও আল্লা আমার সোয়ামী  
 আমি বারে বারে করি মানা বেশী পাট আর বুনো না  
 বৃষ্টি নামলে উঠে চুলকানি ।  
 আবার দেখবার আইসে কতজন দিল রে সেই সাহস বল ।  
 আবার কবিরাজের বড়ি খাইয়া মাথায় ঢালে পটুজল  
 খাতিনাতি হবে রে তোর বল ।  
 তাই পাগল কানাই ভেবে বলে উপকার করল জলে  
 ও দাস্ত দিয়ে বা'র করে দাও মল ।

( ১৭০ )

পূব দেশে এসে পাগল কানাই বেড়াইছে ঘুরে  
 ও তার রূপ দেখে সব লোক হাসে ।  
 কেহ কেহ বলে ও ভেতু, তুমি ছিলা কোন্ দেশে,  
 আমি বলব কিরে ভাই সকলরা—বিধি এই রকম গড়েছে,  
 ও তোমরা দোওরা দেও সকলে মিলে  
 থাক থাক প্রাণে বাঁচে  
 পাগল কানাই সাঁকের গোড়া সর্বলোকে কয়  
 মাজামরা শুকনা যারা খাপরার মত মুখ,

ওরে দেখা যায় সেই টংকু ভেংকু—

কেউ বলে এক কর্মেতে লাগে,

হয় লাঙ্গলের মুড়ো

কেউ বলে বুড়ো বুড়ো

কেউ বলে রথের চুড়ো

ও তোমরা পুরুষকে নিন্দা কর

বেশ বেশ জোগায় খুড়ো

তোমরা এত প্যাচাল জান,

গুড়ায় বুড়ায় পেচে কথা কও কেন?

আমি গাই ফালগুন তুমি চৈত বলে টান

হাওড়াহাওড়ী হবি গো শেষে তুমি আমার মুখে শোন

তোমরা এত জান এচাল প্যাচাল—

আরও বিধবা নারী তা জানো

গোলমাল সব ছাড়ান দিয়ে

তাই পাগলা কানাই কয়

চুপ চুপ চুপ কইরে শোন।

( মঃ উঃ সঃ )

( ১৭১ )

বলব কিরে ভাই সকলরা ছঃখে আছি

বড় বেকুব হইয়াছি।

আমার মাথায় ছিল চুলগাছি।

এমনি সাধের বাবরী আমার এবার ফেলে দিয়েছি

ও দিকে ছেমড়ার! কয় ওস্তাদজীকে নেড়ামুড়া দেখা যায়—

ঐ কি আমার প্রাণে সয়, ও আমি বাঁচিনে লজ্জায়।

ও আমার কতই মনে উদয় হয় ও ছেমড়ার! যে বাবরী নাড়ে

ঐ কি আমার প্রাণে সয়।

রসুলউল্লা বাতাইছেন কালামউল্লা কোরাণের মান্ন,  
 আসল রোজা আর নাগাজ ও আপন আশান লাভের কাজ  
 তাই পাগল কানাই কর, বাবরী ফেলে এখন মাথায়  
 দিচ্ছে তাজ ।

( ১৭২ )

জীবনে মিছা চিন্তা করা, সবদেশে সমানে কলেরা,  
 আমি রাত ভরে জ্বলাই বাতি কোন্ সময় যাই মারা ।  
 দারুণ রোগ দিয়াছে খোদায় ভাই,  
 তিন দাস্ত এক বমিতে মারা  
 যদি কেও পাতলা বাহি করে তা দেখে প্রাণ বাঁচে না ডরে ।  
 তোমরা সদাই থাক সচেতন—থাকে না আন্দারে  
 পাগলা কানাই ভেবে বলে ভাই : ও হরদমে  
 ডাকো সেই আল্লারে ।

( ১৭৩ )

জ্যৈষ্ঠ মাসের পাঁচই রে ভাই তারিখ বুধবার  
 আমি পাবনা জেলার গ্রামে গোলাম নতুন হাট উঠাইবার  
 আবার ফিরবার সময় চোরা কাঁটা  
 —চুকল আমার পা'র ভিতর  
 আমার সঙ্গে ছিল চইদর মান্নন  
 আমি প'লাম জমির পর—ও কাঁটা টান দিয়া খসায় আর  
 আবার চার আঙ্গুল চুকেছে কাঁটা ও ভাই সকল  
 —ও আমার প্রাণে বাঁচা ভার ।  
 আবার কত কষ্ট পালেম রে ভাই জানে আল্লাজী  
 আবার যে না জানে ঝাড়া ফোঁকা পায়ের ফোলাটা কুমাইছে  
 আমি সাত রোজ ছিলাম কেঁথার তলে  
 —পায় দিল মোর চিলিকার

আমি ঘরে শুয়ে ডাকি আল্লারে হায়রে আল্লা পরওয়ার  
—ও আমার প্রাণে বাঁচা ভার।

ইষ্টি কুটুম দরদ বন্ধু কেহরে দেখলাম নারে আর  
ছই মুরা ছই মুখ নিয়া ঘাও পাইকা বাইর হইল  
আরও ছেলে মেয়ে পরিবার তারা আম দুধ খাইবার সখ গেল  
আরও জ্যৈষ্ঠ মাসে আম দুধ যেন ভাই সকল আমার  
পাও দিয়া বাহির হইল।

পথে কাঁটা যে জন গাড়ে আদত ডাকাত সে  
আমি নালিশ করি আল্লার কাছে আরও দোয়া মাগি হুজুরে  
ও তার মন্তক দিয়ে ঠাটা পড়ে  
মারগ দিয়ে বার করে

ও তার ডালে পাতে নিপাত হবে  
তবে তাহার ইনসাফ হবে—কাঁটা যে জন গাড়ে  
পাগল কানাই বলে ভাই সকলেরে  
বেসতি বাড়ি পুড়ে যাবে এবারকার হাইতার আগুনে ॥

টীকা :—চইদর মাস্গন=পাবনা জেলার অন্তর্গত চকিদহ (>চহিদহ>চইদহ)  
গ্রামের মাস্গন বয়াতি। ইনি কবির শিষ্য ছিলেন। চকিদহ গ্রামটা হিন্দু  
জমিদার-প্রধান গাঁড়দহ গ্রামেরই একটা অংশ। এখানে হাট পত্তনের সময়  
কবি পাগলা কানাইকে নিয়ে আসা হয়েছিল : ১২৯০ সালে (১৮৮৪ খঃ)  
এ হাটের পত্তন হয়।

( ১৭৪ )

সন ১২৮৪ সাল জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে  
পাবনা হচ্ছে বারোয়ারী শোন ভাই বলি  
কতই লোকে দিচ্ছে বাহার এসে,  
আমি ভাবি ভাই মনে দেখি স্বপনে  
ডাকি আল্লাহ নিরঞ্জে ॥

নামটি আমার পাগলা কানাই শব্দ গেল দূরে  
 কত আওরং মরদ হইছে জড়  
 আর কত ছেলে বুড়ো  
 থাক পড়ে মার গায়ান শোনা  
 পাগল কানাইকে দেখব এক নজরে  
 তারা এই আশায় বেড়ায় ঘুরে ॥

ওমর চন্দ্র রায় কর্যাছে বাহার  
 নাগরদোলা ঘুরায় কলে  
 দশ পাক দিব এক পাই নিব  
 ডাকত্যাছে আয় আয় বলে  
 কত কাটা মুণ্ড মাছের খণ্ড  
 ম'ষ গরু সব যাচ্ছে তাড়াতাড়ি  
 আবার ঐ বেলা ঘণ্টায় দেয় বাড়ি ॥  
 লার্ট সাহেবের হাতী দরজা  
 টানত্যাছে সদলে  
 নীচের তলায় উপর তলায়  
 ঢোল বাঁশী বাজছে তালে তালে  
 পূর্ব দিকে ঢপ যাত্রা  
 কবি গানগাচ্ছি নৃতন রসে  
 আমরা এই কালাচাঁদ কুঞ্জে বসে ॥

( ১৭৫ )

উল্লাপাড়ার ঘাটেতে ব্যাতের পা'র মাঝি হয়ে  
 গিয়াছিলাম শুপারী বেচতে  
 কানাই বেটা তো মাঝি কানা  
 সাগীরা চরে বাজায় ঢোল ।

কি আরে ওরে ভাই সকল  
 গুণ বার্যা কাঁধে লয়ে করে হেইও হেইও বোল ॥  
 পাগল কানাই নিজে কুঁড়ে  
 সামনের দুই দস্ত পড়ে বোকরা<sup>১</sup> হয়েছে  
 বাথরগঞ্জ জেলার মত হাও করে বসে আছে  
 কি আরে ও ভাই সকল  
 বুড়া বাঘের মতো বেটা ভেলকি দেয় কেবল ॥  
 পাগল কানাই সাচে গড়া  
 মানুষ তো ছন্দ ছাড়া লম্বা মন্দ নয়  
 আটচালা ঘরে লাগালে মধ্যের খামটি হয়  
 তেমনি ভাব দেখা যায়  
 যেমন দাড়ি তেমনি বাবরী তেমনি চাদ্দর গায়  
 কি আরে ও ভাই সকল  
 চুল দাড়ি তার বাড়িয়া গেছে  
 নাক মুখ বুঁজে দেখা নাহি যায় ॥

<sup>১</sup> বোকরা—দাঁত পড়ে গেলে তাকে বলা হয়।

( ১৭৬ )

ছিলাম ব্যাতের নৌকাতে  
 নলকার বন্দরেতে  
 মগাই গুপারী বোঝাই তাতে  
 ছিলাম বিধির বাদী হলাম মাঝি  
 তিন চারজন ছিল সাথে  
 সবে বলে হেইও হেইও, ছেড়া এক কাল টুপি  
 ছিল আমার মাথে ॥

বকম বকম কি বল  
 তুমি আসরে বাঁকাও কল (কলহ) ।  
 বারে বারে বোকরা ক্যান বল  
 আমার মতো কত শত বোকরা বুড়ো  
 তোদের বাপ ছিল ॥

( অসম্পূর্ণ )

টীকা—উপরোক্ত ছটো গানে কবি যে বৃদ্ধ বয়সে নৌকার মাঝি হয়ে পাবনা জেলার উল্লাপাড়া ( রেলওয়ে ষ্টেশন আছে ) ও নলকার গুপারী বিক্রয় করতে এসেছিলেন এ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে ।

( ১৭৭ )

ভাদ্র মাসে অবশেষে পাগলা কানাই দল বান্ধেছেন  
 দল বাঁদে চলে যায় সে উত্তর দেশে,  
 ও তার ডানে দোহার ওমেদ আলী—ও সে যে মৃত্যু হয়েছে  
 শনিবারের দিন দুই প্রহর কালে—ও নাও লাগালো বাড়ীর ঘাটে,  
 ও সে খবুরা খবর নিল—তার মায়ের আগে  
 তোমার বেটা ওমেদ আলী—সে যে মৃত্যু হয়েছে—  
 বাপ কান্দে রয়ে বয়ে—ও মায়ে কান্দে আছাড় খেয়ে  
 ঘরের রমণী কান্দে—ও পতি দেখলাম নারে  
 ও আমি কাঞ্চা ব'সে হলেম নারী—আমার এই ছিল কপালে ।

( ১৭৮ )

পাগল কানাই বলছে ভাই  
 সদ'কাল্যা' দিন আমার নাই  
 এখন হয়্যাছি ভাটি  
 যুয়ান কালে বল ছিল মোর অটুটি

ষোল চুঙ্গার বুদ্ধিরে ভাই  
 গেল এক চুঙ্গার মধ্য  
 রাত্রিদিন আমি বসে তাই ভাবি ॥  
 যখন যৌবন ছিল দেহের সাথ  
 কোঁচা মেরেছি তিন চার হাত  
 গিয়াছি চলে দেমাকের সাথ  
 এখন হয়েছি বেজুত সে জুত কাল  
 শেষ কালে কি এই বদ হাল  
 হাল দেখ ভাই পোশাক সব ছেঁড়া  
 কেবল হাট্যা যেতে উপড়্যা পড়া কও কি করা  
 আমি দাঁত পড়ে হয়েছি বুড়া ॥

<sup>১</sup> সদকাল্লা—সাবেক কালের।

( ১৭৯ )

আরে পাগলাকানাইয়ের বয়স গিয়াছে  
 হয়েছে লড়বড়ে<sup>১</sup>  
 আমার দাঁত গুলা সব গেছে পড়ে  
 ধুয়া বাঁধবো কেমন করে  
 কথায় আমার রস বাঁধে না ফস করে কথা যায় সরে  
 সবে বলে পাগল কানাই ফরম<sup>২</sup> খায় ধরে ॥  
 আরে ওরে যুয়ান কি বাহারে সবে কতই রঙ দেখায়  
 এখন সবে বলে সরিয়া ব'সো ছাপ<sup>৩</sup> পড়ে মোর গায়  
 আফসোছে ছাতি ফেটে যায়  
 মাটি নাই গাছের গোড়ায়  
 হাট্যা যেতে উছাট<sup>৪</sup> গেলে উপড়্যা<sup>৫</sup> পড়ে গাছ তলায় ॥



আরে ওরে একলা ঘরে শুয়া থাকি ভিনভিনায় মাছি,  
 বল দেখি ভাই কোন্ ধূয়া গছি<sup>৬</sup>  
 আমি যে ভাবেতে আছি  
 রাত দিন আমার হাত আজুর<sup>৭</sup> নাই  
 চোখের ক্যাতর<sup>৮</sup> মুছি ॥

<sup>১</sup> লড়বড়ে—ঢিলা, <sup>২</sup> ফরম—ফড়িং, <sup>৩</sup> ছ্যাপ—থুথু, <sup>৪</sup> উছাট—হোচট,  
<sup>৫</sup> উপড়্যা—উপুড় হয়ে, <sup>৬</sup> গছি—নেই, গ্রহণ করি, <sup>৭</sup> আজুর—অবসর,  
<sup>৮</sup> ক্যাতর—চোখের ক্রন্দ ।

( ১৮০ )

আমি কইরে কই ও ছোকরারা নাচিস ক্যান,  
 তোরা হাসিস ক্যান মনে মনে,  
 এক গাছ নূপুর দেনা কিনে  
 কত বা উদর হয় মোর মনে ।  
 লোকে যে করিবে ঠাট্টা রে  
 আরে ও বেটা নাচে কি জন্তে,  
 কয়রামালী শেষ কুমারী  
 বাহার দিয়া গাব এতদিনে ॥  
 যখন ছিল ছিরি ঘুরি ফিরি  
 নেচে বেড়াই চাঁদেরই সভায়  
 মাথায় চুল ছিল হাত পাঁচ ছয়  
 দেশ বিদেশের নাচনা আমার বাহার হয় ।  
 গণেশের মত ছিল দস্ত  
 এখন খ্যাস্ত সে সমুদয় খ্যাস্ত  
 ওরে পরণে ছিল ছেঁড়া তেনা  
 তার যত গুণ কেরামত ভারত পুরানে আছে জানা ॥

এখন পড়েছে ভাটি ভর দিয়া লাঠি  
 দস্ত আমার পইরাছে  
 মাথার চুল দাড়ি পাক্যাছে,  
 না জানি কপালে কি আছে  
 যে দিন নিবে কব্বরের নীচে  
 থাকবে পড়ে মুল্লুক জুড়ে  
 পাগল নাম কানাই সব দেশে ॥

( ১৮১ )

আমি পাগলমো করে গাই জারী  
 কিসের আমার ঘরবাড়ী  
 আমি হই দেশান্তরী  
 পাগল কানাইয়ের কথা কিছু  
 শোন বাপু সকলে ।  
 একদরে সোনা বর্তেছে আরেক দর সরল আছে  
 ঘোলা জল বয় রাত্রদিনে ॥  
 সেই মাণিক যায় যার ঘরে  
 অন্ধ পুরুষ না পারে চিনতে তারে  
 কেউ চেনে তা কপালের ফেরে  
 কপালগুণে ভবের পরে  
 সেই মাণিক যায় কভু খোয়া রে ।  
 বিধি যার সখা আছে  
 তার দিন সুখে যাতেছে  
 সেই বিধিক স্মরে পাগল কানাই ধূয়া গা'তেছে ॥

( ১৮২ )

হারে যাবো যমুনারি পার  
 মনের বাসনা ছিল আমার  
 সামনে দেখি ধূলায় অন্ধকার  
 ওরে পার হব পার হব বলে  
     ভাবছি বসে পরওয়ার  
 তুফান দেখ্যা হলাম চমেৎকার  
 লাজলমুড়ার পড়ান ব্যাপারী  
     তার নৌকায় চড়ে হলাম পার ॥

সাতানী চরের নয়ান ব্যাপারী  
 আবার তার কথা প্রকাশ করি  
 ওরে পাঁচশো বিঘা আবাদ করে  
     লাঙ্গল জোড়ে খান কুড়ি  
 ঘোড়া বান্ধা আছে গোটা চারি  
 আওয়ার' উপর বাহার কাছারী  
     আওয়ারালার শোভা হয় ভারি ॥

ওরে হাল্যাগরে হালের সগয় হয়  
 আবার বলদগুলা ছেড়ে দেয়  
 ধলা বলদটা হোঁকা হোঁকা কয়  
 ওরে ধলা বলদের খাড়া শিঙ্গা  
     দেখে প্রাণে লাগে ভয়  
 ভেড়া বকরী গোটা পঞ্চাশেক রয়  
 পঁচল্লিশটা ছুন্নের গাভী  
     পঁচল্লিশ বাছুর দেখা যায় ॥

অধম পাগল করত্যাছে মানা  
 আমি নিবেধ করি শোন না

ঠাশ ছেড়ে বিছাশে যাইও না  
 ঠাশ ছেড়ে বিছাশে গেলে  
 ঘিনাতে<sup>১</sup> কেউ ছুবে না  
 আপ্তবন্ধু কর সাধনা  
 মাছি পোকায় ঢোড়<sup>২</sup> করে খেলে  
 তোমাকে কেউ তো পুছবে না ॥

<sup>১</sup> আওলা—বাড়ীর সম্মুখ ভাগ, গরুর গোয়ালের সম্মুখে কাঁকা জায়গা।  
<sup>২</sup> ঘিনা—ঘৃণা।    <sup>৩</sup> ঢোড়—ছিদ্র।

( ১৮৩ )

নতুন এক স্বর ধরে  
 রঙ্গের ধূয়া গাইতে চাই ভাল করে  
 কথায় আমার রস বাঁধে না ফস করে জবান যায় সরে  
 লোকে বলে পাগলা কানাই ফরম খায় ধরে ॥  
 আমি কাজে কঁুড়ে ভোজনে গুণ শত  
 আমি আশা করে পাত পারি ভাই হাবাতের মত  
 প'ল সব দস্ত, খাওয়ার যে মজা সকলি খ্যাস্ত  
 আমি ডলে মলে দেই গলে  
 ডব্বট করে ফালাই গিলে  
 মুখ নাড়ি যান কাতল মাছের মত  
 খাওয়ার যে মজা সকলি খ্যাস্ত  
 তবে মাসকোলর ডা'ল বড়র খাটা  
 তা হলে তো মজা হয়  
 কোন খানে বাজে না ভাই সরসরাতি যায় ॥  
 অসম্পূর্ণ

( ১৮৪ )

আমি যা জানি তাই বলে করে যাই  
 আমার আগাপাছা সব শুকনা সারা  
 জুগ্নে জ্বরে করলো সারা করে গেছে সাঁই  
 মিছা ক্যান ঘুরে বেড়াই  
 নেলদাড়াখান ভাঙলো পরাণ  
 আমি যান ঠিক সেই বাজারামের ভাই ॥

আমি কামে কুঁড়ে ভোজনে গুণ শত  
 আমি ঠালা মারি কত  
 মেজে জুড়ে পাক পারি যান দাদারি মত  
 প'ল এ দস্ত, খাওয়ার আমার যে স্রবিধা সকলি খ্যাস্ত ।  
 আমি যদি খেতে লই ড'লে ম'লে  
 টবেস করে ফেলাই গিলে  
 মুখ লাড়ি যান কাতল মাছের মত  
 সবে বলে পাগলা কানাই ধুয়া বাঁধে ক্যান এত ॥

আমি কামকাজ সব সারতে পারি  
 চলে যায় যেমন রাম মিস্ত্রি  
 বাইস থুয়্য কোদাল ঘারে করি  
 বেরস কেটে ফালাই পিঠে  
 ঢেঁকির আগা থুয়্য পিছায় বিধ করি ॥

( ১৮৫ )

আর কি কানাইয়ের সেদিন আছে  
 তিরিঙ্গে জ্বরে কানাইয়ের ধলবুদ্ধি গেছে  
 আবার ছদিন একদিন আসে, বাঘ মোর খাইতেছে  
 শুকায়্যা পোড়া খড়ি সার,

কেবল কটা দাড়ী নাড়ি চাড়ি প্রাণ ত বাঁচে না  
 আবার ১১ই ভাদ্র মাসে, পালা করল এসে জ্বরে  
 সাত খান খেতা গায়ে দিয়েছিলাম গোরাল ছুয়ারে ;  
 ও যেমনি চাপান কুলুর ভারা তেমনি চাপায় আমারে  
 আমি বলি দেরে ছেড়ে, আর কতকাল থাকব পড়ে  
 জ্বরে বলে পাগলা কানাই বস্তু দেখাই তোরে ।  
 আবার ভাই আশ্বিন কার্তিক এল শীতের আমল  
 লোকে বলে পাগলা কানাই এই বেলায় মলো ।  
 ওরে হাতে পায়ে দেখি রস নেমেছে  
 বলি ভাই দশের কাছে নলি শুকায়ে গেছে  
 মাথাডা ফুলে হ'ল ধান সিদ্ধ তোলে ।

( ১৮৬ )

ডাঙ্গায় থেকে জলে আছে পা, হাত ধ'রে আয় নিয়ে যা  
 আর চাইনে, ভেলকি খেলতে বাড়ি যাই হাসতে হাসতে ।  
 শুকনো গাছে ঝুলছে ফল দূরে গেছে গায়ের বল ।  
 আয়রে মৌ হাওয়ায় ছলে উড়িয়ে দিয়ে যা  
 কানা মাছি আছে ব'সে হাত ধরে নিয়ে যা ।  
 পাগল কানাই বলে ভেলকি খেলতে আর তো পারিনা ॥

( ১৮৭ )

পাগল কানাই বলে আমার কাঁথার সমান বন্ধু নাই ;  
 জ্বর আসবার শব্দেই ভাই কাঁথা আমার গলায় বাঁধা  
 কাঁথারে যত্ন ক'রে রেখেছি ভাই  
 একদিন সরাইলের হাটখোলার পরে  
 আমার পালা করলো জ্বরে

হাত পাও শুকিয়ে গেল জ্বরেতে দোষ পাইল  
 গলা দুটো ফুলো ফুলো  
 মাথাটা ফুলিয়া হলো ধান-সিন্ধের তলো ;

\* \* \*

পাগল কানাই সাজে গড়া নাম শুনেছি খুব  
 মাজা মরা শুকনা সারা তল্যার মত মুখ ;

( ১৮৮ )

শোন ভাই, একটা নতুন ধূয়া গাই  
 চেংড়া প্যাংড়া গাচ্ছে ধূয়া আমার তো সখ নাই  
 ওরে, চুলদাড়ি সব পাকিয়া গেছে দস্তগুলা নাই  
 লোকে ছাড়ে নারে ভাই  
 ওরে, দায় ঠেকিয়া বাঁধলাম ধূয়া  
 বেদ পুরাণে যাহা দেখতে পাই ॥  
 সাত আসমান, তার জমিন সাতখান  
 আকাশের তারা পাতালের বালু এ সারে জাহান  
 ওরে, চৌদ্দ ভুবন পয়দা করছেন মালেক ছোবহান  
 আরেকটা দিয়ে যাই চাপান  
 ওরে কোন্ বস্তু দেখে নাই আল্লা  
 সে কথার কর্যা দাও বিধান ॥  
 গায়েন শুনে, লোকে ভাবে মনে মনে  
 মিথ্যা কথা বলছে কানাই ঠেকাবার জন্তে  
 আমি শাস্ত্র ছাড়া ধূয়া বাঁধি নাই কভুদিনে  
 বলি সভার বিদ্যমানে  
 যদি না পারো তো শুনে নিও  
 পাগলা কানাই করে দিবে মানে ॥

( ১৮৯ )

সন ১২৭৮ সালে ৫ই আশ্বিন উঠল উদগতি  
 দালান কোঠা ইমারত ভেঙ্গে হোল মাটি  
 কত নৌকা জাহাজ গেছে মারা যুবতীর পতি  
 ও গেল গছালের গদি ॥

সুন্দর বনে বাদার কাষ্ঠ গুয়া নারিকেল নাই  
 ঘরদরজা রেলের গাড়ী র'ল ঠাই ঠাই  
 কারও ম'ল প্রাণের ব্যাটা কারও ম'ল ভাই  
 এমন তুফান দেখি নাই  
 শুক্রবারের দিন চলে যায় শনিবার আসে  
 সেই দিনের দিন পাগল কানাই জলেতে ভাসে  
 আসতে কালে গুরুর মানা না শুনলাম কানে  
 এসে পলাম তুফানে ॥

( ১৯০ )

পাগলা কানাই ডুবিয়া ম'ল  
 কোন্ শত্রু খবর দিল  
 ঘরের পরিবার কানত্যাছে আপনারই পায়  
 সিঁথার সিন্দুর ত্যাজ্য করে কাঁদছে যেমন বিধবায়  
 কোন্ দোষে রে আমার পতিক  
 ভোজন করছে গঙ্গা মা  
 ফিরে আর তো এলো না  
 কেউ কাঁদে ভাই হারা কোথায় রে জোড়ের পায়রা  
 সদাই কাঁদছে ভাই বলে  
 কেউ দিচ্ছে অভিশাপ  
 কুঁড়ে কানাইয়ের মাথা খেয়ে  
 ঐ কানাই ক্যান ম'লো না



কাঁকি দিয়ে রে ও আমার ছেলে নিল  
 আর তাক ফিরে পা'লাম না  
 আমার মা বোল বলে ডাকলো না ।

পালদোহার লাকেশ্বর

কাঞ্চাসনী মা তাহার  
 কোন্ গাঙে ডুবলো রে অপমৃত্যু হোল  
 না হোল কোন রে গতি  
 মরলো সে আঠার বছর ॥

টীকা—উপরোক্ত ছোটো গানে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর যে ঝড় হয় তার কথাই কবি বলেছেন । এ ঝড়ে খুলনা, ২৪ পরগণা, কোলকাতা যশোহর, পাবনা প্রভৃতি জেলা সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । “On the 20th September, 1872, a severe cyclone swept over few districts and lasted from 11 A. M. till night. In this space of time, it caused widespread destruction.”—Bengal District Gazetteers, Pabna. Page—46. কবি সম্ভবতঃ কাঞ্চাসনীর পুত্র লাকেশ্বরকে পালদোহার করে নিয়ে গিয়েছিলেন কোথাও গান করতে । সে নদীতে মারা যায় । অবশিষ্ট কবির মৃত্যু-খবর রটলেও তিনি উদ্ধার পান ।

( ১৯১ )

গেছিলাম উত্তর ঘাশে, ঘার ধর্যা ঘুমে ঠাসে  
 চোখ আমার ছাড়িয়া ছাড়ে না  
 ওরে ভাই সকলরে, আমার হয়্যাছে ভাবনা  
 লোকে বলে পাগলা কানাই  
 এবার বুঝি বাঁচে না  
 এ বড় আজব কারখানা  
 যেমন মুখ ফুলেছে, পেটে না যায় দানা ।

চোখ মিটমিটায় ভোমা নাড়ে  
 ঐ তো কানাই জারী গায়  
 বাগানের তরু যেমন উঠিয়া দাঁড়ায়  
 লোকে বলে আজগুবি বল রাখে কানাই  
 যেমন মদে মাতাল ঘুরিয়া বেড়ায় ॥

( ১৯২ )

পাগল কানাই বলে ভাইরে ছকের সমাচার,  
 জারী গাইবার গিয়াছিলাম আমরা, উত্তর দেশে চড়ে নৌকার পার,  
 কত ঝড় ঝুপ্ট অন্ধিকারী, তুলে দিল রে আল্লা আজগুবি তুফান  
 একেতে সন্ধ্যাবেলা, ও বেলীর আড়াই পওয়ার  
 কত বটবৃক্ষ তরুলতা আল্লা ভাঙ্গে নিল রে গাছের ডাল,  
 কত ঘর দরজা উড়াইয়া নিল,  
 এই বোঝাই নৌকারে আল্লা, হইল রসাতল ।  
 আবার পাল দুহারী কেন্দে বলে ও আল্লা রশূল  
 ও আর বুঝি গেলাম না গো রে ছেলে  
 না দেখলাম আল্লা মা-বাপের মুখ ॥

( ১৯৩ )

পাগল কানাই বলে গিয়াছিলাম ভাটীনা জিলা পাটুখালিতে  
 ও নিবারণ যে স্বপ্ন দেখলো সেই সাপ ধরিতে  
 ধলা একটি পাঁঠা লাগবেরে ওরে ভাইরে সেই সাপ ধরিতে ।  
 যখন কয়রে সাপের কথা যাঁতায় থাক্যা উঠায় মাথা বলে হায়রে হায়  
 এক মুষ্টি ধূলা প'ড়ে দিল সেই সাপের মাথায়  
 ধূলা পড়া লয় না সাপেরে ওরে ভাইরে প্যাঁচ দিল গলায় ॥

গলাতে পঁচাচ দিয়া সাপরে হাড়ে মাংসে একঠাই করে চলে বাও ভরে  
 ষোলটা বাঁশের সঙ্গে আইটা মোড়ন দেয় কষে  
 ঝলকে ঝলকে পড়ে রক্ত ওরে ভাইরে সেই বাঁশের গোরে ॥

পাটুখালির তমিজ উদ্দিন ও তার ভাই ছিল মফিজউদ্দিন  
 —সেই বাঁশ কাটতে যায়  
 এক ফোঁটা রক্ত আস্তা পড়লো মফিজ উদ্দিন গায়  
 উড়া লাফে দিল খবর রে ওরে ভাইরে নিবারণের লায় ॥

কোন বেটা সাপুড়্যাক যেন সাপ ধরে খায়  
 আমতলির বন্দরে যাইয়া ধূয়া বাক্য গায়  
 পঁয়তাল্লিশ হাত লম্বা সাপরে ওরে ভাইরে  
 নামে বঙ্করায় ।

( ১৯৪ )

ও পাগল কানাই বলে—আমার এই শেষ কালে,  
 স্তূথ দ্বুথ লেইখাছে বিধি আমার এই কপালে  
 আমার দিন গেছে শেষ কাল বাকি আছে  
 মন মনোরায সদায় বাইরাম বাইরাম করতেছে ।  
 ও ছিল শিশু যৌবন ও স্তূথের নাই নিরাপণ  
 বৃদ্ধ বয়সের কালে দেখ আমার দুষ্কের তুফান ।  
 আমার সে দিনও নাই শোন মোমিন ভাই  
 খালি খাঁচা পইড়া র'বে বান্দার থাকির পর ।  
 যখন ছিল যৌবনের বাহার

সকলই কইয়াছি আমার আমার  
 ভেবে দেখো মন কেও তো নয় আমার  
 এ দেহের জাগায় জাগায় পড়ে রবে শুধু বালির চর

ও পাখী যাবে উড়ে এ ভব-সাগর ছেড়ে  
ওরে মন মনরায়

সদায় বাইরাম বাইরাম করতোছে ।

( ১৯৫ )

পাগল কানাই বলে ভাইরে ভাই  
ছোট কাইলা দিন আমার নাই  
—এখন পইড়াছে ভাটি ।

রথের চাকা চূড়ো মুড়ো হইলে বাহির হইল রথের ঝাটি  
—খালি হস্তে এখন কি দিয়ে আঁটি  
ও ছুতোর দিছিলো এক রথ গইড়া  
মূর্থ হইলাম আমি চইড়া  
—কোন মজা পাইলাম না ।

ভেন্না কাঠের তক্তা ছিল—মুণ্ডর কেন দিল না  
আমি নড়তাম চড়তাম থাকতাম বইসে  
লাগাইতাম জোড়ায় দুইচার ঘা  
তবু সেই রথ খসতে দিতাম না ।

সেই ছুতার সকল তারই হাত  
পাগল কানাই টাইনা বেড়ায় শুধু খাইটা রথ  
উহার রণী থাকে উপর খোপে পাগল কানাই তার দোপে  
এখন বইসা তাই ভাবে  
ঘোল চুঙ্গী বুদ্ধি কানাইর—গেল এক চুঙ্গীর মধ্যে  
পাগল কানাই বসে ভাবে দেখে ভাই দিনে আর রাতে ।  
( মঃ উঃ সঃ )

( ১৯৬ )

চুপ চুপ চুপ করে থাক ভাই সকলে  
 গাইতে এলাম ধুয়া জারি  
 হাতে নিয়া জোর খুঞ্জুরী,  
 একখানা রঙের ধুয়া গাই  
 ও রঙ বলত্যাছে পাগল কানাই  
 আর রঙ দিত্যাছে ইছ ভাই<sup>১</sup>  
 নতুন রঙ ছাবের বিশ্বাস<sup>২</sup> কয় মন্দ নয়  
 কা'ল্যা গ্রামের জহিরদ্দি<sup>৩</sup> সেও তো রঙের বাহার দেয় ॥  
 পাগল করলো সাধের খুঞ্জুরী  
 থাপর দিলে খসলো তাল  
 ঘটলো ভাই বিষম জ্বালা  
 আমি উপায় কি করি  
 ছোকড়াগরে সঙ্গে করে ব্যাতের আরা লই ঘিরি  
 লাঠি দিয়া দেই ঠেলা  
 বার করি এক গুইশালা  
 ল্যাজ ধরে টেনে শালাক বার করি  
 পিঠেরই চামড়া খুলে তাই দিয়ে বানাই খুঞ্জুরী ॥  
 সঙ্কুই সব যুক্তি করে আর যাবো না দৌলংপুরে  
 আমরা যাবো ছাশ ছেড়ে  
 দৌলংপুরে গেলে পরে ব্যাতের আরা লয় ঘিরে  
 ছোকড়ারা সব জুটে এসে, পাটের ফাঁসি গলে ফাসে  
 বা'ম মাছের মত ছুলে বার করে  
 একি জ্বালা প্রাণ বাঁচে না  
 যাবো না আর দৌলংপুরে ॥

টীকা—<sup>১</sup>ইছ বিশ্বাস—যশোহরের ঘোড়ামারায় জন্ম । পাগল কানাইয়ের সমসাময়িক,  
 জারীগান রচয়িতা হিসেবে বিখ্যাত । মাঝে মাঝে কানাইয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

করতেন। তিনি লেখাপড়া জানতেন। তাঁর গান বিশেষ পাওয়া যাচ্ছে না। 'ছাবের বিশ্বাস—এঁর পরিচয় জানা যায়নি। তবে দু'একটা গান পাবনা জেলায় পাওয়া যায়। 'জহিরদ্দিন—পাবনা জেলার কালিয়া গ্রামে কবির বাসস্থান ছিল। যদিও ১০৯ নং গানের টীকায় বলা হয়েছে যে কবির পরিচয় অজ্ঞাত কিন্তু তা ঠিক নয়। কথাটা ভুলক্রমে ছাপা হয়েছে।

( ১৯৭ )

নামটি আমার পাগল কানাই জাতে মুসলমান  
হিন্দুলোকের বাড়ী আগরা করিতাম গাহান  
ব্রাহ্মণ পেলে আমরা করি কোটি কোটি প্রণাম  
সে নাম নারায়ণের সমান ॥

কি হিন্দু কি মুসলমান এই ভবের পরে  
বিষ্ণুহরি দশের জন্ম মুসলমানের ঘরে  
এ কথা লেখে শাস্ত্রে  
সেই শাস্ত্র আছে জমা পণ্ডিতের ঘরে  
এ কথার নিন্দা যে করে  
ভবে শাস্তি হয় গো তার তরে ॥

মোহনপুরের<sup>১</sup> কেশব লাহিড়ীর কি দশা হইল  
বিষ্ণু কইতে বিছিন্না তার মুখেতে এলো  
ও সে যে কুল মজালো  
ব্রাহ্মণ হয়ে মুসলমানের নিন্দা যে করিল  
ও বেটার জন্মের দোষ ছিল ॥

টীকা—<sup>১</sup> মোহনপুর—পাবনা জেলায় অবস্থিত। লাহিড়ীদের নামানুসারে লাহিড়ী মোহনপুর নামে পরিচিত হয়। একটা রেলওয়ে স্টেশন আছে।

( ১৯৮ )

আমি বাঁচি না আর জ্বরে  
তোমরা কেন লেখন লেখে পাঠাও বারে বারে  
আমার বেহারা জ্বরে রাতদিন মাথা ধরে  
আমি বাঁচি না মিয়া কই তোমারে ॥

আমি ছিলাম যে কাহিলে  
সেই কথাটি পাগল কানাই কয় দশের হুজুরে  
উজ্জল বলে ও মিয়াভাই ম'লি  
একবার কথা কও কথা কও কেন বেহুশ হইলি ॥

বিষাণচন্দ্র কবিরাজ গয়াসপুর তার বাড়ী  
আমায় খাওয়ালো বিষ বড়ি  
ধিক ধিক করে তিনদিন পরে উঠলো কানাইয়ের নাড়ি  
আমি হাত ধরে কই কিঞ্চিত আছে দেবী  
আন ডালিম আন, আন কুশল আন  
কানাইক ধরে রসান করি ॥

( ১৯৯ )

বৃহস্পতিবার বৈকাল বেলা বসে রলেম আগগাছ তলা  
কাজলী আতরের বাড়ী  
ভাই সকলরে ধূয়া গাই তাড়াতাড়ি  
ঠাকুর যেদিন বাজাইল তুফান যে হোল ভারী  
শিলের ঠেলা সে বড় শক্ত ঠেলা  
কুমীর গঙ্গায় মুখ খুশে মরি  
কানাইর ভিজে গেল কটা দাড়ি ॥  
ছোকরারা কয় ও ওস্তাদজী তোমার গায়ে দেখি কি  
জারেতে ধরেছে মারি

তখন পাগলা ইহু উঠে বলে আগুন পাব কার বাড়ী ?  
 আর যাবো কোনে কথা উঠলো মনে  
 মেঘবড় লাগায় পশ্চিমে  
 তখন কানাইক লিয়া টানাটানি ॥

চন্দ্রারয়ের চালায় এসে বসে র'লেম স্তব্ধ ধরে  
 সে চালায় ভাঙ্গা ঘর পাতা  
 ভাই সকলরে আমি কই ছুঃখের কথা  
 ঘরের বান্ধুন ছিঁড়ে রুয়া পড়ে আটুতে পেলাম ব্যথা  
 পাও হোল খোঁড়া  
 ধুয়ায় দিলাম জোড়া  
 গায় ছিল ছোঁড়া এক কাঁথা  
 তখন লায়লাহা কলেমা পড়ে ঝাড়ি মাথা ॥

( ২০০ )

সবে বলে পাগলা কানাই আনকা ধুয়া বেলো  
 নতুন ধুয়া শুনবো বলে বাসনা হোল  
 ভাবনাতে গান মিল জোটে না কেমনে ধুয়া বলবো বেলো  
 এবারকার ছরস্তু বর্ষার ধান পাট সব তল্যায়া গেল  
 ভেবে আর কূল পাই না সাকুল্যে  
 মনের সখ মাটি হোল ॥

রাজার খাজনা মহাজনের দেনা কি দিয়ে আদায় করি  
 ভাবছি বসে অবিরত মনে সেই চিন্তা ভারি  
 লোকের উৎপাত আমি সহ্য করতে না পারি  
 সবে বলে পাগল কানাই গাও দেখি কিঞ্চিং জারী  
 শুনবো বলে আমরা দশজনে  
 মনে সেই আশা করি ॥



( ২০১ )

আরেকটি কথা রে ভাই বলে যাচ্ছি খাঁটি  
 কোমরের দরদে ভাই বেঁকা হয়ে হাঁটি  
 কত ঔষধপাতি হৃদ গেছে খাল্যাম কত ডাক্তার বেঁটে  
 তাইতে ব্যারাম না হয় আরাম  
 ক্রমে সে ধরে এঁটে  
 অনুমানে বুঝতে পারলাম ভাই  
 রথে পড়েছে ভাটি ॥

পুরান রথে আর থাকিবে না  
 সেইটা মনের বাসনা  
 দেশের কাছে চানসভাতে করে যাই বর্ণনা  
 কামিলকর নাগাল পেলে রথে দিতাম নতুন টানা  
 খিলকাঠি বদলায়ে ফেলে নতুন করতাম রথখানা  
 চলতো জোরে হাওয়া ভরে ভাই  
 থাকতো না কোন যন্ত্রণা ॥

( ২০২ )

সবে বলে পাগলা কানাই আনকা ধূয়া বল  
 ওরে আমার ডাকু জ্বর হইছিল  
 ছয়মাস ছিলাম শয্যায় শুয়ে কাহিল হয়ে  
 আমার নাড়ি জ্বলে গেছে ঔষধ খেয়ে ॥  
 ইষ্টি কুটুম ভাই বেরাদর ছিল ঘাশে ঘাশে  
 খবর শুনে নৌকা বয়ে আসতেছে সবে  
 যারা আছে তারা কঁানছে রে বসে ॥  
 চারজনতে পরামর্শে ঘরের বাহির করিল  
 কেউ মানুষ ডাকতে গিয়াছিল  
 তখন বর্ষাকাল ছিল

কেউ বলে গোর কাফন করে মাটি দেও ঘরে  
 তিন কবিরাজ পরাগর্শে তখন বিষবড়ি খাওয়াল  
 আমার মালেক আল্লা মেহেরবান ছিল  
 কিঞ্চিৎ আরাম হোল  
 বিত্তি বেসাত সমস্ত কবিরাজ নিল ॥

( ২০৩ )

পাগল পাগল বলে সবে শোন বলি পাগলের কথা  
 পাগল বিনে এ ভবেতে ভাল আছে কেবা  
 এক পাগল শিব সন্ন্যাসী ত্যাজ্য করে কৈলাস কাশী  
 ভাঙ্গ ধূতরা সিদ্ধের গোটা খায় এক পাগল নারদ নিশি  
 নিশায় বাজায় ল্যাঠা  
 হরিলুটে পোলাপান পাগল সন্ধ্যাতে তুলসী তলা যায় একা ॥  
 দোমপত্র লইয়া পাগল গর্ভে পাগল গর্ভাকার  
 প্রসব বেদনায় মাতা পাগল প্রসব করিবার  
 দাই পাগল নাড়ি কাটিতে জ্যোতিষ পাগল নাম রাখিতে  
 শিশু পাগল দুধ খাইবার  
 মাতা পিতা পাগল হোল মন্তবেতে পড়াইবার  
 পড়ার জন্ত পণ্ডিত হয় পাগল  
 ছেলে পাগল হয় পরীক্ষায় পাশ করিবার ॥

পাশ করিয়া পাগল হইয়া খোঁজে নানান চাকরী  
 কেহ হাকিম জজ-মেজিষ্ট্রেট কেহ মহরী  
 হাকিম পাগল লুকুম দিতে  
 উকিল পাগল ছোয়াল জোটাইতে  
 চোর পাগল করতে চুরি  
 জ্বরের জন্ত ডাক্তার পাগল জীবের ঔষধ দান করিতে

রাধার জন্ম কৃষ্ণ হয় পাগল

রাই পাগল গুনতে কালার বাঁশরী ॥

সাধু পাগল সত্য বলতে মাতাল পাগল মদেতে

চাতক পাগল মেঘের আশে ভোমর ফুলেতে

চোর গুণ্ডা বদমাইশ যারা পর নারীতে পাগল তারা

মোলা পাগল দাওয়াতে

কত যোগী মুনি ধ্যানে পাগল

বসে আছে ধ্যানেতে

কেহ ভেবে গুণে রূপের হয় পাগল

কেউ পাগল মরার আগে মরিতে ॥

তাই পাগল কানাই টাকার পাগল

গান গাহিয়া টাকা চায়

ভজন সাধন কিছু জানি না করি কিরে হয়

অকূল নদীতে তুফান ভারী

হাল ছেড় না ভাই কাণ্ডারী

রাগ থামাতে চটে যায়

জীর্ণ তরী উবুড়ু কখন যেন জল চোয়ায়

তরী কখন যেন পাকে পড়ে রে

সদায় দয়াল থাকো আমার লায় ॥

টীকা—পাগল কানাইর ভণিতা থাকলেও গানটার আধুনিক রূপ দেখে সন্দেহ হয়, বোধ করি গানটা তাঁর রচিত নয়। যদি তাঁর রচিত হয়েও থাকে তবু অনেক আধুনিক শব্দ যে এতে প্রবেশ করেছে তাতে সন্দেহ নেই।

( ২০৪ )

পাবনা জেলায় সাপটের সন এই দ্যাশে আইলাম  
 আইসে জনম ভরে ঘুরে ফিরে বাড়ী গেলাম  
 বড় বেয়াকেল হলাম  
 কেউ বলে পাগল কানাই কেউ বলে নাই সে নাই  
 লোকের বিশ্বাস হলনা ॥

তোনাকে বলি ওহে লালচাঁদ তুমি যাইও না  
 তুমি যাইবা উত্তর দ্যাশে আনি যাইব না  
 কেউ বলে পাগল কানাই লোকের ভাবটি বোঝে না  
 লোকের বিশ্বাস হোল না ॥

১ লালচাঁদ—৫৬নং গানে ভুলক্রমে শিষ্টা ছাপা হয়েছে, লালচাঁদ- হিন্দুর চিত্র :

॥ রামায়ণ কাহিনী ॥

( ২০৫ )

দেশের চরণ কইরা স্মরণ পাগলা কানাই কর  
 ওস্তাদ আমার ফকির নয়ান সভায় দিলাম পরিচয়  
 সালাম জানাই দশজনার পায়  
 দয়া করে দিবেন পদাশ্রয়  
 রাম রাবণের পালা করলাম শুরু রাবণ রহিলে কোথায়  
 হেমচন্দ্র ডাকাছে তোমায়  
 সীতাক নিল চুরি করে  
 গেল সে লঙ্কাপুরে  
 হনুমান সীতাক খুঁজতে যায় ।

কদুর কদুর যায় হনুমান খোকসার গোটা খাড়  
 আর কতদূর যায় হনু মধুফুলের বাগান গাড়

বাগানীগরে ডাক দিয়া কর  
 এতলোক কি কর হেথায়  
 একলা দেব বাগান পাহারা তোরা সব বাড়ী চল্যা যা  
 বাড়ীত যার্যা দেখা শোনা কর  
 দিন চারেক পাঁচ বাদে আসিস একবার  
 বাগানী সব চইল্যা গেল  
 হনু তখন কি করিল  
 বাগানের ফল খাইলরে সমুদয় ॥

বাগানের ফল খাইয়া হনু স্থখে নিদ্রা যায়  
 বাগানীরা আস্যা উহার লাদুলেতে পাট জড়ায়  
 পাট জড়ায়্যা আগুন দিল মারিবার আশায়  
 হনু তখন লক্ষ্যে লক্ষ্যে যায়  
 একা হনু সারা লক্ষা পোড়ায়  
 উহার পাছায় যখন তাও লাগিল সীতার কাছে বুদ্ধি নিল  
 আগুন নিভাতে মুখপোড়া অর যায় ॥

( ২০৬ )

রাম লক্ষণ সীতা যখন হইল বনবাস,  
 সে ছাইড়া দেশ, নিজবাস, বনে বনে সীতা করছে গৃহবাস ।  
 বনফল আরো গঙ্গার জল, ছুঃখে ছুঃখে সীতার গেলো চিরকাল ।  
 সীতারে কুণ্ডলী দিয়ে রাম গেছে শিকারে  
 আবার কোথায় থনে এলো যোগী লক্ষারই রাবণ  
 সে কি যোগী যেমন তেমন, ভিক্ষা ভিক্ষা বলে করতেছে রোদন ।  
 ঘরে কে আছে ওরে ভিক্ষা দাও,  
 সীতা বলে ধরো ভিক্ষা লয়ে যাও ।  
 তাই পাগলা কানাই কয় : তাও নিব না ও কুণ্ডলীর  
 বাহির আইসা দাও

ও কত সন্ধানে আরও ধিয়ানে, কত লোকের অপমান  
সে করিতেছে,  
ও সীতা পেয়ে রাবণ রাজা রামের ঘর চুরি করিতেছে।

॥ বধু ॥

( ২০৭ )

আমি কপাল গুণে হয়্যাছি মা'য়া  
পরের ঘরে দিয়েছ বিয়া  
বাপ ভাইয়ের ভাত নাইরে বরাতে।  
আমি বর্না আলি আশায় করি  
নায়র যাব বাপের বাড়ী  
আমি পইরা আসব ঢাকাই সাড়ী  
ছুই হাতে রেশমের চুড়ি এইত মনের বাসনা।  
খালবিল শুকাইয়া অভাগ্যা নৌকা চলে না।  
আর বাপের কাছে কান্দে কই  
নৌকায় কেন দেওনা ছই  
আমার কথা তোমার মনে পড়ে না।  
যেন শিশুকালে দিছ বিয়ে  
খাঁচায় যেমন থাকে টিয়ে  
ঐ রকম থাকি আমি  
আবার শিশুকালে মারলে না কেন?  
ও গলে দিয়ে এক টিবি।  
আবার মায়ের সমান বাদক নাই  
মায়ের দৌলতে নায়র যাই  
শোন আমার ভাই বউয়ের কাহিনী  
এক বৎসর পর নাইয়েরে গেলি

ভাই বউ গাল পাইড়া বলে  
 ও কয় কেন আ'লো ছেনালের বি।  
 ও পুরাণ কাল্যা বাপের বাড়ী  
 নাও ভাড়া কর্যা আইছিলি।  
 আমি যাই ভাইগো বাড়ী  
 ভাই বউয়ের দেখি বেধম আড়ি  
 মারতে উঠে নিয়ে খোচানি  
 পাগল কানাই বলে এক বৎসর পরে আইছে বড়ু  
 তারে মার শলার ঝাড়ু  
 ও ছেনাল কমিনার বি  
 ও বড়ুকে জুড়াইয়া নিলে ছুই আনার অংশ ছাড়বে নি।

( ২০৮ )

পাগল কানাই কয় ভাই সকলরে--কলিতে একি অবিচার  
 আল্লাদে বউরে দেয় খাট পালঙ্গ—মায়রে দিয়া উঠায় কত জল  
 ও বউ কামে যদি পায় ভুল—থাপা দিয়ে ধরে চুল  
 —কয় বুইড়া ছেনাল  
 এখন যাব পাক করিতে কলসীতে নাই জল  
 ও আবার ভয় পা'য়া যায় আবার জল আনিতে—ও যেমন  
 পাগলেরই হাল।  
 আসুক আগে ছেইলা বাড়ী নালিশ করবো তার ছজুরী  
 —ও তোর বউ আমারে বলছে ছেনাল  
 ছেলে কয় ঠিক করিয়া বলিস কথা—থাপোর দিয়া ভাঙ্গবো মাথা  
 —রাখিস না তুই ভয় ;  
 জল আনিবার কইলে তো গো বিধম কষ্ট হয়  
 এই বুড়া বুড়ীর ক্যারক্যার্যাণীত—শরীর মোর কালো হয়ে যায়।

ছেলে কান্দে মায়ে কান্দে উপায় কি করি—কে দিবে আগুন পানি  
 কে দিবে খড়ি ও পাক কেমনে করি  
 নিঃসংশয়ে বলি দেও জুদা বাড়ী—ও বুইড়া বুড়ির কি ধার ধারি  
 —সয়না তোমার বাপের ক্যারকারী ।

॥ মা ॥

( ২০৯ )

আয় রব্বানী কাদের গণী দিয়া এক বিন্দু পানি  
 এই ভবের মাঝার  
 ওরে আব আতশ খাগবাত দিয়ে  
 গড়ন সারা করলেন তার  
 দুইজনে পিরিত করে দশটি মাথা হয় তাহার  
 আঠার মোকামে ঘর ভাই কেবল নয় দুয়ার  
 ঘরের মধ্যে যায়্যা আমি ভাবি বারেবার  
 সোর সার পবন পানি কি চমৎকার ॥  
 আমি দেখলাম এসে ভবের পর  
 পাগল কানাই চিনল না সে ঘর  
 আউয়াল ঘর সে বাপের মস্তক  
 ছয়োম ঘর ভাই মার উদর  
 মায়ের তুল্য কে আছে আর  
 কি সঙ্কটে রাখলো পেটে না হোল তার ভার  
 সম্ভান প্রসব হওয়ার কালে দিলেন মা শুকনাতে সঁতার ॥  
 কেতাবে আরো প্রমাণ দেয়  
 মায়ের একধার ছুধের মূল্য দেওয়া হোল বিষম দায়  
 সম্ভান প্রসব কালে মা'র দেহ ছেড়ে যান প্রাণটি যায়



মা পেয়ে এতো দুখ দেখে বেটার মুখ কি সুখ পায়  
 যদি কোলে তুলে নেয়  
 বনের পশু আহার তুলে সন্তানেক খাওয়ার  
 মাতাপিতা অমূল্যধন কেতাবের কথা মিথ্যা নয় ॥

( ২১০ )

মায়ের নিন্দা করলে বয়াতি হবে না তোর ভাল  
 হয় রে হয় এক দিবস চাঁদ সদাগর মায়ের নিন্দা করেছিল  
 —তাইতে তার বংশ গেল ;  
 আজ বয়াতি তেমনি দশা তোমার হলো ।  
 এক মা'য়া জগত জননী আবার মা'য়া তোর ঘরে ।  
 তুই সত্য করে বল বয়াতি -মা' বলেছ কোন্ নারীরে  
 তুমি চেন না তারে—সে মা'য়া জগত ভ্রমণ করে ।  
 মা'য়ার চরণ অমূল্য ধন এ সংসারে  
 হায়রে তোর বাবা—তোর বাবার বাবা সেও দেখ মা'য়ার পাও ধরে  
 —আছে সে জগত জুড়ে  
 তাই পাগল কানাই কয়  
 —এ জগতে 'মা' বলে সকলে ।

( ২১১ )

এ 'মা' ভারে ভারে ডাকি তোরে—কোথায় রলি 'মা' আমার  
 আজ বিষম দৈরার তুফান দেখে প্রাণ কান্দে আমার  
 এ 'মা' যারে দিছো পদছায়া—সেই সেই ধর্ম জেনেছে  
 সে পেয়ে রতন করে যতন—ও বসে রইয়াছে  
 এই 'মা' যা করো—তাই করতে পারো আপনারও কার গনি  
 তাই পাগল কানাই কয়- অনন্ত মহিমা মা' তোর কোরাণে শুনি ।

## ॥ চাটাম ॥

( ১১২ )

ওরে তোমরা নি কেউ চাটাম জানো ভাই--

একটি চাটামের কথা বলে যাই

ও সে চাটাম দিয়ে মাথা ভামুক খাই,

চাটাম কোথায় ছিল কে আনিল—আগি তার উদ্দেশ্য নারে পাই,

শুকনার পর পলো খুয়ে মাছ মারি চাটাম দিয়া,

চাপ দিয়া হাত দিয়া দেখি পাছায় খালি নাই।

ও চাটামের ললেম খুলে, চৌদ হাত পানির তলে—

ও লাঙ্গল বাইছে বিয়ান বিকালে

চাটাম শুনে আমার ধরছে মাথা—এ চাটাম কোন্ জায়গায় মেলে।

চাটামের বাক্স খুলে নয় তারা আবার গুলে

এমন চাটাম তোমরা শুনছো নাকি ভাই।

আবার ছইখার নায় কয় ও ছোট দিদি—আবার ঐ পাড়ার কালে যদি

আর তার কথা যদি কেউ শুনতি

আবার খুতার খালে এক ছাগলে তিন বাঘ ধরে খায়

তেমনি ছাগলের পেট ভরে না--পাগল কানাই তাই বলে সভায়

মিন্সার পেটে বাচ্চা হয় সেই কথা ত মিথ্যা নয়

কত বিধবা নারী বলছে

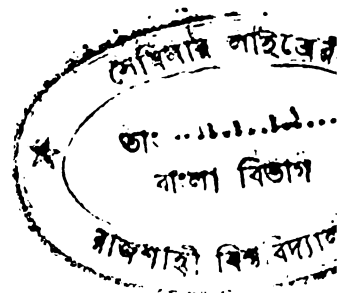
একি হাররে হায়।

## ॥ ঘরে বাইরে ॥

( ২১৩ )

ঘরে বাইরে বিবাদ করলে লোকে শুনে হাসে।

এমন অভোলা যুবতী ফেলে যাইও না বিদেশে



আমি মাসে মাসে লিখলাম চিঠি না আইল। দেশে  
 তাই পাগল কানাই ভেবে বলে সখিরে স্নেহের দিন গেল মাঘ মাসে।  
 আরও নারকেল তৈল স্নগন্ধি আর বিনোদ বরণ তৈল  
 আরও ভাতের ক্ষিধা পেট ভরে না পানি খালে যাবে না কই  
 আজ বাজুর কথা মনে হলে আজ আমি যেন কেমন হই  
 ও চাষার ঘরে বিয়ে যদি দিত বাপ ও মায়  
 দিন ভরে কাজ করত মাঠে--সন্ধ্যা হলে বাড়ী যায়।  
 আমি ভাতের ডাবর ছাগনে দিয়ে  
 আরও হেলান দিতাম গায়।  
 আবার মনের কথা খুইল। কইতাম সখীরে  
 ও নমস্কার দিতাম বন্ধুর পায়।

॥ হিংসা ॥

( ২১৪ )

হিংসা নিন্দা দূর কর হে মমিন মুসলমান।  
 হিংসা নিন্দা দূর না করলে কি মতে পাবি আছান।  
 আদম সেজদা না করে আজাজিল হয়েছে শয়তান  
 মন তোর পাকা বাড়ী দালান কোঠা সব পড়ে রবে  
 এ রাজ্যভর ত্যাগ করে একলা যেতে হবে  
 সে দিন মাতাপিতা দরদবন্ধু কেউ না শুধাবে  
 মন তোর যাবার বেলা সাদা ধুতি খেল্কা টুপী সার  
 তাই পাগলা কানাই বলছে মনি আপন আপন কর্মসার  
 চার যুগ ভরে থাক্‌বি অন্ধকারে দেখ্‌বি সেই বিষম অন্ধকার।

॥ হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি ॥

( ২১৫ )

এক বাপের দুই বেটা তাজা মরা কেহ নয় ।  
 সকলেরি এক রক্ত এক ঘরে আশ্রয় ॥  
 এক মায়ের দুধ খেয়ে এক দরিয়ায় যায় ॥  
 কারো গায়ে শালের কোর্তা কারো গায়ে ছিট,  
 দুই ভাইরে দেখতে ফিট ।  
 কেবল জবানীতে ছোট বড় বোবা বাচাল চেনা যায় ॥  
 কেউ বলে দুর্গা হরি, কেউ বলে বিসমিল্লা আখেরি  
 তবু পানি খেতে যায় এক দরিয়ায় ।  
 মালা পৈতা একজন ধরে, কেহ বা সন্নত করে ।  
 তবে ভাই ভাইয়ে গারামারি ক'রে যাচ্ছিস কেন সব গোলায় ॥  
 ( কাব্য মালঞ্চ পৃঃ ৫১ )

॥ মশারি ॥

( ২১৬ )

মশার জ্বালায় কিনলাম মশারি  
 টানায়ে গুয়ে থাকি ফিকিরি  
 দেখে মশা ফিরে যায় বাড়ী ।  
 তানোত মশা যুক্তি করে টানে তোলে মশারি  
 বলে পাগল, গাও ধুয়া জারি  
 ধুয়া জারি পা'লি মানায় না ব'লে  
 বাজাও খুজুরী ॥

মশার জ্বালায় গ্রাণ বাঁচে না ভাই  
 মশার মত রাক্ষস আর নাই

মশার জ্বালায় কোন্ বা দেশে যাই  
 দিবা ভাগে তলাশ কোন রকম খোঁজ না পাই  
 রাত্রিযোগে বহুত দেখতে পাই  
 তারা মানুষ গরু ঘোড়া আর ভেড়া  
 কিছু খুলো নারে ভাই।

তুমি পাগল বড়ো ভাগ্যবান  
 তুমি গেয়ে থাকো জারি গান  
 সর্ব দেশে মাত্র সর্ব স্থান  
 তখন মশা বলে ও পাগল কানাই  
 আমার কাছে শোন গান  
 কানের গোড়ে গুন গুন করে য্যান  
 কানে কামড়ায় ধরে বলে  
 ক্যামন হচ্ছে গান।

( —কবি পাগল কানাই, আবু তালেব,  
 আজাদ, ৮ই ফাল্গুন, ১৩৬১ সাল )

॥ কাঁথা ॥

( ২১৭ )

পাগল কানাই বলে আমার কাঁথার সমান বন্ধু নাই ;  
 জ্বর আসবার শব্দেই ভাই কাঁথা আমার গলায় বাঁধা  
 কাঁথারে যত্ন ক'রে রেখেছি ভাই  
 একদিন সরাইলের হাটখোলার পরে  
 আমার পালা করলো জ্বরে  
 হাত পাও শুকিয়ে গেল জ্বরেতে দোষ পাইল  
 গলা ছোটো ফুলো ফুলো।

\* \* \*

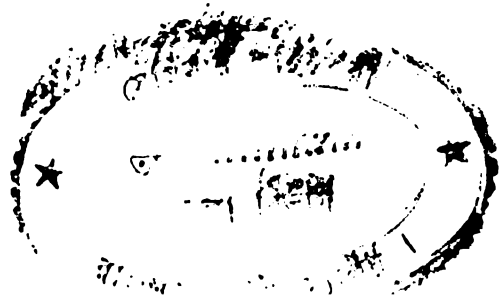
মাথাটা ফুলিয়া হলো ধান-সিন্ধের তলো ;  
 পাগল কানাই সাজে গড়া নাগ শুনেছি খুব  
 মাজা মরা শুকনা সারা তলার মত মুখ :

॥ ঘর জামাতা ॥

( ২১৮ )

পাগল কানাই বলে দুইনাদারী ছাড়রে ছাড়  
 একি দেখি অবিচার  
 ও তুই ভেবে দেখরে মন আমার  
 যে জন থাকে ঘর জামাতা সেই ভাঁড়ার  
 পোড়া কপাল দেখে প্রাণ কাঁদে আমার ॥

যে ভাঁড়ো থাকে খশুর বাড়ী  
 সে ভাঁড়োর পোড়া কপাল  
 ঘরের স্ত্রীর লোকের সাথে ঝগড়া হয়  
 ভাঁড়ো রাগ করে তাক মারতে যায়  
 ও ছুঁড়ি দৌড় দিয়ে ঘরে উঠে মুড়া ঝাঁটা হাতে লয়  
 নাম ধরিয়া ডাক দিয়া কয়  
 আয়রে, গোলাম তুই মারতে আয়  
 আমার বাপের ভাত খায়্যা তোর ঘাড় তেড়ি  
 তুই আমার সাথে করিস আড়ি  
 খাবিদাবি কাজ করবি, শুয়্যা থাকবি বা'র বাড়ি  
 বাড়ির মধ্যে আসতে চা'লি, মারবো মুড়া ঝাঁটার বাড়ি ॥



॥ পাখী ॥

( ২১৯ )

তেরই তারিখ পঁচিশে মাঘ ধূয়া বেঁধে যাই  
কাউয়া কুলি উঠ্যা বলে শোন ওরে বগলা ভাই  
তোমার কাছে একটি কথা নিবেদন জানাই  
ফ্যাচকা উঠিয়া বলে প্যাচার সমান কুলীন নাই ॥

কত চড়ুই ভাড়ুই গাঙ্গ সারক ম'ল শাট পেরে  
ধার কাউয়া, পাতি কাউয়া, মাছরাঙ্গা যুক্তি করে  
গাঙ্গচিল উঠিয়া বলে লজ্জা নাই তোরে  
গোঁড়ল পক্ষীর নাম শুনিয়া সকল পক্ষীর ভয় করে ॥

দইলাচা লাচণ করে কইতরের সাথে  
টিকরা বাজ উঠ্যা বলে ঘুঘু যাবে কার সাথে  
হাঁস-পায়রা নামাজ পড়ে ডেকে আজান ফিরে  
খঞ্জন পক্ষীর সৌরভ দেখে নরলোকে সালাম ফেরে ॥

মেমারু আর ফেঁপী-কোড়া একখানেতে রয়  
উপর থেকে ভোবন চিল কুকড়া খাওয়ার তাল জোটায়  
কুড়া-উহাস যুক্তি করে বিলের কাছে যায়  
মাঝখানেতে পানিকাউর সকলেক পাছা দেখায় ॥

ডুবাকুর তো স্বভাব দোষ জলে পারে ডুব  
ললগোঙ্গা আর কাঁচিচোরা বাল্যা হাঁসের বড়ই সুখ  
ডালে বসে ধূম পক্ষী বাতুর ঝোলে নীচে মুখ  
চালের বাতায় চামচিকা বাটুই পক্ষী খাওয়ার জুত ॥

মাণিকজোর আর চণা পক্ষী এক খানেতে রয়  
উপরে বসে শিকারী বাজ আচ্ছামত তাল জোটায়

ডালে বসে গিন্নী শকুণ কুতকুতয়া চায়  
হারগিলার তো গলায় থলি জমাদারি লিবার চায় ॥

আমি অতি মূর্খমতি নাই কোন বিতাবুদ্ধি  
কেমনে করিব আমি এই পক্ষীর শায়ারী  
আর পক্ষীর নাম জানি না সভাতে প্রকাশ করি  
ধূয়া বাঁধা সারা হ'ল পাগল কানাইয়ের কারগিদি ॥



এ সব ছাড়াও ক্ষুধা, পুত্রশোক, বন্ধু-বিয়োগ, বিমাতা প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটা গান আমি সংগ্রহ করেছি—কিন্তু গানগুলোর রচনাবৈশিষ্ট্য দেখে কবি পাগলা কানাইয়ের রচিত বলে মনে হলেও যেহেতু অশ্লের নামে প্রচলিত রয়েছে সেইহেতু সেগুলো এখানে তুলে দিতে বিরত থাকলাম। উদাহরণস্বরূপ ‘ক্ষুধা’ বিষয়ে সংগৃহীত গানটার প্রথম ছটো লাইন এখানে উদ্ধৃত হোল—

আমি অতি মূর্খমতি  
বিতাবুদ্ধি নাই  
পেটে যদি ক্ষুধা লাগে  
দিন দুনিয়া আঁধার দেখতে পাই।



॥ জারী গান ॥

॥ কারবালা ॥

অধ্যাপক মনস্করুদ্দিন সাহেব সংগৃহীত—

( ২২০ )

ওরে এমাম হোসেন দোনো ভাই.

রাছুলের নাতি গুনতে পাই—

বেহেস্দেরও নিশানা দোনো ভাই।

ও সে ফাঁকী দিয়ে এজীদ গোলাম

কারবালাতে নিয়ে যায়—

কারবালাতে আমার মউত গুনেছি নানাজীর ঠাই।

ও নানাজীর কথা—ও সে কথা মিথ্যা নারে ভাই

ওহে শোন তুলতুলি আমি উপায় এখন কি করি!

কারবালাতে এসেছি আমি—এই কারবালাতে রণ খেলাতে

গুনেছি নানাজীর ঠাই।

শুকনা মাটি পাও দাব্যা যায়, চিহ্নী পাওয়া যায়

মড়া কাঠে লোহ বাড়ায়—

এমন সময় গুণের ভাই হোসেন রহিল কোথায়।

আরে পুত্র লইয়া পুত্র কোলে যায় দরিয়ার কেনারে

এজীদ গোলাম তীর মারে বুকে

আবার মরা পুত্র নিয়ে দিল কদভান্নু বিবির কোলে

পুত্র দেখিয়া বিবির সব টলিয়া পড়ে।

আহা ছুখিনীর ধন মারলি কে?

ছুখিনীর ধন মারলি এজিদ তীরে মারে বুকে।

( ২২১ )

ছাকিনা কান্দে কয় এ সারা নিশি পোয়াইয়া যায়  
ও পূর্বে হল ভার উদয় ।

একলা ঘরে শুইয়া থাকি, খালি বিছানা দেখি  
ওরে থেকে থেকে উঠে মনে ও স্বামী রহদায়  
ভরা ঘরে দুয়ার দিয়ে স্বামী যায় বাণিজ্যের নৌকায়  
থাকত পতি খেলাতাম পাশা ফুরাইত মনের আশা,  
ও কারবালাতে ভেঙ্গে নিল এই সকল আশা,  
বিধাতা দিয়াছে ফাঁকি ।

পাগলা কানাই বলে

ও যেমন লখাই মরে বেহুলার দশা ।

প্রাণ-পতি মোর আয় না দেশে প্রাণ কান্দে মোর ঐ হতাশে  
ও মইলাম হলো ও আওলিয়া কেশে  
একেতে ভাদ্র মাসে সবের ডিঙ্গা দৈরায় ভাসে  
আমার নৌকায় নাইরে মাঝি এই কপাল দোষে  
পতি হারা হই আমি একলা রলাম ঘরে বসে—

( ২২২ )

ছাকিনা বলে আমার দিন গেল বিফলে  
কেন মা দিছ বিয়ে আমায় শিশুকালে,  
এল বসন্ত কাল, উদয় হল শতকদল,  
ও যেদিন কাল ভ্রমর বসবে ডালে—মধু খাচ্ছে কেমনে ;  
ও বনের পাখী, তোরে আমি জোড়ায় জোড়ায় দেখি—  
আহারে দারুণ বিধি, আমায় দিলা ফাঁকি ।  
আমি কার সঙ্গে দাঁড়াইব কার সঙ্গে কথা কব  
এই সারারাত জাগে থাকি ঘুম আসে না ছই চোখে ।

পাগল কানাই কয় ও মহাজনের পুঁজি,  
 ওরে যার পতি আছে রাজী,  
 তার নৌকা যায় না মারা ও হাল ছাড়ে না মাঝি,  
 ওরে তেল থাকতে গোর হয়ে যায় রাত্তি,  
 দিন থাকতে বেলা ডুবে যায় আমার ঘরে নাই পতি ।

( ২২৩ )

হোসেন কয় মা জননী বলি তোমারে  
 ও পানি দিল না মোরে  
 ওরে পানির জ্বালায় জান ছাড়ে যায়—  
 এই মা দেখলে না নজর করে  
 আজ আমি শহিদ হলাম কারবালার জমিনে ।  
 ওরে পানি খাবার গিয়াছিলাম গাত কুয়ার মাঝার  
 তাতে বাম হল বিধি পরোয়ার  
 ও তুই যারে ঘোড়া তাড়াতাড়ি রে  
 ও আমার মায়ের আগে কইও সমাচার  
 তোমার বেটা হোসেন আলী  
 সে যে ফিরে না আসিবে আর ।  
 পিছে কাল যম আসে টানতেছেরে  
 উঠবার শক্তি নাই  
 আমি জানলেম রে তোর বিচার নাই  
 ওরে আমার মাকে মা বলতে রে  
 এই দুনিয়ার পর আর কেহ নাই  
 ও মউতের সময় হলে পাগল কানাই কয়  
 কাফেরের হাতে বাঁচা নাই ।

( ২২৪ )

ও পানি, পানি বইলে ও নারে হোছেন  
 করছ কেনে তুমি বেদনা  
 ওরে তোমারে দিতে পানি ও আমার আল্লাজী  
 করছে মানা ।  
 ও পানির কারণ হচ্ছেরে মরণ ও ফেরে কোহরে  
 দরিয়ার কিনারে  
 ওরে পিয়াসে মোর ছাতিরে ফাটে ও কিছু পানি  
 দেওনা আমারে ।  
 ও কত মৎস আদি ঘড়্যালরে কুশির আল্লা তারা  
 মলো হতাশে  
 ও খাচ্ছে গড়াগড়ি, পাগল কানাই বলে  
 দরিয়ার পানি না মেলে ।

( ২২৫ )

ও নিশি প্রভাতকালে, ওরে বিনয় করে কাঁদে বিবি ছখিনা  
 ও তোরা নিষ্ঠুর পাষণে  
 এই কালে ডুবে এল ও সোনার মদিনা ।  
 ও আমি ছিলাম নারী অবলা,  
 ওরে তাতেও না দিছোরে আল্লা—ও পতির শোক জ্বালা  
 ও হয় আল্লাতাল্লা  
 এ নবীন বয়সের কালে আর কত সয় জ্বালা  
 ও আমি ছিলাম নারী অকুমারী—  
 ওরে তখন না ছিলাম রে আমি ও কার প্রাণের বারি  
 পাগল কানাই বলে এ নবীন বয়সের কালে  
 কেবা হয় নারী ।

( ২২৬ )

ছকিনা ছকিনা বলে ও আমি স্বরে ডাকি মা—

এই মা ডাকলে শোন না ।

এই গগনেতে অধিক বেলা ও তুমি কপাট খোল না  
ও তোমার ডানের কপাল বামে হেলে গেছে ছকিনা ।

চেয়ে দেখ স্বর্ণ মদিনা,

খালি ঢুলঢুল আইল ফিরে ও আজগর দেখি না ।

মা তোর নছিবোতে এই না ছঃখু লেখেছে খোদায়  
আর তুমি দাঁড়াবা কোথায়—

পাগল কানাই বলে—এক জ্বালাতে জ্বলে মরি

আর এক জ্বালা ছেঁমায় ।

( ২২৭ )

ও ছকিনা ডাক শোন না, ডাকি বারে বারে,

তুমি যাও নিদ্রাগত—আমি জনমের মত,

ছকিনা খুঁজলে নাগাল পাবা না আমারে—

ও ছকিনা পুরুষ থুয়ে মা'য়া যায় দরবারে

তিন দিনকার মা'য়া নাচে বাপের কাছে ঘুরে ঘুরে ।

ও বাপজান বিয়া দাও আমারে—

ও ছকিনা সিন্ধায় সিঁছুর নাকের বেসর খোল

যেন বাপজান মলো জহর খেয়ে

কারবালাতে রণে যায়—

ও পাগল কানাই বলে ও ছকিনা সেই দশা তোমার হল !

( ২২৮ )

ছকিনা কয় ওগো আল্লা বাম হোলি কেনে?  
আমার বিয়ের রাত্রে মলো পতি এই ছিল কর্মে  
কাল সকালে বেরণ বলে গয়না দিছ গায়—  
আজ কেন মোর সিস্তার সিঁদুর গয়না খোলা যায়।

তোমার পতি গিছে মারা কারবালারও রণে  
সেই জন্তে তো সিস্তার সিঁদুর খুলে খুই ঘরে।

কি কথা শুনাইলি মা'ধন আবার বল শুনি,  
ভিজান কার্ঠে অগ্নি আমার জ্বালাইলি  
আগে যদি জানতাম পতি সেই রণের খবর  
ও যেন হবি কালি পরি ঘোড়া করিতাম সাজন।

( ২২৯ )

ওরে হাপন হাতে দস্তখতে লিখছিলাম লিখন  
ওরে কাছেদকে পাঠাইয়া দিলাম আলোকের শহর  
ও চাচা আইলে দুষ্কের কথারে আমি কহিতাম সকাল  
ও এজ্জিদ রে এই ছিল মনে।

ও যেমন ভরতকে রাজ্য দিয়ে সোনার রাম গিছে বনে  
ওমনি দশা আমার হলরে এজ্জিদ কারবালারও রণে,  
পাগল কানাই বলে ও নবীর বংশে বাতি দিতে  
এই হইতে সারা

ঐ দেখা যায় কারবালাতে কাফেরের লস্কর  
খালখানা ঘিরা—

ও ছুরাত জামাল চাচির জন্ত ও এজ্জিদ এই করলি তোরা !

( ২৩০ )

মোহাম্মদ হানিফা যখন পাইল জয়নালের লেখন,  
 পাইয়া কাছেদের হাতে খুসি হইল মন ।  
 ও লেখন পইড়া টইলা পল ও ভাইয়ের কারণ  
 আহারে জোড়েরও ভাই রে, ও গেলি রে ছাড়ে ।  
 আগে যদি জানতাম রে ভাই তোরে মারবে কাফেরে,  
 কাফেরকে না রাখতাম রে আমি এই দুনিয়ার পরে,  
 ভাইয়ের শোকে কলিজা জ্বলে ও ভাই গেলিরে ছেড়ে !  
 আমি জন্মের মত ডাকি তোরে, ভাই ভাই বলে  
 ভাইয়ের শোক বিষম শোক রে,  
 ও পাগল কানাই বলে --- যার অন্তরে ।

( ২৩১ )

ও নিশি প্রভাত কালে কান্দে ফাতেমা  
 আরও কুল শূণ্য মদিনা খানি সোনার বালাখানা ।  
 তাই পাগল কানাই কয়  
 ও সাত রোজের অনাহারী কেও না কয় 'মা'  
 হায়রে ইমাম যদি মরত কোলে, গোর দিতাম ছামনে,  
 ও দেখতাম বেয়ান বৈকালে ॥

ওরে সমুদ্রের বিষম তুফান উঠে মায়ের মনে,  
 ওরে বেটার শোক রয়ে রয়ে পড়ে মায়ের মনে,  
 হায়রে দুঃখীর ধন ওরে বাছা নীল রতন  
 এই ধূলায় লুকাইয়া কান্দে, মায়ের সোনার চান্দবদন  
 — হায় বেটা বেটা বলে মায়ে করছে রোদন ।

( ২৩২ )

হায়রে কোকিল ডাকিস নারে  
 ডাকিস নারে কুল কুল বলিস নারে,  
 আমি কই তোরে,  
 ও যেমন কুলস্বর্গ আখের স্বর,  
 কে 'মা' বলবে আর  
 ও সারারাত বইসে কান্দি আমি এই ঘরে,  
 কোকিল তুই ডাকিস কেন বনে,  
 পুত্র শোক উঠে মনে, কত সয় মায়ের প্রাণে,  
 ওরে কোকিলরে ।

ও যেমন দৈবকিনীর কৃষ্ণহারা,  
 ও হুঃখে মায় পাগল পারা—  
 ও চক্ষে না রয় ধারা,  
 ও গোপাল উদরে রাখলাম,  
 ও চন্দ্রমুখ না দেখিলাম,  
 ও প্রাণ থাকতে থাকতে পাষাণের গায় জ্যাস্ত মরা,  
 ও বুঝি সেই দশা আমার হলো,  
 কেন ইমাম ছেড়ে গেল,  
 ইমাম শোক, আগুন রলো মায়ের বুকের পুড়া ।

ওরে কোকিলরে ! ও বনের পাখী, বনে থাকিস,  
 ও পুত্র শোক জানিস নারে,  
 পাগল কানাই বলে যার মরেছে কোলের ছেলে  
 সেই সে জানে,  
 ও কোকিল তুই ডাকিস কেন বনে,  
 পুত্রশোক উঠে মনে  
 কত সয় মায়ের প্রাণে  
 ওরে কোকিল রে ।



( ২৩৩ )

ভ্রমর জানা যায় ভ্রমরা গুণাগুণ কৃষ্ণ গুণাগুণ--

ও আগুন আগুন বনে ফেলে দিয়ে পায় ;

আঁধার নবদ্বীপ শূন্য হ'ল হায় ও মরি হায় ।

ও মায়ের কান্দন শুনে নবী কেন্দে কয়

কেন্দোনা কেন্দোনা 'মা' গো বলি তোমায়

পাগল কানাই বলে

এই ভবে আর কেও রবে না এ সব মিছে মায়াময় ॥

ও মিছে অনাহারী রলে কি কারণ ?

আইছো একা যাইবা একা -- সব অকারণ

ও বেটা পুত্র কেও কারো না—ও সবেরি মরণ—

ও 'মা' জানো মা—কেন করছো রোদন ।

এই নবীর উন্মত্ত যত ও তোমায় সবায় বলবে 'মা'

তাইতি কি তোমার জীবনও শাস্তি হয় না ?

( ২৩৪ )

হোসেন বলে সীমাররে খুনী, আজ তোরে মিনতি করি

এই হলকম ছেড়ে দে রে সীমার 'মা' বলে ডাকি

—ওরে শেষে দিও কোরবানী ।

ও তোমার হাতে আমাররে মউত বলে গেছেন নানাজী

আজ লানতের তক্কে সীমার দেখি তোর বুকে

পাগল কানাই বলে নিমা খোল তাই দেখি ।

ও আজ কার বলে নিমারে খুইলে,

হোসেন বলে গাও কাঁপে ডরে

হোসেন বলে আজরাইল আইলরে,

ও আল্লা আর বাঁচিব না

ও ঘোড়া ছলছল রে তুই ফিরে যা ।

( ২৩৫ )

ইমাম আইল শিকার খেলে,  
 পানি চাইল বিবির হুজুরে,  
 ও না জানিয়ে জহর গুলে বিবি খাওয়াল তারে ।  
 ইমাম যখন জহর খাইল দিবে অঙ্গ কাল হইল,  
 কোন্ দোষে সে জহরগুলে বিবি খাওয়াইল মোরে  
 ইমাম বলে ও হোসেন ভাই এস আমি করে বলে যাই  
 ও পাগল কানাই ভাই বলে বিধির লিখন খণ্ডন না যায় ।

নিম্নের গানগুলো আমি সংগ্রহ করেছি। কারবালা সম্পর্কিত আরো প্রচুর গান আমার কাছে রয়েছে। তবে সেগুলো অণ্ড নামে প্রচলিত। মাঝে মাঝে রচনার সৌকুমার্য দেখে পাগলা কানাইয়ের রচনা বলে সন্দেহ হলেও এখানে সেগুলো উদ্ধৃত করতে বিরত থাকছি। শুধু যেগুলো পাগলা কানাইয়ের নামে প্রচলিত, সেই ক'টা গানই এখানে দিলাম।

( ২৩৬ )

গগনে উঠলো রবি আড়াই পহর বেলা  
 আমার বিধির হয় খেলা ॥  
 ইমামের সামনে যেমন রে  
 আজগুবি জহরের পেয়ালা ॥  
 জহর খেয়ে আকুল হইছে ব্যাকুল  
 ইমাম শাহাজন  
 ধীরে ধীরে তাঁর অঁখি হোল ঘোর  
 জায়েদা ভানুক ডাক দিয়া বলে রে  
 ও বিবি আমি ছবমুন ছিলাম তোর ॥  
 আপন হাতে খাওয়ালে জহর কোন্ দোষ পেয়ে  
 এ ছনিয়া কয় দিনের তরে

যার মাল সে করছে তলব রে  
ও বিবি তোর কপালের দোষে ॥

পিতার কথা আজকে বুঝলাম সত্য হয়েছে  
ও হোসেন সত্য হয়েছে  
সখিনাকে দিও বিয়া রে  
ও হোসেন কাসেমের সাথে ॥

মায়ের সত্য পাইরে হোসেন যাইও না রণে  
ও হোসেন যাইও না রণে  
তোমার যে মরণ এজিদের হাতে রে  
সে কথা লেখে কোরাণে  
কানাই কয় ইমাম ম'ল বিষের বাণে  
কার কপালে কি আছে তা আল্লা বিনে  
কেহ না জানে ॥

( ২৩৭ )

সখিনা কাঁদে কারবালায়  
এজিদ মারোয়ানকে দিয়া পাঠায়  
মারোয়ানের ফেকাম দেখে সখিনা অচেতন হয়  
খানিক পরে চেতন পেয়ে  
কোমরের খঞ্জর খুলে নিজের জীবন বের করে  
সখিনা জীবন বাহির করে ।  
মারোয়ান তাড়াতাড়ি গিয়ে বিবিদের ধরে  
বিবিদের সঙ্গে নিয়ে দামেস্কেতে যায় চলে  
এজিদ গোলাম দেখিয়া বলে  
তাড়াতাড়ি নিয়ে যেয়ে থোও বন্দী ঘরে

নিয়া থুলো বন্দী ঘরেতে, জয়নাল কেঁদে বলে তার মা'র কাছে  
 মৃত্যু বুঝি হোল এই ভবে  
 শাহারবানু কেন্দে বলে শোন বাবা আমার কাছে  
 এজিদ গোলাম যা কহিবে  
 তাই শুনিলেন তোমার মউত না আছে।  
 বৃহস্পতিবার চা্লিয়া গেল শুক্রবারের দিন ভাল  
 এজিদ জয়নালকে ডাক দিয়া নিল  
 ফাঁকি দিয়া ডেকে নিয়া জুমা ঘরেতে গেল  
 নামাজ পড়িবার সময় এজিদের নামে  
 খুৎবা জারি করিবার ক'ল ॥  
 জয়নাল খুৎবা জারি করে ইমাম হোসেনের নামে  
 এজিদ কাফের এই খুৎবা শুনিল নিজ কানে  
 জয়নালকে ধরে এনে দাও আমার হুজুরে  
 ঐ ব্যাটার ছের কেটে যাই বাড়ী চলে  
 নইলে আমার এ জীবন দেখাবো না কারে  
 কানাই কয় খোদায় না মারলে  
 কেউ কি মারতে পারে ॥

( ২৩৮ )

কাসেদ কান্দে জারেজার আমি সাগর হলাম পার  
 এ বন ছাড়িয়া করবো জয়নালেক উদ্ধার  
 এ্যাছা বন করেছ পয়দা হে আল্লা নাই কূল কিনারা তার  
 কেমনে করিব আমি জয়নালেক উদ্ধার ॥  
 কাসেদ মেলা দিল পথে, আল্লা কেহই নাই সাথে  
 আল্লানবীর এই ছুটি নাম কেবলই সাথে  
 আগি যদি মরি আল্লারে আমার জয়নাল মরবে কারাগারে  
 বান্দীর বেটা বাদশাহী করবে দামেস্ক শহরে ॥

এই বলিয়া কাসেদ যখন কান্দিতোছিল  
 হেন কালে খোদার জিব্রিল সম্মুখে এলো  
 বুদ্ধিতে কাসেদের মন জিব্রিল আচম্বিতে বাঘ হোল  
 লক্ষ্য দিয়া কাসেদের সম্মুখে প'ল ॥

তখন কাসেদ কেন্দে কয় শোন বাঘ বলি হে তোমায়  
 জয়নালের লেখন পত্র আছে মোর মাথায়  
 আমায় যদি খাও হে বাঘা তাতে তো নাই কোন দায়  
 জয়নালের পত্র যেন হানিফ শাহা পায় ।  
 সে কথা ভেবে কানাই পড়েছে বিষম চিন্তায় ॥

( ২৩৯ )

কাসেদ বলেরে আল্লা ঠেকলাম বিষম দায়  
 এ বড় দারুণ জঙ্গলময়  
 চৌদিকেতে দারুণ যম্ আজ বুদ্ধি প্রাণ যায়  
 ছকের কথা বলবো কোথা কে শুনিতে চায়  
 হায় আল্লা হায়  
 দীন হীন কাঙ্গাল আমি ডাকছি দয়াময় ॥

ওঠো বাঘ ছাড়রে রাস্তা নিবেদন বচন  
 এ বড় ছকের বিবরণ  
 নবীর বংশ করলো ধ্বংস এজিদ মালাউন  
 কাসেদ হয়ে চিঠি নিয়ে যাই হানিফার ভবন  
 শোন ছকের বিবরণ  
 পথ ছাড় রে বাঘা দিও না আর জ্বালাতন  
 কানাই কয় বিপদে সত্য বুদ্ধি ভুল নারে মন ॥

( ২৪০ )

ওরে চেতন পেয়ে হানিফ শাহা মুখে বলে আহা আহা!

হায় কি করলিরে নিদান

ওরে বেহুশে পরিয়া র'ল হানিফ পালোরান

কেহই না র'ল ভবে আজকে দেহ ছেড়ে

বুঝি চলিল পরাণ ॥

চেতন পেয়ে হানিফ মর্দ দেলেতে লাগিল ধন্দ

হাঁকিয়া লঙ্করেরে কর

কোথায় আমার ঢাল তলোয়ার এনে দাও আমায়

কোথায় আমার ছলছল ঘোড়া

সেজে এনে দাও হেথায়

আমার জয়নাল ম'ল বুঝি এজিদের কয়েদখানায় ॥

সে কথা হানিফা বলে জোরেতে বাছ তোলে

বেহুশে দৌড়ে যায়

মাটি বলে ওহে হানিফ ধীরে ফেলো পাও

তোমার পায়ের ভরেতে আমার কাঁপে সর্ব গাও

গাছ বৃক্ষ তরুলতা তারা কেন্দে বলে

হানিফ পা ধীরেতে ফেলাও

দামেস্কের নিকটে গিয়ে মার মার বলে হাঁকে

হাঁক শুনে কাফেরে পালায়

ওরে জমীনের ধূলা যেমন আসমানে লাগায়

ঘোর অন্ধকার হয়ে গেল ভূমিকম্পের দায়

এ্যাছা জ্বোরে তেগ মেরেছিল

ছাগলের পালে যেমন বাঘ যেয়ে সাঁধায় ॥

কখনও কাটে ডানে কখনও কাটে বাঁয়

কাহাকেও শূন্যেতে উড়ায়

কখনো কানাই বলে ওরে এজিদ ঠেকলে বিবম দায়  
কখনো কানাই বলে এলো বলি যে তোমায়  
কখনো কানাই এজিদ গোলাম  
দৌড়ে যেয়ে কুয়াতে সাঁধায় ॥

: কানাই শব্দে কানাই সম্পর্কে প্রচলিত আরও কয়েকটা কিংবদন্তী ॥

কানাইয়ের গান শুনে বহু তেরো বছর। জীবিকা নির্বাহের জন্ত তাকে  
এক সময়ের নিরাকৃত অঙ্গীকার হিসেবে কাজ করতে হচ্ছে। একবার একস্থানে  
কানাইয়ের নৈতিকতাই সবাই জানতে পারলো যে সেখানে গান হবে।  
কিন্তু কানাইয়ের পর সকলেই গান শুনতে যাবে, এদিকে নৌকার পাহারা  
কানাইয়ের থাকবে। ঠিক হোল কানাই বয়সে ছোট, গানের সে কি  
কানাইয়ের কানাই থাকবে। কিন্তু কানাই কিছুতেই থাকতে চাইল না  
—গান শুনে শুনতেই হবে। এ হেন পরিস্থিতিতে সকলে মিলে কানাইকে  
নৌকার নৌকার সাথে বেঁধে গান শুনতে চলে গেল। কানাই চীৎকার  
করতে লাগলো। এ দিকে রাত্রি গভীর হয়ে এলো, কেউ গানের আসর  
থেকে কিরে এলো না। কানাই ভয়ে এবং মনের দুঃখে আরও চীৎকার  
আরম্ভ করলো। এ সময়ে কানাই লক্ষ্য করলো একজন সাধু দরবেশ ব্যক্তি  
নদীর ধার দিয়ে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছেন। কানাইয়ের চীৎকারে তিনি তার  
কাছে এলেন এবং কেন সে এমন করে চীৎকার করছে সে কথা জিজ্ঞেস  
করে সমস্ত তথ্য জানতে পারলেন। সব কিছু শুনে তিনি কানাইয়ের বাঁধন  
খুলে দিলেন এবং আদরের সাথে তার মুখের সাথে মুখ ঘর্ষণ করে বলে  
দিলেন, “গানের প্রতি তোমার যখন এমন তীব্র আগ্রহ তখন খোদার অনুগ্রহে  
তোমাকে এমন শক্তি দিয়ে দিলাম যে আর তোমাকে গান শুনতে হবে না,  
তোমার গান শুনবার জন্ত হাজার হাজার লোক ছুটে আসবে এবং তুমি যা  
বলবে তাই গান হয়ে যাবে।” এই বলে সে দরবেশ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।  
কানাই তখন ধীরে ধীরে সেই গানের আসরের কাছে গেল, কিন্তু লোকে  
লোকারণ্য দেখে আসরের পাশেই এক কচুর ক্ষেতে দাঁড়িয়ে চীৎকার আরম্ভ

করলো। কিন্তু দেখলো সে যা বলছে তা চীৎকার নয়—সঙ্গীত। তার গান শুনে একজন দুজন করে আসরের সব লোক ছুটে এলো এবং সারারাত তার সুরের খেলা শুনে অবাক হয়ে গেল। এর পর থেকেই তার খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। —পাবনা জেলার উল্লাপাড়ায় প্রচলিত।

একবার পাবনা জেলার সলপের সাথালদের বাড়ীতে কবি গানের জন্ত নিমন্ত্রিত হন। তাঁর নাম শুনে প্রায় বিশ হাজার লোকের সমাগম হয়। তিনি যথারীতি সকলকে সালাম জানিয়ে গান আরম্ভ করেন। তাঁর গানের আসরের অদূরেই ছিল কালী মন্দির। কিছুক্ষণ গান হওয়ার পর দেখা গেল কালী মূর্তি যে দিকে মুখ করে প্রতিষ্ঠিত ছিল সে দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কবির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে। —পাবনা জেলার সলপ অঞ্চলে প্রচলিত।

কবি পাগলা কানাই কুষ্টিয়ার মুন্সীগঞ্জে একবার গান গাইতে এসেছিলেন। তাঁর গানের আসরে এক বধির ব্যক্তি শ্রবণ শক্তি ফিরে পেয়েছিল। —কুষ্টিয়ার মুন্সীগঞ্জে প্রচলিত।

পাবনা জেলার বনওয়ারী নগরে কবি একবার গানের জন্ত আহূত হন। সেখানকার জমিদার কবিকে নিজের বাড়ীতেই থাকবার ব্যবস্থা করেন। কবি জানতে পারলেন জমিদারের পুত্রবধূর কোন সন্তানাদি জন্মাচ্ছে না। বিয়ের পরে প্রায় ১২ বছর কেটে গেছে—বহু চিকিৎসা করা হয়েছে কিন্তু কোন ফল হয় নি। কবি তখন সেই বধূটিকে ডেকে গান শুনিয়ে দেন। গান শুনবার একবছরের মধ্যে তার এক পুত্র সন্তান লাভ হয়। কবির নামানুসারে এই পুত্রের নাম রাখা হয় কানাই। —পাবনা জেলার বনওয়ারীনগরে প্রচলিত।

ময়মনসিংহের পিগনা অঞ্চলে কবির গান শুনে সেখানকার বিখ্যাত হালু ডাকাত মুগ্ধ হয়ে কবির কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল, সে আর জীবনে ডাকাতি করেনি। —ময়মনসিংহের পিগনা অঞ্চলে প্রচলিত।



খুলনার দৌলতপুরে কবিকে অপমান করা হয়েছিল। কবি যেহেতু মুসলমান সেইহেতু তাঁকে জনৈক প্রভাবশালী হিন্দু গালি দিয়েছিল। এ ঘটনার পর দিন দেখা গেল উক্ত ব্যক্তির জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে গেছে এবং তার বাকশক্তি রহিত হয়েছে। জীবনে আর সে কোন দিনও সুস্থপষ্ট ভাবে কথা বলবার শক্তি ফিরে পায় নি।

—খুলনার দৌলতপুরে প্রচলিত।

পাবনা জেলার চরতাড়াবাড়ীয়া গ্রামের আজিজুল হক সরকার বলেন যে তিনি জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে শুনেছেন কবি পাগলা কানাই প্রায়ই রাত্রিতে গভীর আরাধনায় মগ্ন থাকতেন। দীর্ঘসময় ধরে এমনি নামাজ পড়বার পর তাঁর সামনে কোন দূরারোগ্য লোক উপস্থিত হলে তিনি তার গায়ে ফুক দিতেন। অনেকেই এতে আরোগ্য লাভ করতো। উক্ত আজিজুল হক সরকারের জনৈক পদ্ম আত্মীয় নাকি সত্যই কবির ফুকে পূর্ব-শক্তি ফিরে পেয়েছিল।

বশোহর জেলার বিনাইদহে প্রচলিত আছে যে কবির কণ্ঠে আল্লাহ-প্রদত্ত একটা শক্তি ছিল। সেজন্য প্রতিদ্বন্দ্বী বরাতি তাঁর সাথে প্রতিযোগিতায় এটে উঠতে পারত না। একবার বিখ্যাত বরাতি ইছু বিশ্বাসের সাথে কানাইয়ের গানের পাল্লা শুনবার জন্য হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়। কবি প্রথমে তাঁর শিষ্য ইছুর সাথে পাল্লায় নামতে সংকোচ করছিলেন। কিন্তু ইছু আসরে নেমে ওস্তাদকে গাল দিতেও সংকোচ করছে না দেখে তিনি আসরে নামলেন। অবশি পাল্লায় বেশীদূর অগ্রসর হতে হোল না। কানাইয়ের কণ্ঠস্বর ও বাচন-ভঙ্গী শুনে ইছুর কবিত্ব-বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল। ইছু পরাজয় স্বীকার করে কানাইয়ের গৌরব ঘোষণা করলো ॥

রাজশাহীর গোপালপুরে নাকি একবার সাংঘাতিক অনারুষ্টির ফলে সমস্ত শস্য নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। কবি এহেন সময়ে সেখানে গান করতে নিমন্ত্রিত হন। দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনায় সন্ত্রস্ত জনসাধারণ সাধক কবিকে দোওয়া করতে অনুরোধ জানায়। কবি গানের আসরে দাঁড়িয়েই প্রার্থনা করেন এবং গান শেষ হতে না হতেই নাকি রুষ্টি আরম্ভ হয়।

—রাজশাহীর গোপালপুরে প্রচলিত।

## গ্রন্থপঞ্জী

- ১। যোশাহর খুলনার ইতিহাস—২য় খণ্ড, শ্রী সতীশচন্দ্র মিত্র
- ২। কাঙাল হরিনাথ—১ম খণ্ড, শ্রীজলধর সেন।
- ৩। পাবন জেলার ইতিহাস—১ম ও ২য় খণ্ড—শ্রীরাধারমণ সাহা বি-এল
- ৪। Bengal District Gazetteers—Pabna—L. S. S. O' Malley.
- ৫। „ „ „ „ Jessore— „ „ „
- ৬। Report of the Famine Commission of 1878-80 Part I
- ৭। Bengal under the Lieutenant Governors—Vol I and II  
C. E. Buckland
- ৮। শরৎচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ।
- ৯। শরৎ কুমার লাহিড়ী ও বঙ্গের বর্তমান যুগ।
- ১০। গোরক্ষ বিজয় কাব্য—আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্পাদিত।
- ১১। মীনচেতন।
- ১২। কোরাণ শরীফ—সূরা ১৩, আয়েত ২৯।
- ১৩। Legacy of Islam—T. A. Arnold.
- ১৪। Mathnavi—Dr. R. A. Nicholson (Edited).
- ১৫। হারামণি—১ম ও ২য় খণ্ড—মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন।
- ১৬। কবিতাবলী—হেমচন্দ্র
- ১৭। মহাম্মদশান কাব্য—কায়কোবাদ।
- ১৮। জঙ্গ নামা—হেয়াতমামুদ।
- ১৯। হিত জ্ঞান বাণী— „
- ২০। আশ্বিনী বাণী— „
- ২১। বাঙ্গালীর গান—শ্রীধুর্গাপ্রসাদ লাহিড়ী।
- ২২। পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ—চিত্তরঞ্জন দেব।
- ২৩। উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য—নিরঞ্জন চক্রবর্তী।
- ২৪। শাক্তপদাবলী—অমরেন্দ্র নাথ রায় সম্পাদিত।

- ২৫। কবি পাগলা কানাই—মুহম্মদ আবুতালিব, আজাদ, ৮ই ফাল্গুন, ১৩৬১
- ২৬। বাংলা একাডেমী পত্রিকা—১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা।
- ২৭। সংবাদ—১৩ই নভেম্বর, ১৯৫৫।
- ২৮। মাসিক মোহাম্মদী, চৈত্র, ১৩৬২ সাল
- ২৯। „ „ ১৩৬৩ সাল বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন।
- ৩০। মাহেনও—সেপ্টেম্বর—১৯৫৪
- ৩১। পাকিস্তানের লোক কবি—পাকিস্তান পাবলিকেশন্স।
- ৩২। সহজিয়া সাহিত্য—শ্রীমণীন্দ্র মোহন বসু।



## লোক-সংস্কার

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এম, এ, ডি-লিট

ভয়-ভক্তি, ঘৃণা-ভালবাসা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস—এই নিয়েই মানুষের প্রায় ষোল আনা মন। এতে সভ্য অসভ্য, আদিম আধুনিক কোন ভেদ নেই। তবে ছনিয়া যেমন বদলাচ্ছে, আমাদের ভাবের পাত্রও তেমনি বদলাচ্ছে। আদিম মানুষ যা যা ভয় করত, আধুনিক মানুষ হয়ত তার সবটাকে ভয় করে না। ভয়ের পাত্র বদলে গেছে, ভয় কিন্তু রয়ে গেছে। ভক্তি, ঘৃণা, ভালবাসা, বিশ্বাস প্রভৃতি মনের ভাবগুলি সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যখন গোটা ছনিয়াটা বদলে গেছে তখন বাংলা দেশটাই বা বদলাবে না কেন? আজ আমরা সংস্কার ও বিশ্বাসের দিক থেকে বিষয়টা আলোচনা করব।

বিজ্ঞানের আলোয় আজ আমরা অনেক আচার ব্যবহার ও বিশ্বাসকে কুসংস্কার বলছি। কিন্তু একদিন ছিল যখন এগুলি ধর্মকর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের ন্যায় সকলের শ্রদ্ধার সামগ্রী ছিল। এগুলি যে কত প্রাচীন, না গ'ণে বলা কঠিন। একটা দৃষ্টান্ত দিই। পেঁচার ডাককে আজও বোধ হয় অজ্ঞ জনসাধারণ অশুভ বলে মনে করে। আমরা বলি এটা কুসংস্কার। তবুও গভীর রাত্রে পেঁচার ডাক শুনে মনটা কেমন ছঁয়াক করে ওঠে। এই যে সংস্কার বা কুসংস্কার কত কালের? আমরা ঋগ্বেদে দেখতে পাই—ঋষি পেঁচার ডাককে মৃত্যুর লক্ষণ মনে করেছেন—

‘যজ্ঞলুকো বদতি মোঘমেতদ্ যৎ কপোতঃ পদমগ্নৌকুণোতি।

যশ্চ দূতঃ প্রহিত এব এতৎতস্মৈ যমায় নমো অন্ত মৃত্যবে ॥

(১০।১৬৫।৪)

‘এই পেঁচা যা বলছে মিথ্যা হোক। এই কপোত অগ্নিকোণে পা রেখেছে। যার দূত হয়ে এ এসেছে, সেই যমকে, সেই মৃত্যুকে নমস্কার।’

এই ঋগ্বেদের উল্লেখ থেকে বুঝলুম অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর আগেও লোক পেঁচাকে যমের দূত বলে মনে করত। তারও আগে থেকে যে এই সংস্কার চলে আসছিল তাতে আর সন্দেহ কি?

পুরাণে আছে, অশ্বর রাহু চাঁদ ও সূর্যকে মধ্যে মধ্যে গ্রাস করে। তাতে করে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হয়। এই বিশ্বাস কোন শিক্ষিত লোক আর করে না। কিন্তু এখনও গ্রহণের সময় নিষ্ঠাবান হিন্দু শঙ্খধ্বনি এবং স্নান-দান-ধ্যান করেন, আর হিন্দু মাত্রই হাঁড়িকুড়ি ফেলে দেন। গ্রহণ মাথায় কেউ খায় না। এখানে বিশ্বাস নাই; কিন্তু প্রাচীন আচার বজায় আছে।

চাঁদের কলঙ্ক সম্বন্ধে পুরাণে নানা কথা আছে। কিন্তু বাঙ্গালার জনসাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, এক বুড়ী বটতলায় বসে চরকার সূতো কাটছে। যাকে বুড়ীর সূতো বলা হয়, সে ঐ বুড়ীরই চরকার সূতো। আসলে কিন্তু বুড়ীর সূতো এক জাতীয় ছোট মাকড়সার জাল। এর ইংরেজী নাম হচ্ছে gossamer. এক সময়ে ইংল্যান্ডের লোকে বিশ্বাস করত যে, যিশুখ্রীষ্টের মা সেণ্ট মেরীর শব যখন আকাশে উঠেছিল, তখন তার চাদরের সূতো খসে পড়ে; তাই হ'ল এই বুড়ীর সূতো।

সন্ধ্যাবেলায় আকাশে একটি তারা দেখা অশুভ মনে করা হ'ত। এই বিশ্বাস বাংলার বাইরেও ছিল। বিদ্যাপতির পদে দেখি বিরহিণী রাধিকা আক্ষেপ করে বলছেন—

“কি হাম সাবাক একসরি তারা

ভাদর চৌঠিক শশী।

ইথি ছুহ মাঝ কওন মোর আনন

যে পছ হসি ন হেরসি ॥”

“আমি কি সন্ধ্যার একটি তারা কিংবা ভাদ্রমাসের চতুর্থীর চাঁদ? এই ছয়ের মধ্যে আমার মুখ কোনটি যে প্রভু তুমি হেসে কখনও চাও না?”

নদীতে জলস্তম্ভ দেখা যায়, লোকে মনে করত ইন্দ্রের ঐরাবত হাতী মেঘের মধ্য দিয়ে গুঁড় নামিয়ে জল তুলছে। পরে এই জল থেকে পৃথিবীতে বৃষ্টি পড়ে।

বজ্র পড়বার সময় এখনও কেউ জৈমিনি মুণির নাম করে। তাঁর নাম করলে নাকি বজ্রের ভয় থাকে না।

ভূমিকম্প সম্বন্ধে লোকে বিশ্বাস করত যে, পৃথিবী বাসুকির হাজার ফণার উপর আছে। যখন সে ফণা বদলায়, তখন পৃথিবী কেঁপে ওঠে।

জীবজন্তু সম্বন্ধে অনেক সংস্কার আগেকার লোকদের ছিল। বাঘ ও বিড়াল দেখতে প্রায় একরূপ। তাই তারা মনে করত, বিড়াল বাঘের মাসী। বাঘিনী আঁতুড় হ'লে বিড়াল মানুষের বাড়ীতে আগুন নিতে এসেছিল। মাছের কাঁটাকুটা খেয়ে সে এমন ভুলে গেল যে, মানুষের বাড়ীতেই রয়ে গেল।

কাঠবিড়ালীর গায় ডোরা দাগ কেন? সে রামচন্দ্রের জ্ঞান সমুদ্রে সাঁকো বাঁধতে সাহায্য করেছিল। তাই তিনি আহ্লাদ ক'রে তার গায় হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর আঙ্গুলের দাগ আজও কাঠবিড়ালীর গায় রয়ে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গে যাকে বলা হয় 'চোখ গেল পাখী' পূর্ববঙ্গে তাকে বলে 'চৈতার বউ'। সে এক গেরস্তের বউ ছিল। পরে কি করে পাখী হয়ে গেল তার এক রূপকথা আছে।

বিড়ালকে মারতে নেই। কেননা সে ষষ্ঠী দেবীর বাহন।

বাল্লু-সাপ মারলে অমঙ্গল হয়।

কাকগুলো নাকি দৈবজ্ঞ। কাকের ডাক থেকে বানারূপ ভবিষ্যৎ গণনা করা হতো। জ্যোতিষ-রত্নাকরে আছে—

ক ক কল্যাণলাভ।

কঃ কঃ রাজোপদ্রব।

করকং করকং বন্ধুজনের সাক্ষাৎ

কেতং কেতং রত্নহানি। ইত্যাদি।

রাত্রিকালে কাকের ডাক ঘোর অমঙ্গল-সূচক বলে মনে করা হ'ত। কাকচরিত্র ব'লে একখানি বইও লেখা হয়েছিল। খনার জিব কেটে বরাহ লুকিয়ে রেখেছিলেন। টিকটিকি তাই খেয়ে ফেলে। সেই থেকে সে দৈবজ্ঞ হয়ে গেছে। খনার বচনে আছে—

উত্তরে টিকটিকি হাঁচি স্ত্রীলাভ কারণ।

ঈশানে হইলে মৃত্যু কে করে বারণ॥

কথা বলবার সময় টিকটিকি ডাকলে, লোকে বলে 'ঠিক, ঠিক'। সে যেন কথার সায দেয়।

বছরের কয়েক মাস চিল দেখতে পাওয়া যায় না। লোকে মনে করত এর রাবণের চিতায় কাঠ দিতে দক্ষিণে লঙ্কায় চলে যায়। রাবণের চিতা নাকি এখনও জ্বলছে।

বুন পায়রা ঘরে বাসা বাঁধলে সৌভাগ্যের সূচনা করে। এ জন্তু কথায় বলে ‘স্বপ্নের পায়রা’।

শঙ্খচিল মঙ্গল সূচনা করে। এজন্তু কেউ তাকে ‘মা শঙ্খেশ্বরী’ বলে নমস্কার করে।

কোকিল কাকের বাসায় গিয়ে ডিম পাড়ে। কাক সেই ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা তোলে। এই জন্তু কথায় বলে, ‘কাকের বাসায় যেন কোকিলের ছানা।’ জন্তুদের মধ্যে শিরাল খুব চালাক। এইজন্তু তার নাম ‘শিবরাম পণ্ডিত।’ পাখীদের রাজা হচ্ছে ফিঙে; পূর্ববঙ্গে একে বলে ফেচুয়া। কি ক’রে সে রাজা হ’ল তার এক রূপকথা আছে।

রাত্রিতে বাঘ ও সাপের নাম করতে নাই। নাম করলে তারা আসে।

কুকুর মাটির পাত্র চাটলে তা অপবিত্র হ’য়ে যায়। এজন্তু তা ফেলে দিতে হয়। পাগলা কুকুরের লাল বিবাক্ত। তার থেকে সাবধান হবার জন্তে বোধ হয় এই আচার প্রচলিত হয়েছে।

বিড়ালের এঁটো খেলে হাঁপানি রোগ হয়।

চকাচকী দিনে একসঙ্গে থাকে। রাত হ’লে তা’রা আলাদা হয়ে যায়।

নেউল সাপের শত্রু আর সাপের কামড়ের ওষুধ সে জানে। এই জন্তু নেউলকে বেজী অর্থাৎ বৈয় বলা হয়।

অতি পূর্বকালে অন্ততঃ বার হাজার বৎসর পূর্বে যখন হিন্দু-ইউরোপীয় জাতি এক সঙ্গে বাস করত, তখন থেকে এ পর্যন্ত প্রেতাশ্রায় বিশ্বাস চলে আসছে। পুনর্জন্মে বিশ্বাস ভারতীয় আর্ষদের বিশেষ বিশ্বাস। সম্ভবতঃ তাঁরা এদেশের আদিম জাতিদের থেকে এই বিশ্বাস নিয়েছেন। কিন্তু ভূত, প্রেত, শাখচুম্বী, ব্রহ্মদৈত্য, নামদো, কন্ধকাটা, আলেয়া, নিশি-এ সমস্ত বিশ্বাস বৈদিক আর্ষদের মধ্যে ছিল না। শিক্ষার সঙ্গে এ সমস্ত বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে আসছে। তবুও যারা মুখে বিশ্বাস করেন না বলেন, অন্ধকার মাঠে ঘাটে, বিশেষ ক’রে

শ্মশানে চলতে গেলে তাঁদেরও কি একটা অজানা ভয়ে বুক ছুঁকছুঁক করতে থাকে : নিশি রাত্রিতে ডাকে। সে একবার মাত্র ডাকে। এই জন্ত সাধারণ লোক রাত্রে এক ডাকে জবাব দেয় না। তিনবার ডাকলে, তবে সে জবাব দেয়।

এখনও অনেকে শুভাশুভ স্বপ্নে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস অতি প্রাচীন এবং সকল জাতির মধ্যেই দেখা যায়। ঋগ্বেদের একটি সূক্তে (১০।১৬৪) দুঃস্বপ্নের দেবতার স্তব আছে। রামায়ণে (২।৬৯) দেখতে পাই ভরত দুঃস্বপ্ন দেখে বলেছিলেন—

“নরো যানেন যঃ স্বপ্নে খরযুক্তেন বাতি হি।

অচিরাৎ তস্মাৎ ধূমাগ্রং চিতায়াং সম্প্রদৃশ্যতে ॥”

“যদি কোন লোককে স্বপ্নে গাধার গাড়ীতে যেতে দেখা যায়, তবে শীঘ্রই তার চিতায় ধোঁয়া উঠতে দেখা যাবে।”

শুভাশুভ দিন তিথি নক্ষত্রে বিশ্বাস পাঞ্জির প্রত্যেক পাতায় পাওয়া যাবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানের পূর্বে এইগুলি নিয়েই জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা ছিল। এ সমস্তকে বলা হয় ফলিত জ্যোতিষ। জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত এই সমস্ত বিশ্বাস দূর হবার নয়। যদিও আমাদের হাশুরসিক কবি ঠাট্টা ক’রে বলে গেছেন—

“ভুলেও যেন জন্মে না কেউ বিষুৎবারের বারবেলা,

জন্মাও যদি পারবেনাক সইতে কভু তার ঠেলা।”

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

জ্যোতিষে বিশ্বাসের ন্যায় তুলন্ব বা স্থলক্ষণে বিশ্বাসও এক সময় সাধারণের মধ্যে ছিল। রামায়ণে দেখি, যখন রামচন্দ্র যুগরূপী মারীচকে মেরে কুটরে ফিরছেন তখন শিয়াল তাঁর পিছে ডেকেছিল আর পশুপক্ষী তাঁর বাঁ দিকে বিকট চীৎকার ক’রেছিল। এতে ক’রে তিনি সীতার অমঙ্গল আশঙ্কা করেছিলেন। ফলেও তাই হয়েছিল।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলে দেখি রাজা দুষ্যন্ত নিজের বাহুর স্পন্দন থেকে মনে বিশ্বাস ক’রেছিলেন তাঁর সুন্দরী স্ত্রীলাভ হবে—

“শান্তমিদমাশ্রমপদং ক্ষুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্ত।

অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্বত্র ॥”



ফলে তিনি শকুন্তলাকে পেয়েছিলেন। সংস্কৃতেও একটা বচন আছে—

“বামেতর বাহুস্পন্দো বরস্ত্রীলাভসূচকঃ ॥”

ডাকের বচনে আছে—

শূন্য কলসী শুকনা না।  
শুকনা ডালে ডাকে কা ॥  
যদি দেখ মাকুন্দ ধোপা।  
এক পাও না বাড়াও বাপা।  
ডাক বলে এরেও ঠেলি।  
সামনে যদি না দেখি তেলি ॥

বড়ুচণ্ডীদাসের পদে দেখি শ্রীমতী রাধিকা নিজের দ্বন্দ্বদৃষ্টের জ্ঞান  
আক্ষেপ করে বলছেন—

কোণ অসুভ খনে পাতা বাঢ়াইলোঁ।  
হাঁছী জিঠী আয়র উবাঁট না মানিলোঁ ॥  
শুন কলসী লই সখি আগে জাএ।  
বাওঁর শিয়াল মোর ডাহিনে জাএ ॥  
কথোদূর পথে মৌ দেখিলোঁ সগুণী।  
হাতে খাপর ভিখ মাঙ্গে এ যোগিনী ॥  
কান্ধে কুণ্ডল লজ্জা তেলী আগে জাএ।  
সুখান ডালত বসি কাক কাটে রাএ ॥  
(শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, ৩১৮ পৃঃ)

সাধারণের কাছে হাঁচিটা উপেক্ষার জিনিস ছিল না। খনার বচনে  
পাই—

“দিকের নির্ণয় করি বুঝি সুবুদ্ধি।  
উর্দ্ধভাগে হৈলে ধন ভোগকার্য্য সিদ্ধি ॥  
পূর্বদিকে অগ্নিকোণে হৈলে ভয় হয়।  
দক্ষিণেতে অগ্নিভয় জানিহ নিশ্চয় ॥

নৈশ্বৰ্ণ্যে কলহলাভ পশ্চিমেতে ভাব ।

বায়ুকোণে নববস্ত্র গন্ধ জয়লাভ ॥”

এখনও বোধ হয় অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে এর কতক বিশ্বাস রয়ে গেছে ।

কতকগুলি কাজে চুরি বদনাম হয়, এইরূপ বিশ্বাস ছিল । বড়চণ্ডী-দাসের পদে দেখি রাধিকা আক্ষেপ ক’রে বলছেন—

ভাদর মাসের তিথি চতুর্থীর রাতি ।

জল মাঝে দেখিলেঁ মো কি নিশাপতী ॥

পূর্ণ কলসে কিবা ভরিলেঁ হাতে ।

যে কারণে বাঁশী চুরী দোষনি জগন্নাথে ॥

.... ...

গুরুর আসনে কিবা চাপিঅঁ বসিলে ।

জলের আখর কিবা ভূমিতে লেখিলেঁ ।

খণ্ডবিচনীৰ কিবা বাঅ তুলী লৈলেঁ তাএ ॥

তে কারণে কাহাঞিঁ বাঁশী চুরী দোষাএ ॥

( শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ৩২১ পৃঃ )

এরূপ বিশ্বাস আজকাল নেই বললেই চলে । কিন্তু একেবারেই যে লোপ পেয়েছে, সে কথা জোর ক’রে বলা চলে না ।

খাড়াখাড়া বিচার হিন্দু, ইহুদী ও মুসলমান ধর্মে আছে । তার অতিরিক্ত তিথিবিশেষে বেগুন, মূলা, পটল প্রভৃতি সুখাও অখাও হয়, পাঁজিতে এরূপ দেখা যায় । সাধারণে মানুষ বা না মানুষ, টোলের পণ্ডিতেরা এখনও এসমস্তকে বেদবাক্যতুল্য মনে ক’রে থাকেন । কেউ কেউ আবার বিরুদ্ধ ভোজনে বিশ্বাস করে । এই কারণে তারা কিছুতেই হুধের সঙ্গে নুন খাবে না । চিকিৎসকেরা না বললেও এরা বিশ্বাস করে যে, বিরুদ্ধভোজনে কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ হয় ।

যাহুমন্ত্র, বাড়ফুঁকে বিশ্বাস খুব পুরানো । ঋগ্বেদে ( ১০।৯৭ ; ১৩৭ ; ১৬১ ; ১৬৩ ) এর প্রমাণ আছে । অথর্ববেদ এই রূপ মন্ত্রে বোঝাই বল্লৈই চলে । ঋগ্বেদে ( ১০।১৪৫ ; ১৫৯ ) সতীনের উপর প্রভুহলাভের মন্ত্র আছে ।

এখনও অশিক্ষিত লোক এই সমস্ত ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস করে। বিশেষ করে সাপে-কাটা রোগীর জন্তে ওয়া! ডেকে না ঝাড়িয়ে কেউ আশ্বস্ত হতে পারে না। চোর ধরবার জন্ত বাটিচালা, নলচালা প্রভৃতি এখনও অশিক্ষিত সমাজে কিছু পরিমাণে চলিত আছে। তাদের মধ্যে এখনও কেউ কেউ ডাইনীতে বিশ্বাস করে। বিলাতে এক সময়ে ডাইনীদের পুড়িয়ে মারা হত।

কারও কারও পচা, মরণচাঁদ, গুইয়া ইত্যাদি বিক্রী নাম গুনতে পাওয়া যায়। যে সব মায়ের ছেলে আঁতুড়ে মারা যায়, তাদের ছেলেদের নাকি বিক্রী নাম রাখলে যমে ছোঁয় না। তাই এই রকম নামকরণ করা হয়। এই রকম মায়ের ছেলে হলে কখন কখন কড়ি নিয়ে দাইয়ের কাছে ছেলে বেচা হয়। আসলে বেচা নয়, কেবল যমকে ফাঁকি দেবার জন্তে বেচা। এই সকল ছেলের নাম হয় এককড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, সাতকড়ি ইত্যাদি।

সন্ধান করলে এই রকম অনেক বিশ্বাস ও সংস্কার আবিষ্কার করতে পারা যায়। সূর্যের আলোয় যেমন আঁধার দূরে পালায়, বিজ্ঞানের প্রভাবে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূরে যাচ্ছে। নিশ্চয় পঞ্চাশ বৎসর আগে যে বাংলা ছিল, আজ আর সে বাংলা নেই। সমস্ত ছুনিয়া সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। কিন্তু নৃতত্ত্বে (Anthropologyতে) এই সমস্ত সংস্কার ও বিশ্বাসের যথেষ্ট মূল্য আছে। এগুলি Folklore বা লোক-সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত। ইউরোপ ও আমেরিকায় Folklore Society দেশ-বিদেশের বিশ্বাস ও সংস্কার যত্ন করে সংগ্রহ করেছেন এবং করছেন। আমাদের এদেশেও এর প্রয়োজন আছে। হয়ত আর পঞ্চাশ বৎসর পরে এগুলির সন্ধান পাওয়া ভার হবে। বিজ্ঞান কোন জিনিসকেই সামান্য ব'লে উপেক্ষা করে না—

“যেখানে দেখিবে ছাই,

উড়াইয়া দেখ ভাই,

পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।”



# স্পেন বিজয়-কাব্যঃ ইসমাইল হোসেন সিরাজী মুস্তাফা নূর উল হুসলায়

---

॥ একটি কাব্য পাঠ ॥

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রণীত ‘স্পেন বিজয়-কাব্য’ প্রকাশিত হয় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে। প্রথম সংস্করণের আখ্যা-পত্রে মুদ্রিত আছে—স্পেন বিজয়-কাব্য। গাজী সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। প্রথম সংস্করণ। সেপ্টেম্বর, ১৯১৪ খৃঃ অঃ। কলিকাতা, ৫১।২ সুকীয়া ষ্ট্রীট, মণিকা প্রেসে শ্রী হরিচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য ৮০ বার আনা।

বইটি ইদানীং বিশেষ দেখা যায় না। প্রথম সংস্করণের পর নতুন করে ফের মুদ্রিত হয়েছে কিনা, আমাদের জানা নেই। সরকার কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ ছাড়া পুনর্মুদ্রণের সম্ভাবনাও যে আছে, মনে হয় না। আশংকা হচ্ছে, সিরাজী সাহেবের এ সাহিত্য কীর্তিটি ক্রমেই একদিন বিস্মরণের আড়ালে হারিয়ে যাবে। এমনটি আরো হয়েছে।

গত শতকের শেষের দিকে (১৮৮০ খৃষ্টাব্দে) পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ শহরে ‘স্পেন বিজয়-কাব্য’র কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজীর জন্ম। বাংলা দেশের আকাশে বাতাসে তখন মুসলিম পুনর্জাগরণের চাঞ্চল্য। সিরাজী সাহেবের আশৈশব শিক্ষা-দীক্ষায় এ আন্দোলনের প্রভাব স্পষ্টতর এবং গভীরতর।

ঐতিহ্যচেতনার উজ্জল একটি পরিবেশে তিনি মানুষ হয়ে ওঠেন। মুসলমানদের অতীত কী মহান এবং কী গৌরবময় ছিল, শিক্ষায় সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে বিজ্ঞানে, শৌর্যে বীর্যে তারা কী বিস্ময়কর ইতিহাসের সৃষ্টি করেছিলেন

—মাতৃকণ্ঠে শ্রুত এ সব ইতিহাস কাহিনী শিশু কবির শৈশবের রোমাঞ্চ ভরা দিন আর স্বপ্নভরা রাতগুলোকে রামধনুরাংগা করে রাখত। এর প্রভাবে গঠিত এবং পরিচালিত হয়েছে তাঁর পরবর্তী জীবন। তাঁর কাব্য-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও এ প্রভাব সহজেই লক্ষণীয়।

বাংলা সাহিত্য এবং ইসলামী ঐতিহ্য সম্পর্কে উৎসাহ এবং ঔৎসুক্য তাঁর ছাত্র জীবন থেকেই লক্ষ্য করা যায়। পাঠ্য পুস্তকের বাইরে বাংলা সাহিত্য অধ্যয়নে এবং অনুশীলনে তাঁর অধিকাংশ সময় কাটত। কাব্যের ক্ষেত্রে মধুসূদনের ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’, হেমচন্দ্রের ‘বৃত্ত সংহার’, ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’, ‘বিদ্যাসুন্দর’ এবং গদ্যের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষরকুমার দত্ত, কালী প্রসন্ন কাব্যবিশারদ, পণ্ডিত রেরাজ উদ্দিন—এঁদের রচনা ছাত্র ইসমাইল হোসেন সিরাজীর নিয়ত এবং অবশ্য পাঠ্য ছিল। সংগে সংগে ‘পুথি সাহিত্য’ও পড়া চলত সমান উৎসাহে। এই ভাবে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা এবং কাব্য ও গদ্য সাহিত্যের গঠন-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্বচ্ছ চেতনা তাঁর গড়ে উঠে। ভবিষ্যতের সাহিত্যিক সিরাজীর গোড়াপত্তন লক্ষ্য করি তাঁর এই ছাত্রজীবনেই।

ইসলামী ঐতিহ্য এবং জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে মুসলমানদের সচেতন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশের একটা জোরার আসে সেই সময়ে—‘সুধাকর’, ‘মিহির’, ‘সুলতান’, ‘ইসলাম প্রচারক’ বাংলার মুসলিম মানসে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এ সব পত্র-পত্রিকা পাঠ সিরাজী সাহেবের কিশোর মনে রেনেসাঁ-চেতনার সূত্রপাত করে। ছাত্রজীবনেই আবার লক্ষ্য করছি, উক্ত পত্র-পত্রিকার তিনি প্রায় নিয়মিত লেখক হয়ে উঠেছেন।

তাঁর এ বয়েসের পাঠ্য তালিকার উল্লেখযোগ্য আর কয়েকটি পুস্তক হচ্ছে সৈয়দ আমীর আলি রচিত A short History of the Sarasene এবং Preaching of Islam, W. W. Hunter রচিত Indian Mussalman এবং সৈয়দ জামাল উদ্দিন আফগানীর জীবন চরিত। বস্তুতঃ এই বইগুলি এবং বিশেষ করে সৈয়দ জামাল উদ্দিন আফগানীর জীবন চরিত পাঠ সিরাজী সাহেবের চিন্তাধারা, উদ্দেশ্য, আদর্শ এবং সৃষ্টিমানস গঠনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে।

এ ভাবে লক্ষ্য করা যাবে পরবর্তী কালে যে ইসমাইল হোসেন সিরাজী ‘‘অনল প্রবাহ’’ ‘স্পেন বিজয়-কাব্য’ রচনা করছেন, বলকান যুদ্ধ উপলক্ষ্যে তুরস্কে গমন করেছেন, গিলাফত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছেন এবং মুসলিম জাগরণের বাণী প্রচার করবার জন্তে সারা বাংলা দেশে বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছেন, পত্র পত্রিকায় প্রবন্ধ রচনা করছেন তাঁর মনের জাগরণ হয়েছে কিশোর বয়েসেই, মানসিক গঠন প্রস্তুতির পর্ব সারা হয়েছে ছাত্রজীবনেই।

বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে সিরাজী সাহেবের কাব্য পাঠের ভূমিকা হিসেবে উপরোক্ত তথ্য জেনে রাখা একান্ত দরকার।

বাংলা ১৩০৬ সালে ( ইংরেজী ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ) প্রকাশিত হয় ইসমাইল হোসেন সিরাজীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘অনল-প্রবাহ’। প্রকাশক ছিলেন তৎকালীন মুসলিম জাগরণের অন্যতম প্রখ্যাত নেতা যশোরের মুল্লী মেহেরুল্লাহ্। বাংলা ১৩১৭ সালে এইটির পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। বলা হয়েছে, ‘অনল-প্রবাহ মুসলিম গৌরব ঘোষণার অপূর্ব গাথা।’ এ কাব্য গ্রন্থটিতে মুসলিম জাগরণের বাণী প্রচার করতে গিয়ে কবি তৎকালীন সরকারের বিচারে রাজদ্রোহের দায়ে অপরাধী প্রমাণিত হন এবং দু’বছরের জন্তে কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইতিমধ্যে তাঁর আরো কয়েকটি কবিতার বই বেরিয়েছে : উচ্ছ্বাস, উদ্বোধন, নব উদ্দীপনা। এই সব ক’টা বইয়েরি মূল বক্তব্য ‘অনল-প্রবাহে’র অনুসারী। এবং ‘অনল-প্রবাহে’র অনুরূপ মন্তব্য করা হয়েছে এই বইগুলো সম্পর্কেও, ‘মুসলিম গৌরব ঘোষণার অপূর্ব গাথা।’

সিরাজী সাহেবের দীর্ঘ ত্রিশ বছরের সাহিত্য সাধনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে মোটামুটি ভাবে ‘অনল-প্রবাহে’র বাণীরই প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যাবে প্রায় সর্বত্র।

তাঁর রচিত ( প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত ) সব শুদ্ধ ৩২ খানা গ্রন্থের ভেতরে ‘স্পেন বিজয়-কাব্য’ প্রকাশিত হয় ‘অনল-প্রবাহ’ প্রকাশের প্রায় চোদ্দ বছর পর। এবং এ কাব্য প্রকাশের দু’বছর পর প্রকাশিত হয় তাঁর ‘স্পেনীয়

‘অনল-প্রবাহ’ (১৯১৬)। খুব সংক্ষেপে মন্তব্য করা যেতে পারে, ‘অনল-প্রবাহ’ এবং ‘স্পেন বিজয়-কাব্য’র মধ্যে পার্থক্য শুধু কাব্য পরিবেশ, আঙ্গিক এবং রচনাকালের! এ ছাড়া কবির বলবার মূল কথা যা আছে, তা উভয় কাব্যেই সঙ্গতিপূর্ণ ভাবে একই।

লেখক হিসেবে সিরাজী সাহেবের পরিচিতি নেয়ার ভূমিকায় একটা কথা জ্ঞাত রাখা দরকার, সিরাজী সাহেব প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ সাহিত্য-কর্মী নন, রাজনৈতিক কর্মী, সমাজকর্মী। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য শিল্প-সৃষ্টি নয়—‘অনল-প্রবাহ’র উদ্দেশ্য পত্রে তিনি বলেছেন :

‘মোসলেমের অভ্যুত্থানে  
ইসলামের জয় গানে  
আবার লভুক বিশ্ব নূতন জীবন।’

... ..

‘জাগাতে অতীত স্মৃতি  
জাগাতে জাতীয় প্রীতি  
‘অনল-প্রবাহ’খানি করিয়া রচন ;  
... ..

‘অনল-প্রবাহ খানি’ ‘রচনের’ যে উদ্দেশ্য, প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্যই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে তাঁর সমস্ত কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস রচনায়। ‘স্পেন বিজয়-কাব্য’ পাঠ করেও আমরা এই সত্যেরি সম্মুখীন হব।

মৃতকল্প মুসলমান সমাজকে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে ‘শিল্প’ রচনার চাইতে ‘বক্তৃতা’ রচনাকেই তিনি সক্রিয়তর হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। রাজনৈতিক আর সামাজিক আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে, নবজাগরণ-মন্ত্রের উদ্গাতা হিসেবে তাঁর এ রূপ দেখা গেছে বলবার—খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনে, স্বদেশী আন্দোলনে, সংস্কার আন্দোলনে—দেশের সর্বব্যাপক মুক্তি

আন্দোলনে। এ কারণে সাহিত্যকর্ম সব সময়েই তাঁর জীবন সাধনায় এসেছে দ্বিতীয় পরিপূরক উপাদান হিসেবে – প্রথম এবং প্রধান হিসেবে নয়। ফলে উদ্দেশ্য প্রচারের তীক্ষ্ণতা তাঁর সাহিত্যের শিল্পরসকে ছাপিয়ে গেছে বারবার।

সিরাজী সাহেবের নিজের কথায় তাঁর পরিচয় হচ্ছে :

“আমি আলীর জুলফেকার খালেদের খড়গ

তরবারি বলে আমি জিনিব হে স্বর্গ।”

“আল্লার আদেশ নীচে ধৃত মম গর্দান

সত্যের কারবালায় আমি চিরদিন কোরবান !”

তাঁর ভাষণ :

“সুদীর্ঘ অমরজনীর অবসানে উষার আলোক পূর্বগগনে ফুটিয়া উঠিতেছে।

...এই শুভ সময়ে জাগ—জাগ আমার মুসলমান ভ্রাতৃগণ, দীর্ঘ নিদ্রা পরিহার করিয়া একবার চক্ষুঃখোলন কর। উন্নতি ও সৌভাগ্যের কোন্ উন্নত স্বর্গ হইতে তোমরা কোন অন্ধকারে পতিত হইয়াছ, তাহা একবার বিবেচনা কর। পৃথিবীর সকল জাতি আপন কল্যাণ ও মুক্তির পথে ছুটিয়া চলিয়াছে ; কেবল অলস রহিয়াছে মুসলমান।” ( ১৯২৪ সালে সিরাজগঞ্জে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ )।

আল্লার আদেশে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর কর্ম এবং ধর্ম ছিল মুসলমানদের জাগ্রত করা। এই কর্ম এবং ধর্মের আদর্শই রূপ পেয়েছে তাঁর সাহিত্য প্রচেষ্টায়। ‘অনল-প্রবাহ’ সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে পাঠ করা যেতে পারে :

“কবিতাগুলি মহা ওজস্বিনী ভাষায় লিখিত। মুসলমানদের অতীত গৌরব কাহিনী জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।”

( ইসলাম প্রচারক, ৩০শে বৈশাখ, ১৩০৭ )

“অনল-প্রবাহ’ একখানি উত্তেজনামূলক পুস্তক। স্বজাতিকে সুলক্ষ্যে পরিচালিত করাই ইহার উদ্দেশ্য।”

( ইসলাম প্রচারক, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩০৯ )।



‘অনল-প্রবাহ’ রচনার প্রেরণাই কবিকে উদ্বোধিত করেছে ‘স্পেন বিজয়-কাব্য’, রচনায়। ‘অতীত স্মৃতি’ জাগ্রত ক’রে, জাতীয় শ্রীতি জাগ্রত ক’রে। স্বজাতিকে স্থলক্ষে পরিচালিত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে ‘স্পেন বিজয়-কাব্য’ও রচিত হয়েছে বললে অবাস্তব বলা হয় না।

স্পেন বিজয় কাব্যের সূচনার বন্দনা নিবেদন করতে গিয়ে কবি বলেছেন :

“গাব সে অতীত কথা, গৌরব কাহিনী

নাচাইতে মোসুেমের নিস্পন্দ ধমনী।

গাব সে দুর্মদ-বীর্য দীপ্ত উন্মাদনা,

... ..

পাপের পতন আর ধর্মের বিজয়

গাইতে বাসনা, শক্তি দেহ দয়াময়।”

‘স্পেন বিজয়-কাব্য’ রচনার উদ্দেশ্য নিছক সাহিত্য রচনা নয়, ‘মোসুেমের নিস্পন্দ ধমনী’ নাচিয়ে তোলাই হল আসল কথা। এবং কবির সংগীতের ফলে,

“সে বঙ্করে গোড়বাসী হ’ক জাগরিত।

গৌরব কাহিনী গাথা করুক স্মরণ

গঠিত করুক সবে জাতীয় জীবন।

উঠুক গগনে পুনঃ সৌভাগ্য চন্দ্রনা

মোহিত করুক বিশ্ব ইসলাম সূচনা।

( বন্দনা )

কাব্যখানি সমাপ্ত করতে গিয়ে কবি বলেছেন :

অতীতের স্মৃতি

জাগাতে হৃদয় পটে বঙ্গবাসীদের

সিরাজী গাহিলা রঙ্গে হিস্পান বিজয়।”

অতএব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কবির ‘স্পেন বিজয়-কাব্য’ রচনার মূল প্রেরণা-কেন্দ্র কোথায় ?

জাতীয় জাগরণের সূচনা-পর্বে সাহিত্য প্রচেষ্টা অবশিষ্ট প্রধানতঃ ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলকই হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে উনিশ শতকের

প্রথম এবং মধ্য যুগে প্রতিবেশী হিন্দু সাহিত্যিকদের রচনা-দৈর্ঘ্যের উল্লেখ করা যেতে পারে।

মুসলিম পুনর্জাগরণ আন্দোলনে তখন প্রেরণা জোগাত ইতিহাসের উজ্জল অতীত আর মধ্যপ্রাচ্যের তৎকালীন বর্তমান : বিশেষ করে তুরস্কের খলিফাকে কেন্দ্র করে আত্মচেতনা উদ্বুদ্ধ করবার একটি ঝোঁক ব্যাপক হয়ে পড়েছিল।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে বাধে বলকান যুদ্ধ। যুরোপে অন্তায়মান অটোম্যান সাম্রাজ্যের প্রধান তুরস্কের স্থলতানের সাথে বলকান রাষ্ট্রজোটের এ লড়াই। তুরস্কের স্থলতান ছিলেন মুসলিম জগতের খলিফা। সুতরাং মুসলমানদের ভেতরে বলকান যুদ্ধ একটা উত্তেজনা-আলোড়নের সৃষ্টি করে। নাছারা খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে ইসলামের আমিরুল মুমেনীন খলিফাকে সমর্থন করে সে আশয়ে একটা সর্বভারতীয় আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। পরবর্তীকালে এ আন্দোলন খিলাফত আন্দোলনে পরিবর্তিত হয়। বলকান যুদ্ধে তুর্কী মুসলমানদের সেবা করবার উদ্দেশ্যে ডাঃ আনসারীর নেতৃত্বে ‘অল ইণ্ডিয়া মেডিক্যাল মিশন’ গঠিত হয়েছিল। বাংলা দেশের মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ সিরাজী সাহেব এ মিশনে যোগ দিয়ে ১৯১২তে তুরস্ক গমন করেন। তুরস্ক থেকে খলিফার দেয়া গাজী উপাধি নিয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন। সেই থেকে বাংলা দেশে সিরাজী সাহেবের পরিচিতি, গাজী সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী।

তুরস্ক থেকে ফেরবার পর তাঁর কাব্যগ্রন্থ ‘স্পেন বিজয়-কাব্য।’

খৃষ্টানদের সাথে মুসলমানদের লড়াই এর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেরবার পর তাঁর এই কাব্যগ্রন্থ। এবং লক্ষ্যণীয় এই যে, ‘স্পেন বিজয়-কাব্য’ খৃষ্টান রডারিকের সাথে মুসলমান মুসা তারেকের লড়াই এবং খৃষ্টান বাহিনীর পরাজয়ের কাহিনীর উপর ভিত্তি করে এ কাব্য গড়ে উঠেছে।

কাব্য-রচনাকালের যুগ পরিবেশ এবং যুগ পটভূমি সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা কাব্যের বক্তব্য অনুধাবনে সহায়ক হয়ে থাকে। বস্তুতঃ কাব্য রচনাকালের যুগ পরিবেশ এবং পটভূমি বিষয়ে অজ্ঞানতা কাব্য উপলব্ধির পক্ষে প্রতিবন্ধকতার

সৃষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ভারতচন্দ্রের ‘অন্নদামঙ্গল’ কিংবা মধুসূদন দত্তের ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’র পাঠ, উপলব্ধি এবং আশ্বাদন কিছুতেই পূর্ণাঙ্গ হবে না, যদি না আমাদের অষ্টাদশ শতকের কৃষ্ণনগর কিংবা উনবিংশ শতকের কলকাতার জীবন সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ধারণা থাকে। উদ্দেশ্যমূলক কাব্য সম্পর্কে একথা আরো বেশি করে প্রযোজ্য।

অতএব ‘স্পেন বিজয়-কাব্য’ পাঠ প্রসঙ্গে আমরা তৎকালীন যুগ পরিবেশ সম্পর্কে অন্ততঃ কিছু মাত্রায় সচেতন হ’তে পারি।

উনিশ শতকের শেষার্ধ্বে লক্ষ্য করা যায় মুসলিম সমাজের চিন্তানায়করা ইংরেজী শিক্ষার দিকে এগিয়ে আসছেন। বিশেষ করে নবাব আবদুল লতিফের নেতৃত্বে, সৈয়দ আনীর আলীর প্রচেষ্টার ইংরেজী শিক্ষা এবং যুরোপীয় বিজ্ঞান, সংস্কৃতি সম্পর্কে মুসলিম সমাজ উৎসাহী হয়ে উঠছে।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে Statesman পত্রিকায় লেখা হচ্ছে : ‘মুসলমানদের মধ্যে এক সময় যে গোড়ামি দেখা গিয়েছিল এখন আর তা নেই। বর্তমানে বাংলার মুসলমানেরা উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিশেষ উদগ্রীব।’

মৃতকল্প জাতি তার নব জাগরণের সূচনার সর্বপ্রথম দৃষ্টি প্রসারিত করে তার অতীতের দিকে। সন্ধান করে অতীত থেকে প্রেরণা আহ্বান করবার, শক্তি সঞ্চয় করবার কিছু আছে কিনা। জাগরণের মুহূর্তে জাতিকে আত্মসচেতন করে তার গৌরবময় অতীতের পটে আত্মানুসন্ধান। রেনেসাঁর সূত্রপাতে যুরোপে যেমনটি হয়েছিল, বাংলার মুসলমানদের ক্ষেত্রেও তার অন্তর্ভুক্তি হয়নি।

ইসলামের-গৌরব-ঐশ্বর্য সমৃদ্ধ অতীতকে স্মরণ করে মুসলিম জাগরণের আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে গত শতকের শেষ পাদে।

সমাজ সংস্কার, ধর্ম সংস্কার, গ্রন্থ প্রণয়ন এবং পত্র পত্রিকা প্রকাশ—সর্বক্ষেত্রেই লক্ষ্যণীয় যে, জাগরণের মন্ত্র রচনা করা হচ্ছে অতীতের সঞ্চয় থেকে বাণী আহরণ করে।

পণ্ডিত রেয়ারজউদ্দিন মাহহাদী, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ, মৌলভী মেয়রাজউদ্দিন আহম্মদ, শেখ আবদুর রহিম, মোজাম্মেল হক, মীর মোশাররফ

হোসেন প্রমুখ সবার প্রচেষ্টাতেই ঐ লক্ষণটি বর্তমান। এবং সমাজ বিজ্ঞানের সূত্রে এমনটি হতে বাধ্য।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রাজসাহী শহরে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হচ্ছে—নাম ‘আজুমানে হেমায়েতে এসলাম’; উদ্দেশ্যাবলী :

“এ সভার উদ্দেশ্য অতীব মহৎ ও গুরুতর। (১) কি উপায়ে ধর্মের উন্নতি হইবে, (২) কি উপায়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের (কওমের) লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া আসিবে, .... (৪) কি উপায়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচার আলোক প্রবেশ করিবে ও মুসলমান বালকদিগকে বিদ্যাশিক্ষায় সাহায্য করা যাইবে ...।”

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বেরুচ্ছে সাময়িক পত্র ‘হাফেজ’। ‘হাফেজে’র প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকের মন্তব্য রচিত হচ্ছে :

“হে সর্বান্তর্যামিন ! হাফেজ সেই ভোগ বিলাস স্খাভিলাষী নিদ্রিত বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে তাঁহাদের পূর্ব পুরুষদিগের অতীত গৌরব ও ধর্মভক্তি কাহিনী এবং পবিত্র ধর্মের রীতিনীতি শুনাইয়া জাগরিত করিবার জন্য তোমারই আশ্রয়ে ও অনুগ্রহে আজ বঙ্গের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইল।”

‘নূর-অল-ইমান’ মাসিক পত্র প্রথম সংখ্যায় ( ১৯০০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ) উদ্দেশ্য এবং তাৎপর্য লিখছেন :

“পূর্বকালের মুসলমানদিগের কি কি সদগুণ ছিল? কোন কোন গুণের জন্য তাঁহারা জগতের পূজা পাইয়াছেন নূর-অল-ইমান তাহা সকলকে দেখাইয়া দিবেন।”

আর ইসমাইল হোসেন সিরাজী লিখছেন :

“ইতিহাস মুসলমান জাতির প্রাণ স্বরূপ। জাতীয় ইতিহাস এবং মহাপুরুষদিগের জীবনী ব্যতীত মুসলমানদিগের মৃতদেহে শক্তি সঞ্চারের অন্য উপায় নাই।” —(‘আল্ ইসলাম’ ১ম সংখ্যা, ১৯১০ খৃঃ অঃ)

এই যুগ পটভূমিকাতে রচিত হয় ‘স্পেন বিজয়-কাব্য’। এবং কাব্যটি পাঠ করে সংগত ভাবেই বলা যেতে পারে, ওপরে আলোচিত যুগ-বাণীই রূপ পেয়েছে এ কাব্যে। ‘স্পেন বিজয়-কাব্য’র বন্দনা অংশেই প্রতিধ্বনিত হয়েছে যুগের আকাংখা :

“গৌরব কাহিনী গাথা করুক স্মরণ  
গঠিত করুক সবে জাতীয় জীবন।  
উঠুক গগনে পুনঃ সৌভাগ্য চন্দ্রমা  
মোহিত করুক বিশ্ব ইসলাম-স্বপ্নমা।”

কাব্যের কাহিনী-অংশ ইতিহাস থেকে আহরিত মুসলিম-ঐষ্টান সংগ্রামে মুসলিম বিজয় কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। শেষ সর্গে বর্ণিত হচ্ছে :

“তারেখ আপনি উঠি দুর্গ-শীর্ষ দেশে  
ক্রুস-সমষ্টিত কেতু নিক্ষেপি ভূতলে  
স্বহস্তে স্থাপিলা তথা ইসলাম-কেতন,  
‘কলেমা’ অঙ্কিত চারু বাজ পক্ষী আঁকা।  
আল্লাহো আকবর রবে পুনঃ জয়ধ্বনি  
উঠিল বিদারি বোম।”

‘স্পেন বিজয়-কাব্য’ প্রকাশের (১৯১৪ খৃষ্টাব্দে) তেপান বৎসর আগে প্রকাশিত হয় মধুসূদনের ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’ (১৮৬১ খৃষ্টাব্দ),—বিহারীলালের ‘সারদা মঙ্গল’র প্রকাশ কাল ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ এবং রবীন্দ্রনাথের ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ লেখা হচ্ছে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে। আধুনিক বাংলা কাব্য পরিক্রমায় এই তিনটি সংবাদ ঐতিহাসিক গুরুত্ব চিহ্নিত। এবং ‘স্পেন বিজয়-কাব্য’র কাব্য-পটভূমিকা ও কাব্যপরিবেশ সম্পর্কে আলোচনায় উক্ত তথ্য প্রয়োজনীয় আলোকসম্পাত করবে। কাব্য বিচারে এ ধরনের তথ্য অনুসরণ বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি বলে গৃহীত। ‘স্পেন বিজয়-কাব্য’ বিচারের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতি পাঠক-সমালোচকদের সহায়তা করবে।

বাংলা কাব্যে আধুনিকতার সিংহদ্বার উন্মোচন করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। মধুসূদনকে বলা হল আধুনিক বাংলা কাব্যধারার ভগীরথ, আর ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’ তাঁর শংখধ্বনি। আধুনিক বাঙালী জীবনের চক্ষুরুন্মীলন হয় উনবিংশ শতকের সূর্যালোকে। এ জীবনের পরিচয়, এক কথায় যাকে বলা যেতে পারে, ‘Revaluation of values’ নতুন আলোকে নতুন জীবন সাধনা কাব্যের অংগনেও ফেলে তার প্রতিভাস। তাই গত শতকের বাংলা কাব্যে আধুনিকতা ‘Revaluation of values’ এই সংগাতেই চিহ্নিত। জীবনের ক্ষেত্রে মূল্যমান ও মূল্যবোধের নতুনতর এই অর্থ-সত্যের সাথে প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটায় ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’—সময়টা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ; এই বছরেই ভূমিষ্ঠ হন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাংলা কাব্যে মধুসূদন নতুন রীতির সঞ্চার করলেন,—বিদ্রোহ আর গতিবেগ। তাঁর বীণায় ধ্বনিত হ’ল এক নতুন সুর, যাকে বলা যেতে পারে ব্যক্তি সচেতনতার সুর। তাঁর কাব্যে প্রথম বাণীরূপ লাভ করল আধুনিক কাব্যের মূল পরিচিতি : ব্যক্তিস্বাভা ও বৃদ্ধিবিলাস। এবং মধুসূদনের কাছেই ‘আধুনিকতা’র নতুন বাণীমন্ত্রে দীক্ষা লাভ ক’রে উনবিংশ শতকের উত্তরার্ধে বাংলা কাব্য মুখর হয়ে ওঠে।

এরপর আবির্ভাব নির্জন গিরিগুহার কবি বিহারীলালের। কাব্যের আঙ্গিকে এবং বিশেষ করে বক্তব্য ও বলার ঢঙে তিনি একেবারে নতুন রীতির প্রবর্তন করলেন—

“সর্বদাই হু হু করে মন,

বিশ্ব যেন মরুর মতন;”

মানব হৃদয়ের অন্তর্লোকের কথা এমন ‘সহজ সুরে নিবেদন’ ইতিপূর্বে আর কেউ করেন নি। ‘নিভূতে বসিয়া শোভের মনের কথা’ ব্যক্ত করাতেই বেজে উঠল আধুনিক লিরিকের সুর। বিহারীলালের কাব্যে আত্মকেন্দ্রিক সুরের সহজ এবং মন্ময় প্রকাশ উন্মুক্ত করে দিল নতুন দিগন্তের সম্ভাবনা—

“আহা এই মুখ খানি  
 প্রেম মাথা মুখ খানি  
 ত্রিলোক-সৌন্দর্য্য আনি কে দিল আমার।”

মন্ময় ভাবগ্রস্ত কবিমনের এই জিজ্ঞাসা, ব্যক্তি-সচেতন কবির আত্ম-কেন্দ্রিক সুরের এই সংগীতই উনিশ শতকের নতুন বাংলা কাব্যের মর্মকথা।

এবং এই জিজ্ঞাসা, এই নতুন সংগীত তত্ত্বামুক্তি ঘটাল আরেক লিরিক কবির—আধুনিক বাংলা কবিতার তিনি মহত্তম এবং পূর্ণতম পরিণতি—১৮৮৩ সাল, কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ রচনা করছেন ‘নির্ঝর’রের স্বপ্নভঙ্গ,

“... ..

ওরে প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া রাখিতে নারি।

... ..

বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায় কোথায় কারার দ্বার।”

কবির নিজের ‘প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ’ প্রকাশ করবার এই যে আকুলতা, এই উৎসকেন্দ্রেই অবস্থান আধুনিক বাংলা কাব্যের প্রাণ-ভ্রমরের। এবং উদ্ধৃত দ্বিতীয় চরণে মুখর যে না-পাওয়ার সুর, অতৃপ্তির সুর, এ সুর উনিশ-বিশ শতকের আধুনিক কাব্য সাহিত্যের স্পষ্টতম অভিজ্ঞান। নতুন আলোক রশ্মির সন্ধানে মানুষ সূর্য্যতোরণের পথ হাতড়ে ফিরছে, কিন্তু সে পথ কোথায়? তাই বর্তমানের মানবাত্মার করুণ প্রার্থনা :

“Please, will you  
 Give us a Light ?  
 Light  
 Light.” (T. S. Eliot)

বাংলা কাব্যের এই পটভূমি এবং পরিবেশে বিধ্বত হয়েছেন আধুনিক যুগের কবি সম্প্রদায়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ, বুদ্ধিবিলাস, আত্মকেন্দ্রিক মন্ময়তা এবং অতৃপ্তি আধুনিক কবিতার মোটামুটি এই কয়েকটা লক্ষণে তাঁদের কাব্য প্রয়াস ভাস্বর।

এ প্রসঙ্গে আধুনিক মুসলিম কবিদের কথা বিশেষ করে বলবার তেমন কিছু নেই। কেননা, কাজী নজরুল ইসলাম, জুমায়েন কবীর, শাহাদৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, সূফিয়া কামাল এঁদের সবারি কাব্য সাধনা সম্পর্কে উপরোক্ত উক্তি একান্ত ভাবেই প্রযোজ্য—আর তা'ছাড়া, যুগ-প্রভাব সর্বব্যাপী এবং সর্বগ্রাসী।

তবে লক্ষণীয়, এই 'আধুনিক' যুগে, রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' রচনার পূর্বক্ষণটিতে রচিত 'স্পেন বিজয়-কাব্যে' আধুনিকতার লক্ষণ সমূহ প্রায় অনুপস্থিত। জাতীয়তাবোধের বাণী প্রচার ব্যতীত এ কাব্যে এমন লক্ষণ আর কিছু চোখে পড়ে না, যাতে করে কাব্যটিকে 'আধুনিক' লক্ষণাক্রান্ত বলা যেতে পারে। এবং এই 'জাতীয়তাবোধ'ও কী 'নতুন জাতীয়তা'? ইতিহাসের পূর্ব-গৌরব স্মরণ করে জাতীয়তাবোধের প্রেরণা লাভ করা আর উনবিংশ শতকের পাশ্চাত্য দীক্ষায় লব্ধ 'ভাশনালিজম' সম্পর্কিত চেতনা লাভ—এ দুইয়ের ভেতরে পার্থক্য ব্যাপকতর। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বণিকী সমাজ ব্যবস্থার যুগে

“অতীতের স্মৃতি

জাগাতে হৃদয় পটে বঙ্গবাসীদের

সিরাজী গাহিলা বঙ্গে হিম্পান বিজয়!”

মোটের উপর যথেষ্ট নয় এবং যুগোপযোগী নয়। মধুমদন যে 'নতুন জাতীয়তার' মন্ত্র গুনিয়েছেন অর্ধ শতাব্দী পূর্বে, প্রথম মহাযুদ্ধের আগলে কাব্য রচনা করতে গিয়েও সিরাজী সাহেব সেই মন্ত্র যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাই কবিতার ছন্দে অতীত ইতিহাস বর্ণনা করে এবং সমকালীন মুসলমানদের সে 'গৌরব-কাহিনী-গাথা' স্মরণ করবার জন্য আহ্বান জানিয়েই তাঁকে 'স্পেন বিজয়-কাব্য' রচনার দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। তাঁর কাব্য পাঠকের অন্তরে নতুন চেতনা কিংবা আধুনিক মূল্যবোধের সঞ্চার করতে পারল না।

শুধুমাত্র রচনাকালের দিক থেকেই এ কাব্য আধুনিক, ভাববস্তুর দিক থেকে নয়।

২৪৭



মোট আট সর্গে বিভক্ত মহাকাব্যের চণ্ডে রচিত ‘স্পেন বিজয়-কাব্য’। প্রারম্ভে একটি বন্দনা আছে কাব্যে মূল চরিত্র সমূহের ভেতরে স্পেনের রাজা রডারিক, কেটার রাজ কুমারী ফ্লোরিণ্ডা, কেটার অধিপতি কাউন্ট জুলিয়ান, মুসলিম জগতের খলিকার প্রতিনিধি মুসা, মুসার সেনাপতি তারেখ, তারেখ পুত্র কুমার আবদুল্লা এ কটাই মোটামুটি উল্লেখযোগ্য।

কাহিনীভাগে বলা হয়েছে :

ভূমধ্য সাগরের তীরে তরঙ্গ বিধৌত দেশ শ্যামল হিস্পান বা স্পেন ভূমি।  
দেশের রাজা পাপমতি গর্বান্ব রডারিক। কেটার রাজ্য কাউন্টকুলের দিনমণি  
জুলিয়ান। জুলিয়ান কন্যা, কেটা-রাজকুমারী ফ্লোরিণ্ডা।

“পঞ্চদশ বয়ঃক্রম, নবীন যৌবনে  
বিমল সৌন্দর্যরাশি উঠিছে ফুটিয়া”

বাল্যকাল হ’তে পিতা অধ্যয়ন, রাজনীতি জ্ঞান আহরণ, আদব-কায়দা শিক্ষা  
এবং চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে জনক জুলিয়ান কন্যা ফ্লোরিণ্ডাকে রডারিকের  
অন্তঃপুরে রেখেছিলেন। কিন্তু পামণ্ড কামুক রাজার অন্তরে পাপ প্রবেশ করে  
তাকে মোহমুগ্ধ করে। ক্রমে ক্রমে ফ্লোরিণ্ডাকে মদাসক্ত করে একদিন রাজা  
তার কোর্নার্য অপহরণ করলেন। সতীত্ব হারিয়ে ফ্লোরিণ্ডা উন্মাদপ্রায় হয়ে  
ওঠে। তার শপথ—

“রে পামণ্ড রডারিক! কামুক শয়তান  
ছুরিকা আঘাতে তোর ও পাপ পরাণ  
বধিয়া এ পুর হ’তে করিব প্রস্তান,  
নিশ্চয় নিশ্চয়।”

প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে ফ্লোরিণ্ডা পিতা জুলিয়ানকে সব কিছু জানিয়ে পত্র  
পাঠালেন।

“হে বীরেন্দ্র পিতঃ!  
বারেন্দ্র-কুল-কুঞ্জর মহাশক্তি তুমি,  
দেখাও প্রচণ্ড শক্তি এ পাপ দমনে—

কালান্তক-কাল সম : ক্রুদ্ধ সিংহ তুলা  
লহ এর প্রতিচ্ছিন্না অবিলম্বে আসি।”

পরবর্তী অধ্যায়ের যবনিকা উঠেছে খলিকা-প্রতিনিধি মুসার রাজধানী  
কাররোয়ান্ নগরীতে। কেটা-অধীশ্বর বীরবর জুলিয়ান রডারিকের বিরুদ্ধে  
মুসলমানদের সাহায্য প্রার্থনা করছেন। বীরকুলকেতু মুসাকে তিনি জানানো,

“স্পেনের দুর্দশা  
কি আর কহিব আমি।

... ..

রমণীয় স্পেনে আজি রাজ-অত্যাচারে  
উঠিতেছে হাহাকার ঘরে ঘরে ঘরে ;  
স্বথ শাস্তি হইয়াছে চির অন্তর্হিত।

... ..

ভূপ রডারিক  
বিলাস ব্যসনে মত্ত কানের পূজায়।

... ..

পুণ্যভূমে আজি হায় ! পাপের রাজত্ব !”

এমন কী

“ভয়া ফোরিগা মম স্বর্গের কুসুম

.... ....

কি কহিব হে বীরেন্দ্র ! পাবণ দানব  
অমূল্য সতীত্ব রত্ন ছলনা কৌশলে  
করেছে বিনষ্ট তার।

.... ....

হে বীর ! প্রতিজ্ঞা মম পাপের রাজত্ব  
রাখিব না স্পেনে আর !

হে রাজেন্দ্র ! ... ..

দক্ষ কর পাপের প্রভুহ ।”

এদিকে কিছুদিন আগে স্পেনীয় সৈন্যদল ভূমধ্য সাগরের তীরে আরব জাহাজ লুণ্ঠ করেছে। খলিফা প্রতিনিধি মুসা তার প্রতিশোধ গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন। জুলিয়ানের কথা শুনবার পর,

“তাহে তব বাক্যে

অধীর হয়েছি আমি স্পেন আক্রমণে ।

মুসা, সেনাপতি তারেখ, জুলিয়ান সকলে মিলে পরামর্শ করলেন কি করে ছুষ্ঠ রডারিককে দমন করা যাবে। স্থির হ’ল, পরের দিন সেনাপতি তারেখ অযুত সৈনিক সঙ্গে নিয়ে স্পেন আক্রমণ করবেন এবং পরে তাঁর সাহায্যের জন্য আরো অযুত সেনা পাঠানো হবে। জুলিয়ানকে মুসা জানালেন,

“বীরেন্দ্র কাউন্ট !

তোমার লাঞ্ছনা-শল্য করিতে উদ্ধার

পাপের কবল হ’তে উদ্ধারিতে স্পেনে

জীবন করিছু পণ ; রাজ্য ধন প্রাণ

ধর্মের উদ্দেশ্যে মম সদা উৎসর্গীত ।”

এইভাবে সমাপ্ত হ’ল তৃতীয় সর্গ।

প্রভাতের বর্ণনা এবং মুসলিম পক্ষের সৈন্য সজ্জার বিবরণ দিয়ে শুরু হচ্ছে চতুর্থ সর্গ। পঞ্চাশটি অর্ণবনোতে আরোহণ করে মুসলিম সৈন্যদল স্পেন আক্রমণ করতে অগ্রসর হলেন—

“অর্দ্ধচন্দ্র ব্যূহ রচি তরলী নিচয়

হিম্পানের তীর লক্ষ্যে চলিল ছুটিয়া ।”

উত্তর আফ্রিকার কূল অতিক্রম করে মরক্কোর তট হয়ে দ্বিতীয় দিবসে নৌবাহিনী প্রণালীর মধ্যপথ পর্যন্ত এগিয়েছে এমন সময় দেখা গেল সম্মুখ ও পশ্চাৎ থেকে অসংখ্য শত্রু সমরপোত মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করতে ছুটে আসছে।

“বাজিল বিঘম রণ সমুদ্রের বক্ষে  
ছুটিল বিশিখমালা উক্সা পুঞ্জ প্রায়  
রোধিয়া রবির কর।

... ..

তরীতে তরীতে ভীম বাধিল সংঘর্ষ

.... ..

মোসলেম সৈনিকগণ অমনি সহসা  
ধনুর্বাণ ত্যজি সবে কৃপাণ করেছে  
লক্ষে লক্ষে আরোহিয়া স্পেনীয় জাহাজে  
ভীষণ সংহার কার্য করিল সূচনা।”

এবং যুদ্ধাবসানে

“ধ্বংসিয়া স্পেনীয় তরী আরব বাহিনী,

.... ..

লঙ্ঘন করিল যেয়ে স্পেন উপকূলে।”

পরবর্তী সর্গের পরিচয় কবি ‘ফ্লোরিণ্ডা উদ্ধার সর্গ’ বলে নামাঙ্কিত করেছেন।  
এ সর্গের প্রারম্ভে দেখাছি, স্পেনের রাজা রডারিক রাজধানী টলিডোর  
বাইরে উত্তর প্রদেশে গেছেন কানন-বিহারে। কেটা থেকে স্ভূত্যা শেলী  
ফ্লোরিণ্ডার কাছে সংবাদ এনেছে,

“...আরবীর সেনা

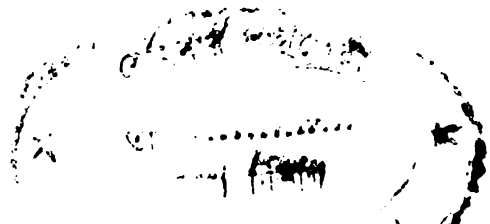
অবতীর্ণ হইয়াছে ভূমধ্যের তীরে।

পিতা তার জুলিয়ান, দলবল সহ

আছে মুর সেনাসনে, অতীব সত্বর

বাধিবে বিঘম রণ।”

এ বার্তা শ্রবণ করে কণ্ঠা পিতৃপদ দর্শন আকাংখায় ব্যাকুল হয়ে উঠল।  
আর তা ছাড়া, এ পাপ জীবনে সুখ আশা ত আর নেই, বরং জীবহিত  
হেতু অপূত দেহ সেবারতে নিয়োগ করাই শ্রেয়ঃ। সমর প্রাপ্তরে আহত



সৈনিকদের সেবা করে দক্ষ প্রাণ শীতল করা যাবে। ভৃত্য শেলী এবং সখী লীমঙের সাথে পরামর্শ করে তিনজনে মিলে একদা গভীর নিশাকালে রাজপুরী থেকে পলায়ন করল। সৈনিকের ছদ্মবেশে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে তারা দক্ষিণাভিমুখে চলল। প্রভাত হ'তেই রাজ অন্তঃপুরে প্রকাশ হয়ে পড়ল তাদের পলায়ন বার্তা। শহর কোতালার আদেশে পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সৈনিক পুরুষ তাদের ধরে অনবার জেতে পশ্চাদ্ধাবন করল। ওদিকে

“...ফ্লোরিণ্ডা সতী অতি দ্রুতগতি  
অবিশ্রান্ত ছুটাইয়া তুরঙ্গম বরে  
নানা জনপদ আর নদী গিরি বন  
এড়াইয়া বহুদূরে হ'ল উপনীত  
ভীষণ অরণ্য মাঝে।”

অরণ্যের শীতল সরসী জলে স্থখে স্নান সমাপন করে তারা স্তম্ভিত আরাম লাভ করল। এবং নিদ্রার আবেশে কাতর হয়ে ক্রমে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ল। সপ্তাহ ধরে অনুসন্ধানের পর সেই পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী সাক্ষাৎ পেল পলাতক তিনজনের—তারা তখন নিদ্রাগত। সেই অবস্থাতেই রজ্জু সংযোগে বন্দী করা হল তাদের। ফ্লোরিণ্ডার রূপ সৌন্দর্যে সৈনিক-পতি ছর্মতি রেডিস আকৃষ্ট হয়ে তার প্রেম ভিক্ষা করল। কিন্তু ফ্লোরিণ্ডা ‘ভীষ তিরস্কারে শাসিলেক রেডিসেরে’।

তারেখপুত্র বীরকুমার আবছুর নেতৃত্বে মূর সৈন্য এদিকে স্পেনের সীমান্ত গিরি দুর্গ দখল করে নিয়েছেন। যুগয়ার সন্ধানে তিনি এই অরণ্যে প্রবেশ করে রেডিসের শিবির সন্নিধানে উপস্থিত হলেন। রেডিস আরব কুমারকে দেখে তাকে বন্দী করবার উদ্যোগ করল। কেননা,

“যে হও সে হও তুমি আরব যখন  
অব্যাহতি নাহি তব।”

ফলে উভয়ের ভেতরে বাধল ভীষণ সংগ্রাম। আবছুর পঞ্চাশ সেনাসহ রেডিসকে পরাভূত করে ফ্লোরিণ্ডাকে উদ্ধার করলেন। এবং পিতামাতার নিকট কন্যাকে সমর্পণ করলেন।

পরবর্তী সর্গে রাজা রডারিকের বন বিহারের বিস্তারিত বর্ণনা।

“হেথায় হিম্পান পতি দলবল সঙ্গে  
মৃগয়ার ব্যাপদেশে বিজন কাননে  
কামের উৎসবে মত্ত অতি মনোরঞ্জে  
দিবানিশি কেটে যায় আনন্দ প্রাবনে।”

হেনকালে রাজধানী টলিডো হ’তে দূত সংবাদ আনল, কুমারী লীমগুকে  
সাথে নিয়ে কাউন্ট কত্যা ফ্লোরিগা পলায়ন করেছে ; সেনাদল মুরদের হাতে  
পরাজিত হয়েছে ; খুব শীঘ্র সৈন্য সাহায্য পাঠানো একান্ত প্রয়োজন।  
রডারিক বললেন,

“আরবীর বাড়িয়াছে বড় অভিমান  
গর্ব্ব খর্ব্ব স্থনিশ্চিত করিব বিধান।”

প্রত্যায়ে উঠে রাজা শিবির ভঙ্গ করবার আদেশ দিয়ে অশ্বারোহণে  
কাননের পথে রাজধানী অভিমুখে ফিরে চললেন। পথে এক দুর্গ দেখে  
রডারিক ভেতরে প্রবেশ করলেন। সেখানে কৌতূহল বশে মহাবীর হার্কুলিসের  
সুবর্ণ নির্মিত মায়া পেটিকা উদঘাটন করে দেখতে পেলেন একটি চর্ম খণ্ডে  
লেখা রয়েছে,

“.....ওরে দুঃসাহসি !

এই তোর অরিগণ স্পেন রাজ্য গ্রাসি !”

দেখতে দেখতে চারদিকে ভীমরণ কোলাহল উথিত হ’ল। চর্ম খণ্ডে  
চিত্রিত নানা প্রহরণধারী অগণিত সৈন্য বীরের আকার ধারণ করে রাজাকে  
হত্যা করবার উদ্দেশ্যে ঘিরে ধরল। ভয়ে রাজা মূর্ছিত বিহ্বল হয়ে পড়লেন।  
সহসা বিকট ভীম নিনাদ শ্রবণ করে আতঙ্কে কম্পিত রাজা উদ্বিগ্নে দুর্গ  
ত্যাগ করে কাননের ভেতর প্রবেশ করলেন।

“ভীষণ গর্জ্জনে দুর্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল,  
আকাশে অনল শিখা উঠিল জ্বলিয়া,  
সেই শিখা মাঝে রাজা দেখিতে পাইল

নাচিছে ফ্লোরিণ্ডা সতী অসি আফালিয়া  
বিকট চাঁৎকারে রাজা কাঁপিতে কাঁপিতে  
বিমূর্ছিত হ'য়ে হায় ! পড়িল ভূমিতে ।”

রাজধানী টলিডো নগরীতে প্রত্যাবর্তনের পর রডারিক মুরদের সাথে  
যুদ্ধে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। খৃষ্টান-মুসলমান প্রত্যক্ষ সংগ্রামে রাজকুমার  
মহীলক প্রেরিত হয়েছিলেন।

রথীন্দ্র তারেখসুত কুমার আবদুল্লাহর সাথে সম্মুখ সমরে মহীলকের পতনের  
সংবাদ পরিবেশন করে সপ্তম সর্গের সূচনা করা হয়েছে।

“রাজেন্দ্রকুল তপন দুর্দ্ধর্ষ বিক্রম  
বসিয়াছে রডারিক চারু সভাতলে  
উচ্চে রত্ন সিংহাসনে।”

যুদ্ধক্ষেত্রের সংবাদ বহন করে নিয়ে এসে দূত মহীলকের পতন বিবরণ বর্ণনা  
করছে, বীরেন্দ্র আবদুল্লা যখন কুমারের প্রতি ভীষন সংহার খড়্গ হানলেন তখন—

“হে ভূপমণি, সে ভীম প্রহারে  
“হারে। কেমনে আহা ! কহিব সে বার্তা।  
পড়িল কুমার তব অশ্বপৃষ্ঠ হ’তে—  
গিরিশৃঙ্গ হ’তে যথা পড়ে শালতরু  
ভীম বজ্র সম্প্রহারে।”

এ সংবাদ শ্রবণ করে ভূপ রডারিক মূর্ছিত হয়ে সিংহাসনের নীচে পতিত  
হলেন। সন্নিহিত ফিরে পাওয়ার পর প্রবীণ সচিব স্মৃতি সোলন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে  
বোঝালেন যে, মহাবীর মহীলক সম্মুখ সমরে পতিত হয়ে সুরপুরে গেছেন। স্পেনের  
এক গিরি চূড়া চূর্ণ হয়েছে বটে, কিন্তু শত শিখর এখনও অক্ষত অটুট রয়েছে।

“হে রাজেন্দ্র ! সেনা তব কর আয়োজন  
ফুৎকারে অরাতি দল পাইবে বিলয়।”

স্পেনরাজ রডারিক বললেন,

শার্দূল বিবরে যদি পশেরে শৃগাল  
কি হয়রে তার দশা ?...

সমুচিত প্রতিফল দিব কাল রণে  
এই পুত্র শোকানল আরব-শোণিতে  
নির্ব্বাপিব, তবে নাম বটে রডারিক।”

মহীলকের সমাধির বর্ণনা দান করে কবি ‘মহীলক পতন’ সর্গের সমাপ্তি করেছেন।

কাব্যের শেষ সর্গকে কবি বলছেন ‘বিজয় নামক অষ্টম সর্গ।’ প্রত্যক্ষ সমরে স্পেন অধীশ্বরের পতন এবং টলিডোর দুর্গ-শীর্ষদেশে ইসলাম-কেতন স্থাপনের কাহিনী এই সর্গের বর্ণনীয় বিষয়।

পুত্রশোকে ক্ষুব্ধ দৃষ্ট ভূপ রডারিক ছ’ লক্ষ অনীকিনী সহ স্বয়ং সমরে অবতীর্ণ : হুসজ্জিত স্পেনীয় সৈন্যদলের বজ্র ঘোর নাদে পৃথিবী ব্যোম গিরি নদী সিদ্ধ কম্পিত হয়ে উঠল। শত্রু সৈন্যের বিপুল সগর সজ্জা দেখে আরব বাহিনী খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। সেনানী তারেখ সৈন্যদলের বিমর্ষ ভাব লক্ষ্য করে তাদের উৎসাহ দান করবার উদ্দেশ্যে উচ্চ বেদিকার ওপর দণ্ডায়মান হয়ে দস্তোলাী গর্জনে বললেন,

“বিশ্ব বিধাতার পুণ্য কৃপাফলে  
চিরজয়ী মোরা এ ভব মণ্ডলে,  
জিনিয়াছি কত রণ অবহেলে।”

মুসলিম বাহিনীর ইয়ারমুকের যুদ্ধ জয়, ইরান বিজয়ের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিয়ে কবি জানালেন,

“বিধাতা নিয়ত মোদের সহায়  
মোদেরি বিজয় হইবে সাধন।”

... ..

“কাফেরের পরে মুসলমানগণ,  
লভিবে বিজয় বিধির নিয়ম”

অতএব “ধাও ধাও তবে রণরঙ্গে,  
প্রবল উচ্ছ্বাসে মত্ত বীর্য্য ভঞ্জে  
কাটাই কাফেরে সবে এক সঙ্গে  
শোণিতে ভাসাও ধরণী তলে ॥”



বীর উপদেশ অনল-বচনে আরবীয় সৈনিক দলের রক্ত ধমনী ভিতরে  
নেচে উঠল। মোস্লেম বাহিনী উৎসাহে উন্মত্ত হয়ে দীন্ দীন্ দীন্ রবে লুফার  
ছাড়ল। অরাতি কাননে প্রবেশ করে আরবীয় সেনা অসি হানতে লাগল।

“অবিরাম অবিরল বাহু মুণ্ড স্কন্ধ  
ঝরিতে লাগিল হায়!”

সেনাপতি তারেখের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে পতন হল স্পেন সেনাপতি হার্ডিয়ান-  
নের। তারেখের কৃপাণের সংহার-আঘাত বর্ম চর্ম দীর্ণ করে হার্ডিয়ান শির দ্বিধা  
বিভক্ত করল। সেনাপতির নিধনে মহাবীর ভূপ রডারিক নিজে গ্রহণ  
করলেন সৈন্যপত্ন্য ভার।

“রডারিক-চালনায় স্পেন সেনাবৃন্দ,  
ধাইল জীমূত-মল্লৈ করাল প্রতাপে  
মোসলেম বাহিনী মুখে”—

... ..

“ভীষণ সমর

ঘূর্ণি-বাত্যা সম এবে বাজিল বিষম।”

যুদ্ধরত জুলিয়ানকে দেখে রডারিক তাঁকে আক্রমণ করতে ছুটে গেলেন।  
উভয়ের ভেতরে বাধল ভয়ংকর যুদ্ধ। রডারিকের খড়্গাঘাতে আহত হয়ে রণে  
ভঙ্গ দিয়ে জুলিয়ান পশ্চাতে হটে গেলেন। তখন যুদ্ধ বাধল আবছল্লার সাথে।  
আবছল্লাকে রডারিক পুত্রহস্তা বলে চিনতে পেরে সর্বশক্তিবেগে ভল্ল নিষ্ফেপ  
করলেন। কিন্তু আবছল্লার বীরত্বে ব্যর্থ হল এ আক্রমণ। পরস্পরের দারুন সমরে  
আবছল্লা অবশেষে ইরস্মদ ত্যেজ ভীষণ ভল্ল হানলেন রাজেন্দ্র-উরসে। সে  
দারুন আঘাতে স্পেন অধীশ্বর অশ্বপৃষ্ঠ হতে ভূতলে পতিত হলেন।

“অমনি কুমার তবে চক্ষুর নিমেষে  
রডারিক শির কাটি গাঁথিলা ভল্লাগ্রে।”

রাজার পতনে এবং মুসলিম বাহিনীর আক্রমণে খৃষ্টান বাহিনী ‘হইল  
বিচ্ছিন্ন ভগ্ন দলিত মথিত।’ শত্রুকুল পরাজয়ে সেনাপতি তারেখ মুহূর্তমাত্র

বিলম্ব না করে উগ্রতেজে রাজধানী টলিডে। নগরী দখল করতে অগ্রসর হলেন।  
বিজয় বাহিনী সহ নগরীতে প্রবেশ করে তিনি বন্দী শত্রুদের মুক্তি দান করলেন এবং  
অধিবাসীদের অভয় দান করলেন।

অনন্তর দুর্গ অভ্যন্তরে প্রবেশ করে শীর্ষদেশে তারেখ

“স্বহস্তে স্থাপিলা তথা ইদ্রাম-কেতন,

... ..

আল্লাহো আকবর রবে পুনঃ জয়ধ্বনি

উঠিল বিদারি ব্যোম।”

‘স্পেন বিজয়-কাব্য’র কাহিনী ইতিহাস থেকে সংগৃহীত, কবি ‘বন্দনা’  
অংশেই তা প্রকাশ করে বলেছেন। তিনি বলেছেন, ‘পুণ্যভূমি হিস্পানের দুর্দশা  
কাহিনী গাহিব’। পাপমতি, গর্বাক্ত ভূপতি রডারিকের দুর্মতির ইতি হ’ল  
কী করে, বীরেন্দ্র তারেখ মুষ্টিমেয় সেনা নিয়ে কী অতুল ভুজ-বীর্ষে  
স্পেনের পাপ-তরু-মূল উৎপাটন করেন এবং কী দুর্জয় সাহসে তিনি  
স্পেনের গিরি-দুর্গ শীর্ষে ইসলামের জয়কেতু উড্ডীন করেন—এ সমস্তই ইতিহাসের  
ঘটনা এবং ‘স্পেন বিজয়-কাব্য’ সে ইতিহাসই কবি লিপিবদ্ধ করেছেন  
ছন্দোবদ্ধ ভাষায়। কল্পনার আশ্রয় নেবার সুযোগ কবির বিশেষ ছিল না।  
ফলে, ইতিহাস যদি এ কাব্যের কাব্যগুণকে খণ্ডিত করে থাকে তাতে বিস্মিত  
হ’বার ভেমন কিছু নেই।

দ্বিতীয়তঃ, সিরাজী সাহেবের কবি-প্রকৃতির যে পরিচয় ইতিপূর্বে পাওয়া  
গেছে তাতে মনে হয় না প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ তিনি কাব্যই রচনা করতে  
চেয়েছিলেন। বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে তিনি চেয়েছিলেন ইতিহাসের  
সত্য তুলে ধরতে। এবং কাব্য-পাঠকের জানা আছে, ইতিহাসের সত্য আর  
কাব্য-সত্য উভয়ের ভেতর ব্যবধান ব্যাপক। ফলে, রাম না জন্মাতেই রচনা  
সম্ভব রামায়ণের।

‘স্পেন বিজয়-কাব্যে’র কাহিনী, ঘটনা এবং প্রধান চরিত্রসমূহ সব কিছুই ইতিহাসাশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও ভূমিকা রচনা করে কবি কোথাও নিবেদন করেননি সে ইতিহাসের উৎস-কেন্দ্র কোথায়। কিন্তু এ কাব্য পাঠ করবার পর ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই লক্ষ্য করবেন Stanley Lane-poole এর ‘The Moors in Spain’ প্রথম অধ্যায়ের সাথে কাব্য-বর্ণিত কাহিনী, ঘটনার কী আশ্চর্য মিল।

Lane-poole এর গ্রন্থ পাঠ করে জানতে পারছি, রডারিকের রাজত্ব-কালে ( ৮ম শতকের প্রারম্ভ ) বিলাসে ব্যসনে স্পেনের উচ্চবিত্ত সম্ভ্রান্ত শ্রেণী নৈতিকতার চরম অধঃপাতে নেমে এসেছে। প্রজাসাধারণের ওপর অকথ্য অত্যাচার তাদেরকে দাস শ্রেণীতে পরিণত করেছে। করভারে নিপীড়িত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেরুদণ্ড একেবারে ভেঙে গেছে। স্পেনের সমাজকে বলা হয়েছে ‘Society so demoralized’ এবং সম্ভ্রান্ত শ্রেণীকে বলা হয়েছে ‘a corrupt aristocracy’.

‘স্পেন বিজয়-কাব্যে’ স্পেনের বর্ণনা :

“রমণীয় স্পেনে আজি রাজ অত্যাচারে  
উঠিতেছে হাহাকার ঘরে ঘরে ঘরে !  
স্থ শান্তি হইয়াছে চির অন্তহিত।  
করভারে অত্যাচারে সদা অশ্রু জলে  
ভাসিতেছে প্রজাকুল।

... ..

অত্যাচার হাহাকারে ফাটিছে গগন  
ব্যবসা বাণিজ্য লুপ্ত, কৃষি রসাতলে  
যাইতেছে দিন দিন, লুপ্ত শিল্পজাত।

.... ....

রাজ কর্মচারিগণ—স্থলিত চরিত্র,  
শোষণে পেষণে আহা ! দীন প্রজাকূলে  
করিয়াছে জীবন্মৃত ! নাহিক বিচার !

ভাসিছে স্রার শ্রোতে সমগ্র সাম্রাজ্য  
মিলি তার সনে পুনঃ ইন্দ্রিয় বিকার  
তুলিয়াছে রাজ্যময় ঘোর হাহাকার।”

এ বর্ণনার সাথে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে Lane-Poole এর বর্ণনা :

“The mass of the people were either slaves, or, what was much the same thing, labourers bound to the soil, .....Between the rich and the slaves was a middle class of burghers, who were perhaps even worse off : .....they paid the taxes, performed the civil and municipal functions, and supplied the money which the rich squandered upon their luxuries.”

“A corrupt aristocracy divided the land among themselves ; the great estates were tilled by a wretched and hopeless race of serfs ; the citizen classes were ruined.”

“In Spain the richer classes were given over to luxury and sensuality ; they lived only for eating and drinking, gambling and all kinds of excitement.”

কামুক এবং পাষণ্ড রাজা রডারিকের ফ্লোরিগার সতীত্ব ধর্ম অপহরণের সাথে ‘স্পেন বিজয়-কাব্যের’ সূচনা। এবং বস্তুতঃ রডারিকের এই পাপ এবং ফ্লোরিগার প্রতিশোধ গ্রহণ প্রয়াস কাব্যের কাহিনী অংশকে গতিদান করে সমাপ্তির পূর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছে। ‘The Moors in Spain’ গ্রন্থ পাঠ ক’রেও জানা যাচ্ছে যে, উপরোক্ত কারণই প্রত্যক্ষ যা রডারিকের এবং স্পেনের পতন দ্রুততর করেছিল।

ঘটনাটির বর্ণনা দান করতে গিয়ে কবি লিখছেন :

“রাখিলা জনক হেথা বিড়া অধ্যয়নে  
রাজনীতি রীতি জ্ঞান শিখিতে যতনে  
আদব কায়দা আর চরিত্র গঠনে  
বাল্যকাল হ’তে।

কিছু নাহি জানি হয় ! রাজার অন্তরে  
কিরূপে পশিয়া পাপ মোহমুগ্ধ ক'রে,  
নাশিল ধরম মম কিবা ছল ক'রে  
কিবা ফাঁদ পেতে ।” ( ফ্লোরিণ্ডার উক্তি )

‘The Moors in Spain’ গ্রন্থের একাদশ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হচ্ছে :

“It was the custom among the princes of the state to send their children to the court, to be trained in whatever appertained to good breeding and polite conduct. Among others Count Julian, the governor of Ceuta sent his daughter Florinda to Roderiek’s court at Toledo to be educated among the queen’s waiting women. The maiden was very beautiful, and the king, forgetful of his honour which bound him to protect her as she would his own daughter, put her to shame.”

রডারিকের উপর প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে কন্যা ফ্লোরিণ্ডা এই ঘটনা পিতা জুলিয়ানের নিকট পত্র লিখে জানাল ।

“জানাই পিতারে তবে এ সব ঘটনা ;

... ..

আছে ভৃত্য শেলী মোর সদয় সৃজন

... ..

তার হাতে পত্র দিয়া করিব প্রেরণ

এই যুক্তি বটে ।”

“In her distress the young girl wrote to her father, and, summoning a trusty page, bade him.....to speed with all haste,.....till he placed the letter in Count Julian’s hand.” ( p. 11 )

এই ভাবে সর্গের পর সর্গে ক্যাব্যাটিতে কাহিনী এবং ঘটনায় ‘The Moors in Spain’ গ্রন্থের সরাসরি অনুসরণ করা হয়েছে । ‘The Moors in Spain’ গ্রন্থে বলা হচ্ছে কন্যার পত্র পাওয়ার পর কাউন্ট জুলিয়ান

“...resolved no longer to defend the kingdom of his daughter's destroyer. The saracens should have Spain if they would, and he was ready to show them the way.”

কাব্যের ‘পরামর্শ নামক তৃতীয় সর্গে’ কাউন্টের সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করা হয়েছে। মুসলিম সেনাপতি তারেখের সাথে সাক্ষাৎ করে রডারিকের অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করে তিনি বলছেন,

“হে রাজেন্দ্র ! সেনাসহ সিদ্ধ হইয়া পার

বীর্য্যানলে দক্ষ কর পাপের প্রভুত।”

কাউন্ট জুলিয়ানই যে মুসলিম বাহিনীকে পথ দেখিয়ে স্পেনে নিয়ে এসেছেন, অষ্টম সর্গে রডারিকের উক্তিভেদে তার সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে :

“খুষ্টান অরিরে

কেমনে আনিলি তুই এ খুষ্টান দেশে ?”

‘ফ্লোরিগা উদ্ধার নামক পঞ্চম সর্গ’ এবং ‘মহীলক পতন নামক সপ্তম সর্গ’ কেবল এই দুটো সর্গে কবি ইতিহাস বহির্ভূত কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন— এ ছাড়া চতুর্থ, ষষ্ঠ এবং অষ্টম সর্গে কাহিনী ও ঘটনার দিক থেকে Lane Poole এর অনুসৃতি ছাড়া মৌলিক তেমন কিছু নেই। অবশিষ্ট বিভিন্ন চরিত্রের ভেতরকার সংলাপমূলক নাটকীয় কথোপকথন কবির নিজস্ব সৃষ্টি। Lane Poole বলছেন, মুসলিম শিবিরে যোগদান করবার পূর্বেই কাউন্ট জুলিয়ান স্বয়ং তাঁর কন্যাকে রডারিকের রাজপুরী থেকে নিয়ে আসেন। কাব্য-বর্ণিত সখী লীমও এবং ভৃত্য শেলীর সাথে ফ্লোরিগার রাজপুরী থেকে গোপনে পলায়নের উল্লেখ ‘The Moors in Spain’ গ্রন্থে নেই। মনে হয় কাননের বর্ণনা দান ( তুলনীয় ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’ চতুর্থ সর্গ ) এবং কুমার আবদুল্লাহর বীর চরিত্র অংকনের উদ্দেশ্যে কবি স্বাধীন ভাবে পঞ্চম সর্গ রচনা করেন। মহীলক পতন সর্গ রচনা করবার সময়েও সম্ভবতঃ কাব্যিক এবং নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টির প্রেরণাই কবির মনে প্রবলতর হয়ে উঠেছিল। ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’র বীরবাহু পতন এবং ইন্দ্রজিৎ পতনের বর্ণনাও মনে হয় তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল।

‘স্পেন-বিজয় কাব্যে’ ‘বন বিহার’ সর্গে উল্লিখিত রডারিক কর্তৃক হাকুলিসের মায়া পেটিকা উদ্ঘাটন কাহিনীটি Lane Poole এর ‘The Moors in Spain’

গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে। Lane-Poole এ কাহিনী সংগ্রহ করেছেন স্পেনে প্রচলিত উপাখ্যান থেকে। Washington Irving-এর ‘The Conquest of Spain’ গ্রন্থেও এ কাহিনীর উল্লেখ আছে।

কাব্যে বলা হচ্ছে, বন বিহার থেকে রাজধানী টলিডো নগরীতে প্রত্যাবর্তনের পথে রাজা রডারিক একটি ছুর্গে প্রবেশ করেন। ছুর্গের অভ্যন্তরে রাজা

“হেরিল প্রহরী মূর্তি পিতল নির্মিত”

Lane-Poole-এর ভাষায়, “... stood a gigantic bronze figure of terrible aspect,...”

‘স্পেন-বিজয় কাব্য’র কবি আরো বলছেন, রাজা রডারিক

“প্রবেশি প্রাসাদ-কক্ষে করিলা লোকন,  
প্রস্তর বেদিকা পরে সুবর্ণ পেটিকা,  
খোদিত রয়েছে তাহে এই বিবরণ—  
“পেটিকায় বদ্ধ আছে ছুর্গ প্রহেলিকা।  
কিন্তু রাজা ভিন্ন এই সুবর্ণ পেটিকা  
খুলিতে নারিবে কেহ, কোনও ভূপতি,  
যদি কভু খোলে ইহা, মহা বিভীষিকা  
দেখিবে দৃশ্যপটে চমৎকার অতি।  
কিন্তু অচিরেই তারে কালের কবলে,  
পড়িয়া ছাড়িতে হবে এ ভব মণ্ডলে।”

এই উদ্ধৃতাংশের সাথে Lane-Poole এর বিবরণী মিলিয়ে পড়া যেতে পারে, ‘স্পেন-বিজয় কাব্য’র কাহিনীতে পরবর্তী ঘটনা বিবৃত হচ্ছে,

“... in its (chamber) midst was a table, set there by Hercules, and on it a casket, with the inscription, “In this coffer is the mystery of the Tower the hand of none but a king can open it ; but let him beware, for wonderful things will be diclosed to him, which must happen before his death.

‘বিবরণ পাঠে রাজা হয়ে কৌতূহলী

....

করিলেক পেটিকার ডালা উদ্ঘাটন।

‘ দেখিলেন একখণ্ড স্তম্ভশৃণ চর্মা

ভাষ্যপাতে বিজড়িত রয়েছে ভিতরে,

.... ... ....

দেখিলেন চর্মখণ্ডে রয়েছে অঙ্কিত,

নানা প্রহরণ ধারী সৈন্য অগণিত।

উপরে রয়েছে লেখা ওরে দুঃসাহসি !

এই তোর অরিগণ স্পেন রাজ্য গ্রাসি !

“When the king had opened the coffer, there was nothing in it but a parchment folded between two plates of Copper ; on it were figured men on horse-back, fierce of countenance, armed with bows and scimitors, and above them was the motto, “Behold, rash man, those who shall hurl thee from thy throne and subdue thy kingdom.”  
(The Moors in Spain)

‘দেখিতে দেখিতে হ’ল ভীষণ ব্যাপার

ভীমরণ কোলাহল হইল উথিত,

চিত্রিত সৈনিকগণ বীরের আকার

ধরিয়া, সমররঙ্গে হ’ল উন্মাদিত।”

“And as they gazed upon the picture, on a sudden they heard the sound of warfare, and saw, as though in a cloud, that the figures of the strange horsemen began to move, and the picture became a vision of war.”

(The Moors in Spain)

কাহিনী অনুসরণ এবং ভাষানুসরণে Lane-Poole-এর প্রভাব ‘স্পেন-বিজয় কাব্য’র অষ্টম সর্গেও বেশ স্পষ্ট। সমররঙ্গনে রডারিকের সৈন্য সমাবেশ



“বিপুল অরাতি হেরি আরব বাহিনী  
চিস্তিত হইল অতি।”

“When the Moors saw the mighty army that Roderick had brought against them...their hearts for a moment sank within them.”

কিন্তু সেনানী তারেখ সেনার বিমর্ষভাব অবলোকন করে তাদের নবোচ্ছ্বাসে উৎসাহ দান করবার উদ্দেশ্যে—

“...দস্তোলী গর্জনে  
কহিলা সৈনিক বৃন্দে করি সম্বোধন  
... ..  
হে সৈনিকগণ কর অবধান,  
নাহিক উপায় করিতে প্রস্থান  
পশ্চাতে গর্জিছে ভূমধ্য সাগর  
.... ....  
রণ ভিন্ন নাহি পরিত্রাণ ভবে।”

“...Tarik cried aloud; “Men, before you is the enemy, and the sea at your backs. By Allah, there is no escape for you save in valour and resolution.”

মুরদের সাথে যুদ্ধে পরাভূত রডারিকের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কী ঘটল, ইতিহাস সে সম্পর্কে নীরব। ‘স্পেন-বিজয় কাব্য’ পাঠে জানা যাচ্ছে, তারেখ পুত্র আবদুল্লাহর হাতে রডারিক নিহত হন। কিন্তু স্পেন দেশীয় কাহিনী উপাখ্যানে রডারিককে রাজা আর্থারের মত ধর্মযুদ্ধে রক্ষাকর্তা বীরের মর্যাদা দান করা হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হবে, কাহিনী-পরিকল্পনার দিক থেকে ‘স্পেন বিজয়-কাব্য’ মৌলিকতা দাবী করতে পারে না—Lane-Poole পরিবেশিত ইতিহাস এ কাব্যের প্রধান নির্ভর। মিল্টনের Paradise Lost এবং মধুসূদনের ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’ যথাক্রমে বাইবেল ও বাল্মীকি-রামায়ণের কাহিনী-নির্ভর। কিন্তু এতদসত্ত্বেও উভয় কাব্যই নবতর শিল্প-সৃষ্টি ব্যঞ্জনা উজ্জল। কবি-প্রাণের

আকৃতি এবং সমকালীন যুগ-উৎকর্ষ। প্রাচীন কাহিনীকে নতুন রূপ-লালিত্য দান ক'রে মৌলিকত্বের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। 'স্পেন বিজয়-কাব্য' রচনার মূলেও যুগের দাবী, যুগ-প্রয়োজন ক্রিয়াশীল; কিন্তু মিল্টন বা মধুসূদনের মত প্রাচীন কাহিনীকে নতুন ক'রে ঢালাই ক'রে নবতর শিল্প সৃষ্টির প্রয়াস এ কাব্যে অল্পপস্থিত। দিরাজী সাহেবের রডারিক পতন কাহিনী তাই ইতিহাসই রয়ে গেল—কাব্যের বাঞ্ছনীয় স্বপ্নমা মণ্ডিত হয়ে উঠতে পারেনি।

‘স্পেন-বিজয় কাব্যের, কাব্য পরিচয় এবং কাব্যগুণ আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই লক্ষণীয়, আংগিকের দিক থেকে কবি নিজে তাঁর রচনাকে ‘কাব্য’ ছাড়া অপর কোন পরিচয়ে চিহ্নিত করেননি। অথচ চরিত্র অংকন এবং সংলাপ রচনায়, ভাষা, উপমা এবং ছন্দ ব্যবহারে রস সৃষ্টির প্রয়াসে আর কাব্যটির কাঠামো গঠনের কার্যে ঊনবিংশ শতকের বাংলা মহাকাব্যের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে স্পষ্ট। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাও এ কাব্যকে মহাকাব্য নামে আখ্যায়িত করেছেন। ( ডাঃ এনাগুলা হক )

‘মহাকাব্য’র শাস্ত্রসম্মত সংগানুযায়ী ‘স্পেন বিজয়-কাব্য’র এ পরিচিতি কতটা গ্রহণযোগ্য তা বিচার করে দেখা যেতে পারে। মহাকাব্যের সংগায় বলা হয়েছে “মহাকাব্যের আখ্যানবস্তু পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক এবং নায়ক ধীরোদাত্ত গুণ সমন্বিত অর্থাৎ সমস্ত সদগুণের সমষ্টিভূত; সর্গ সংখ্যা অষ্টাধিক এবং পটভূমি স্বর্গমর্ত্যপাতালপ্রসারী। ইহাতে শৃঙ্গার, বীর, করুণ ও শাস্ত এই চারটির একটি রস মুখ্য বা প্রধান এবং অত্যাশ্চর্য রস ইহাদের অঙ্গ স্বরূপ হইবে। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে বিভিন্ন ছন্দে প্রকৃতি, যুদ্ধ বিগ্রহ, স্বর্গমর্ত্য পাতাল প্রভৃতির বর্ণনাও থাকিতে পারে। ইহার ভাষা ওজস্বী ও গান্ধীর্ষ্যব্যঞ্জক হইবে। নায়কের জয় বা আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে মহাকাব্যের সমাপ্তি হইবে।”

এই সংগার আলোকে বিচার করলে, ‘স্পেন-বিজয় কাব্য’র আখ্যান বস্তুকে মহাকাব্যের স্বীকৃতি দান করতে হবে, কেননা, তা ঐতিহাসিক। রস বিচারে লক্ষণীয়, বীররস এ কাব্যের মুখ্যরস—বিশেষ করে চতুর্থ এবং অষ্টম সর্গে তা প্রবলতর। মহীলক পতন নামক সপ্তম সর্গ ‘অঙ্গ স্বরূপ’ করুণ রসে অভিসিদ্ধিত।

অবশ্য অপর দুই সঞ্চারী রস হিসেবে এ কাব্যে শৃঙ্গার এবং শাস্ত রসের আশ্বাদন থেকে পাঠক বঞ্চিত হবেন, তথাপি মহাকাব্যোচিত রস সৃষ্টিতে কবি যে শাস্ত্র নির্দেশ যথাসম্ভব প্রতিপালন করে গেছেন, তা স্বীকার করে নিতে হয়। প্রকৃতি বর্ণনার ক্ষেত্রে সিরাজী সাহেবের লেখনী অনায়াস গতিতে এগিয়ে গেছে। বিশেষ করে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ এবং অষ্টম সর্গের প্রভাত, সায়াহু, শবরী বর্ণনা, বসন্ত ঋতু বর্ণনা এবং পঞ্চম সর্গে কানন বর্ণনা ‘স্পেন-বিজয় কাব্য’র মহাকাব্যসূচক লক্ষণ নির্দেশ করে। মহাকাব্যের অন্ততম প্রধান অঙ্গ যে যুদ্ধ বর্ণনা, আলোচ্য কাব্যের অধিকাংশই তাতে মুখর হয়ে উঠেছে। চতুর্থ সর্গে অভিযান বর্ণনা, পঞ্চম সর্গে ফ্লোরিগা উদ্ধার পর্বে রেডিস-আবদুল্লার যুদ্ধ বর্ণনা, সপ্তম সর্গে আবদুল্লার সাথে যুদ্ধে মহীলকের পতন বর্ণনা এবং অষ্টম সর্গে স্পেনীয় ও আরব বাহিনীর সংগ্রাম ও রডারিক-আবদুল্লার যুদ্ধ বর্ণনা বীররস আশ্বাদনাকাংক্ষী পাঠককে তৃপ্ত করবে। মহাকাব্যের ছন্দ সম্পর্কে নির্দেশ দান করতে গিয়ে সংগার বলা হয়েছে, ছন্দের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য সম্পাদন করতে হবে। ‘স্পেন-বিজয় কাব্য’ প্রধানতঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। তবে ধর্মনাশ নামক প্রথম সর্গে এবং দ্বিতীয় সর্গে প্রকৃতির ও ফ্লোরিগার অবস্থা বর্ণনায়, চতুর্থ সর্গে মুসলিম বাহিনীর জাতীয় সংগীত রচনায় ও অষ্টম সর্গে তারেখের বীর ভাষণ রচনায় বিভিন্ন ছন্দ ব্যবহার করে কবি প্রয়োজনীয় বৈচিত্র্য রক্ষা করেছেন

কাব্যটির ভাষা সম্বন্ধে কবির সচেতনতা প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা যেতে পারে। বন্দনাংশেই কবির প্রার্থনা, ‘কৃপা করি অগ্নিময়ী কর এ রসনা’— ‘বিশ্বশরণ’ তাঁর এ প্রার্থনা রক্ষা করেছিলেন। এবং ‘স্পেন বিজয়-কাব্য’ পাঠ করে ‘অনল-প্রবাহে’র সমালোচনার পুনরুক্তি করে অসংকোচেই বলা যেতে পারে, এ কাব্য গ্রন্থ “মহাওজস্বিনী ভাষায় লিখিত।” এ ভাবে শাস্ত্রসম্মত সংগানুযায়ী মহাকাব্যের প্রায় সব ক’টা লক্ষণই ‘স্পেন বিজয়-কাব্যে’ লক্ষ্য করা যাবে। অবশিষ্ট রইল কেবল নায়ক-বিচার। মহাকাব্যের নায়ককে হ’তে হ’বে ‘ধীরোদাত্ত গুণ সমন্বিত অর্থাৎ সমস্ত সদগুণের সমষ্টিভূত’ এবং ‘নায়কের জয় বা আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে মহাকাব্যের সমাপ্তি হইবে।’ প্রশ্ন হল, ‘স্পেন-বিজয় কাব্যে’র নায়ক কে, রডারিক অথবা তারেখ। উপরোক্ত সংগার বিচারে

রডারিককে নায়ক আখ্যায়িত করা চলে না, কেননা, মহাকাব্যের প্রয়োজনীয় 'ধীরোদাত্ত গুণ' থেকে রডারিক বঞ্চিত এবং রডারিকের ধ্বংসের সংগে আলোচ্য কাব্যের সমাপ্তি তাঁর জয় বা আত্মপ্রতিষ্ঠায় নয়। এ দিক থেকে বরং তারেথকে নায়ক বলতে হয়। কারণ 'স্পেন-বিজয় কাব্যের অবসান হচ্ছে তারেথের বিজয় এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার সাথে। কিন্তু মহাকাব্যের নায়কের অপর প্রধান পরিচয় যে ধীরোদাত্ত গুণসমূহ, তারেথকে সে সব সদগুণে গুণায়িত করতে কবি কতটা সচেতন প্রয়াসের সাধনা করেছেন? খলিফার প্রতিনিধি মুসার সাহসী সেনাপতি হিসেবে স্পেন অভিযানে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব করা ব্যতীত তারেথের অপর কোন ভূমিকা কাব্যের কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। বরং বীরত্বের এবং দুঃসাহসের ভূমিকায় তারেথ পুত্র আবদুল্লা চরিত্র বিস্তৃততর করে অংকিত করা হয়েছে। তুলনামূলক বিচারে আবদুল্লা চরিত্র অধিকতর উজ্জ্বল। কিন্তু আবদুল্লার স্বয়ংনির্ভর ভূমিকা এবং ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি ক'রে কবি তাকেও নায়ক পর্যায়ে উন্নীত করতে চাননি। এ ভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে বলতে হয়, নায়কত্বের দাবী বরং ইতিহাসের, কেননা শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের কালপুরুষেরই জয় এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার মধ্যে আলোচ্য কাব্যটির সমাপ্তি হয়েছে। আর যদি কাব্যের প্রধান এবং ব্যাপকতর ভূমিকার বিচারে দেখতে হয়, তা'হলে রডারিককেই নায়ক স্বীকার করতে হবে। কেননা, রডারিকের পাপ এবং রডারিকের পতন কাহিনীই 'স্পেন বিজয়-কাব্য'র মূল বিষয় বস্তু।

কাব্যের অপরাপর চরিত্র সৃষ্টিতেও কবির দক্ষতা বিশেষ লক্ষণীয় নয়। স্রষ্টার সে কলা দক্ষতা, শিল্পীর সে নির্লিপ্ততা থেকে বঞ্চিত ছিলেন ইসমাইল হোসেন সিরাজী। ছায়-অছায়, ধর্ম-অধর্ম, উচিত-অনুচিত সম্বন্ধে তাঁর আপোষহীন এবং ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা প্রকাশের ও প্রচারের মাধ্যম স্বরূপ রচিত হয়েছে 'স্পেন-বিজয় কাব্য'। ফলে কাব্যের চরিত্র সমূহ ঘটনার সংঘাত-আবর্তে স্বাভাবিক ভাবে গড়ে উঠতে পারেনি, কবির মানস চিন্তার এক একটি বাণীরূপেই হয়েছে তাদের পরিসমাপ্তি। রডারিক, ফ্লোরিগা, জুলিয়ান, তারেথ, আবদুল্লা সব ক'টা চরিত্র কাব্যের অঙ্গনে কবির নীতিবোধের

পুতুল হয়েই পরিক্রমণ করল--মানবীয়তার স্পর্শে জীবন্ত হয়ে উঠতে পারল না! তাদের সংলাপ সংস্কারক-কবির নীতি-ঘোষণা ছাড়া আর কিছু নয়।

এ কাব্যের একমাত্র উল্লেখযোগ্য চরিত্র রডারিক। কিন্তু ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’র রাবণ চরিত্রের প্রভাব এ চরিত্রের ওপর এত গভীর ও প্রবল যে, চরিত্রটি শেষ পর্যন্ত আত্ম স্মৃতি লাভ করতে পারল না, রাবণেরই প্রতিচ্ছবি হয়ে রইল। কিন্তু রাবণ চরিত্রও কবি যথার্থ ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন মনে হয় না। রাবণের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, “এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত ঐশ্বর্য; ইহার হর্যচূড়া মেঘের পথ রোধ করিয়াছে; ইহার রথ-রথি-অশ্বে-গজে পৃথিবী কম্পমান, যাহা চায় তাহার জন্ত এই শক্তি শাস্ত্রের বা অস্ত্রের কোন কিছুই বাধা মানিতে সম্মত নহে। ..... যে অটল শক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোন মতেই হার মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্ম বিদ্রোহী মহানস্তুর পরাভবে সমুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন।” এই রাবণকে চিনতে পারেননি বলেই সিরাজী সাহেবের রডারিক রাবণের সাজ পোশাক পরিধান করে শেষ পর্যন্ত যাত্রার অভিনয় করেই গেল। তা’ছাড়া রাবণ কবি মধুসূদনের মানস-সন্তান, রাবণের পরাভবে মধুসূদনের সহানুভূতি তাই করুণ ক্রন্দনে ভেঙে পড়েছে। ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’ তাই ট্রাজেডির মাহাত্ম্যে গৌরবান্বিত। কিন্তু রডারিক ত’ সিরাজীর মানস আত্মজ নন, রডারিকের পতনে তাই কবির সহানুভূতি নেই, বরং রডারিকের পতন কবি-আদর্শের বিজয় সূচিত করেছে। ‘স্পেন-বিজয় কাব্য’র দ্বিতীয় উল্লেখ-যোগ্য চরিত্র মহীলক। এ চরিত্রটিও মধুসূদনের মেঘনাদ চরিত্রের ছাঁচে রচিত। রাবণের নিয়তি অথবা কর্ম কোন কিছুই জেতেই মেঘনাদ দায়ী নন, তথাপি তাঁকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। পুত্র মহীলকেরও তেমন পিতার কর্মফলের দরুন মৃত্যু হোল। মহীলক-মাতা সম্রাজ্ঞী ইথিকা বীরবাহু-মাতা চিত্রাঙ্গদার প্রতিক্রম ব্যতীত আর কিছু নন। জুলিয়ান চরিত্রের সাথে বিভীষণ চরিত্রের আংশিক সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যাবে।

এ ভাবে দেখা যাবে সিরাজী সাহেবের চরিত্র-পরিকল্পনার মধুসূদনের প্রভাব কতটা সক্রিয় এবং গভীর। অবশ্য সহজেই বোধগম্য, মধুসূদনের আন্তর ধর্ম তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি।

‘স্পেন-বিজয় কাব্য’র পটভূমি সৃষ্টি এবং সর্গ সমাবেশের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এই যে, স্বর্গমর্ত্যপাতালপ্রসারী পটভূমিতে অষ্টাদিক সর্গে আখ্যানভাগ গড়ে তোলার নির্দেশ কবি মান্য করেননি। তাঁর কাহিনী একান্ত ভাবেই ইতিহাস-নির্ভর ও মর্ত্য-কেন্দ্রিক এবং আট সর্গের পরিসরেই এই কাহিনীর বিস্তার ও পরিসমাপ্তি। তথাপি, এ বিচ্যুতি সত্ত্বেও, কাব্য পাঠক অবশ্যই মেনে নেবেন মহাকাব্যের আঙ্গিক সজ্জায় কবি ‘স্পেন-বিজয় কাব্য’র রূপ দান করেছেন।

ইতিহাস আশ্রিত কাহিনীকে আট সর্গে বিভক্ত করে কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী তাঁর কাব্যের কাঠামো গড়ে তুলেছেন, এ তথ্য আমাদের জানা। কাব্য পাঠে আরও জানা যাবে যে, প্রধানতঃ অমিত্রাক্ষর ছন্দ-নির্ভর তাঁর রচনা ক্লাসিকাল সংস্কৃত রীতির উপমা অলংকার সমন্বিত ভাষার ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। নীচের উদ্ধৃতাংশ থেকে এ উক্তি স্পষ্টতর হবে :

“বীরেন্দ্র-কুল-কুঞ্জর মহাশক্তি তুমি;  
দেখাও প্রচণ্ড শক্তি এ পাপ দমনে—  
কালান্তক-কাল সম ;

“তুঙ্গ তুরঙ্গম পৃষ্ঠে করি আরোহণ  
বিস্তারি ভাস্বর অসি, তূর্য্যধবনি করি  
কহিল। সৈনিক বৃন্দে দ্বিষং নিচয়ে  
বীর্য্যানেলে দহিবারে বেষ্টি মহাবূহে  
বধিতে কুরঙ্গ সম তীক্ষ্ণতম শরে।”

.... ...

“মাগর কল্লোল সম মহা জয়ধ্বনি,  
কাঁপাইয়া দিখলয় গগন পবন।”

“প্রচণ্ড ঝটিকা কালে ভীম প্রভঞ্জন  
উর্ষিদলে নিক্ষেপিয়া আলোড়ে যেমতি  
সুবিশাল সিদ্ধ বক্ষ ; তথা মহাতেজে  
মোস্লেম অনীকবৃন্দ দোদীর্ঘ বিক্রমে  
নিপাতিল অরিগণে রস্তাতরু সম !”

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ‘স্পেন-বিজয় কাব্য’র গঠন ও রচনাকৌশলে ঊনবিংশ শতকের বাংলা মহাকাব্যের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে স্পষ্ট। এ ক্ষেত্রে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র এবং বিশেষ করে গধুসূদন সিরাজী সাহেবের কবিমানসকে প্রভাবান্বিত করেছেন। কাব্য পরিকল্পনায় এবং ছন্দ ব্যবহারে, চরিত্র অংকনে এবং উপমা, অলংকার ও ভাষা-কারু রচনায় ‘মেঘনাদ বধ কাব্যের’ কবির উপস্থিতি ‘স্পেন-বিজয় কাব্য’র প্রায় সর্বত্র অনুভূত হয় :

কাব্যের ভূমিকায় ‘বন্দনা’র সংযোজনা করে ‘স্পেন বিজয় কাব্য’র সূত্রপাত করা হয়েছে। কাব্য সূচনার এ রীতি বাংলা কাব্য ধারার ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতিরই অনুকৃতি। এমন কী বিদেশাগত আধুনিকতম আঙ্গিকে গীতি কবিতা রচনা করতে গিয়েও বিহারীলাল সারদার বন্দনা গান করে গেছেন।

বন্দনাংশ রচনা করে কবি তাঁর সমগ্র কাব্যকাহিনীর সংগে পাঠকের পরিচিতি সম্পাদন করবার প্রয়াস পেয়েছেন। চরণের পর চরণে জিজ্ঞাসাবোধক বাক্য রচনা করে আখ্যানঅংশের আভাস দান করা হয়েছে। বন্দনাংশের মাধ্যমে কাব্যের ভাষা এবং কাব্যোদ্দেশ্য সম্পর্কেও পাঠককে সচেতন করা হয়েছে। যেমন,

“পুণ্যভূমি হিস্পানের দুর্দশা কাহিনী  
গাহিব, গাহিব তার দুঃখের রজনী  
কেমনে প্রভাত হ’ল ; কি ভীষণ পাপে  
রাজা তার পড়িলেক ধর্ম অভিশাপে !  
কি অতুল ভূজ-বীর্যে বীরেন্দ্র তারেক,  
.... .... ইত্যাদি।

মধুসূদন এবং হেমচন্দ্রের কাব্যেও অনুরূপ পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়।  
ইসমাইল হোসেন সিরাজীর বন্দনা, অনন্ত, চিন্তার ‘অন্তিম বিশ্বশব্দ’  
নিকট—মধুসূদন, হেমচন্দ্র সেক্ষেত্রে শ্বেতভূজা ভারতীর প্রদান প্রার্থনা করেছেন

“বন্দি চরণারবিন্দ হে বিশ্বশরণ !

... ....

দেহ শক্তি অনুরক্তি কবির উচ্ছ্বাস”

—সিরাজী ।

“বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি

আমি ডাকি আবার তোমার, শ্বেতভূজ

ভারতি ! ... ....

তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি ”

—মধুসূদন

“কহ মাতঃ শ্বেতভূজে, স্বয়ম্ভূনন্দিনি”

—হেমচন্দ্র

কাব্যারম্ভে পর পর কয়েকটি প্রশ্নসূচক বাক্য রচনা করে মধুসূদন তাঁর  
কাব্যকাহিনীর আভাস দান করেছেন এ ভাবে :

“কোন্ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে.

পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃ কুলনিধি

রাঘবারি ? কি কৌশলে, রাক্ষসভরস:

ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে—অজেয় জগতে—

উন্মীলা বিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঙ্কলা ?”

এ অংশটি ‘স্পেন-বিজয় কাব্য’র অনুরূপ অংশের সাথে মিলিয়ে নেওয়া যেতে  
পারে। ‘বৃত্তসংহার কাব্য’র দ্বিতীয় খণ্ড ছাদশ সর্গে কাব্যকাহিনীর প্রস্তাবনা  
দান করতে গিয়ে কবি হেমচন্দ্রও প্রশ্নসূচক বাক্যাবলী ব্যবহার করেছেন।  
অতঃপর বৈজয়ন্ত ধামে কী হ’ল ; বৃত্তাস্তর কী কংগেন ; উত্তরে কী মাইল  
কী ভাবলেন, পুলোমানন্দিনী ইন্দ্রপুরীতে প্রবেশ করে কিরণে কলস পতিত হইত



করলেন, দানবদের দণ্ড দান করতে দেবগণ কি করলেন, শচী উদ্ধারের জন্য  
কি ভাবে যুদ্ধ করলেন, দধীচি-অস্থি কেমন করে লাভ করা গেল, বিশ্বকর্মার  
বজ্র গঠন, বৃত্রমহাসুর বধ কিভাবে সাধিত হ'ল,

“হে দেবি, করিয়া দয়া কর সে ভারতী।”

কাব্য-পরিকল্পনা ও কাব্যোদ্দেশ্য এবং কাব্যের ভাষা ও রস পরিবেশনা  
সম্পর্কেও কবি সিরাজী এবং মধুসূদন উভয়েই পাঠককে প্রারম্ভ থেকেই অবহিত  
করেছেন।

সিরাজী সাহেব মুসলমানদের জাতীয়-জীবন গঠনোদ্দেশ্যে ইসলামের অতীত  
গৌরব কাহিনী রচনা করবেন এবং সে জন্তে অগ্নিময়ী রসনায়,

“সুধারসে বীরভাবে গাছক সিরাজী  
হৃদয়ের বীণা আজি হক বঙ্কারিত,”

এক্ষেত্রে মধুসূদনের বাসনা,

“...গাইব, মা, বীররসে ভাসি,  
মহাগীত ;

তঁার একমাত্র উদ্দেশ্য,

“...কবির চিত্তফুলবন-মধু  
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে  
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।”

মধুসূদন গৌড়জনকে মধুচক্রের সুধা পান করিয়েই তৃপ্ত, তাঁর কাব্যোদ্দেশ্য  
এতেই সার্থক। কিন্তু সিরাজী সাহেবের বীরভাষে সংগীত-রচনা উপায় মাত্র,  
উদ্দেশ্য নয়, গৌড়বাসীকে তাঁর হৃদয়-বীণার বঙ্কার শুনিতে মুগ্ধ মূঢ় করে  
রাখতে তিনি চান না—গৌড়বাসীর জাগরণে, গৌড়বাসীর জাতীয় জীবন  
গঠনেই তাঁর কাব্য রচনার সার্থকতা। তাই জাতীয় ভাবোদ্দীপক ইতিহাস  
কাহিনী রচনা ব্যতীত ‘মধুচক্র’ কাব্য রচনা তাঁর আর হয়ে উঠল না—  
কাব্য সমাপ্তিতে ‘বিদায় কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি’ তাঁর  
গলায় পরিয়ে দিলেন না।

কাব্যের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে ‘কল্পনা’ কে সম্বোধন ক’রে তার সহায়তা গ্রহণ বাংলা কাব্যের বহু অনুল্লসৃত রীতি।

“তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী  
কল্পনা!” —মধুসূদন।

“কল্পনে !

চঞ্চল চপলালোকে চল একবার”

.....” —নবীনচন্দ্র।

“.....এসো তুমি প্রিয়ে,

আজন্মসাধনধন সুন্দরী আমার,

কবিতা, কল্পনালতা। —রবীন্দ্রনাথ

‘স্পেন-বিজয় কাব্য’র প্রথম সর্গের সূচনাতেও এর অণুথা দেখা যায় না,

“এস গো কল্পনে সখি অমিয় ভাষিনী।”

‘স্পেন বিজয় কাব্য’র আরেকটি রচনা-বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রতিটি সর্গের সমাপ্তিতে সে সর্গের নাম-পরিচয় দান। যেমন, প্রথম সর্গের নাম-পরিচয়, ‘ইতি স্পেন-বিজয় কাব্যে ধর্মনাশ নামক প্রথম সর্গ সমাপ্ত।’ এ ভাবে আটটি সর্গেরই পরিচয় দান করা হয়েছে। হেমচন্দ্রের মহাকাব্যে অনুরূপ রীতির সাক্ষাৎ পাই না। বাংলা কাব্যে এই রীতির প্রচলন ব্যাপক ছিল না। তবে ‘মেঘনাদ-বধ কাব্যে’ সর্গ সমাপ্তিতে সর্গ-পরিচিতি রচনা করা হয়েছে সংস্কৃত ভাষায়। যেমন, ‘ইতি মেঘনাদবধে কাব্যে অভিষেকো নাম প্রথম সর্গঃ’ কিংবা ‘ইতি মেঘনাদবধে কাব্যে সংক্রিয়া নাম নবমঃ সর্গঃ।’ মধুসূদন এ রীতি গ্রহণ করেছিলেন ক্লাসিকাল সংস্কৃত কাব্য থেকে এবং সিরাজী সাহেব সম্ভবতঃ মধুসূদনকে অনুসরণ করেছেন এ ক্ষেত্রে।

কাহিনী পরিবেশনার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যাবে, ফ্লোরিণ্ডার ধর্মনাশ সূচিত করছে ‘স্পেন-বিজয় কাব্যে’র এবং সীতা অপহরণ শেষ পর্যন্ত ঘটালো মেঘনাদ বধ।

পাশাপাশি মিলিয়ে পাঠ করলে ‘মেঘনাদ বধ কাব্যে’র সাথে ‘স্পেন-বিজয় কাব্যে’র আরো প্রচুর সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। শব্দ ও উপমা অলংকার ব্যবহারের

ক্ষেত্রে ত বটেই, এমন কি বর্ণনায়, চরিত্র চিত্রণে. কাহিনী খণ্ডাংশেও তা' লক্ষণীয়। 'স্পেন-বিজয় কাব্যে'র চতুর্থ সর্গে আরব রমণীদের যুদ্ধসজ্জা 'মেঘনাদ-বধ কাব্যে' সখীবৃন্দ সহ প্রমীলার লংকা যাত্রার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আরব বাহিনীর যুদ্ধ সজ্জার বর্ণনা,

“মন্দুরা হইতে আনি তাজী বাজী রাজি

সাজাইল নানা সাজে,

'মেঘনাদ বধ কাব্যে'ও একই ভাবে উপস্থিত,

“সাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে,

মন্দুরা হইতে আনে আলিন্দের কাছে

আনন্দে।”

বিশেষ করে 'স্পেন-বিজয় কাব্যে'র সপ্তম সর্গে 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র প্রভাব বিস্ময়কর। রাজসভায় মন্ত্রী পাত্র মিত্র বেষ্টিত রত্ন সিংহাসনারূঢ় রাজ্য রডারিক 'মেঘনাদ বধ কাব্যে'র প্রথম সর্গে কনক আসনারূঢ় দশানন রাবণের প্রতিচ্ছবি। উভয় রাজসভার বর্ণনা যেন একই কবির রচিত। রাবণের রাজসভায় পুত্র বীরবাহুর পতনের সংবাদ বহন করে এনেছে ভগ্নদূত। আর রডারিকের নিকট আরববাহিনীর সংগে যুদ্ধে নিহত পুত্র মহীলকের সংবাদ নিয়ে এসেছে স্পেনীয় দূত। আবছুল্লার সাথে মহীলকের সম্মুখ যুদ্ধের বর্ণনা যে ভাষায় রচিত হয়েছে, তার সাথে বীরবাহু-পতন বর্ণনা প্রায় আক্ষরিকভাবেই মিলে যায়।

ভগ্নদূত বীরবাহুর যুদ্ধের বর্ণনা দান করছে,

“মদকল করী যথা পশে নলবনে”

মহীলকের যুদ্ধ বর্ণনার ভাষা,

“পশিল প্রমত্ত গজ যেন নলবনে”

মধুসূদনের ভাষায়,

“উড়িল কলম্বকুল অশ্বর প্রদেশে  
শনশনে!”

সিরাজী সাহেবের ভাষায়,

“উড়িল কলম্বকুল অশ্বর আচ্ছাদি”

রাবণ ভগ্নদূতকে জিজ্ঞাসা করছেন,  
 “.....কহ’রে সন্দেশ-বহ,  
 কহ, শুনি আগি.....”

সপ্তম সর্গে মেঘনাদ নিধনের সংবাদ বহন করে এনেছে বীরভদ্র ।  
 বীরভদ্রের প্রতি রাবণের প্রশ্ন,

“কি হেতু,  
 হে দূত, রসনা তব বিরত সাধিতে  
 স্বকর্ম ?.....  
 .....তবে, কেন, হে সন্দেশ-বহ,  
 মলিন বদন তব ?”

অনুরূপ পরিস্থিতিতে রডারিকের জিজ্ঞাসা,  
 “কহরে সন্দেশ-বহ ! কহ কোন্ হেতু  
 নির্বাক রসনা তব ?”

রাবণের জিজ্ঞাসার উত্তরে বীরভদ্র,  
 “অভয় প্রদান অগ্রে, হে কর্ণরূপতি  
 কর দাসে !”

রডারিকের জিজ্ঞাসার উত্তরে দূত,  
 “হে রাজেন্দ্র ! মাগে দাস অভয় ও পদে”

মহীলকের পতন সংবাদে  
 “.....ভূপ রডারিক  
 পড়িল মূচ্ছিত হয়ে সিংহাসন তলে  
 উথলিল সভাতলে হাহাকার ধ্বনি !  
 পাত্র মিত্র মহা ব্যস্তে আকুল পরাণে  
 সিক্রিয়া শীতল বারি ব্যজনি পবন  
 চেতাইল নরনাথে।”

এই বর্ণনার সাথে তুলনীয় মেঘনাদের পতন সংবাদে রাবণের অবস্থা

“... ...পড়িলা ভূপতি

সভায় ! সচিববৃন্দ, হাহাকার রবে

বেড়িল চৌদিকে শূরে ; কেহ বা আনিল

স্বশীতল বারি পাত্রে, বিউনিল কেহ।”

‘সচিব শ্রেষ্ঠ বৃধ মন্ত্রী’ সারণের মত রাজা রডারিকেরও মন্ত্রী রয়েছেন। তিনি ‘বৃধকুল গৌরব-কেতন প্রধান সচিববর’ সোলন। মেঘনাদের পতন সংবাদে শোকাবুল রাবণকে সাস্থনা দিতে গিয়ে সারণ বলছেন :

“অভভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে

বজ্রাঘাতে কভু নহে ভূধর অধীর

সে পীড়নে।”

রডারিকের প্রতি সোলনের সাস্থনা বাণী,

“কি ভয় হে নৃপবর ? এক গিরি চূড়া

হইয়াছে চূর্ণ যদি, শতেক শিখর

এখনও রহিয়াছে অক্ষত অটুট।”

বীরবাহুর মাতা চিত্রাংগদার সাথে তুলনীয় মহীলকের মাতা ইথিকার। বীরবাহুর শোকে কাতরা হয়ে চিত্রাংগদা প্রবেশ করেছেন রাবণের সভায়।

কবি বর্ণনা করেছেন সে দৃশ্য,

“শোকের ঝড় বহিল সভাতে !”

অপরপক্ষে মহীলকের মৃত্যু সংবাদে

“শোকের বিপ্লবে হায় ! রাজ অন্তঃপুরে

বহিল বিষম ঝড়।”

শোকাতুরা চিত্রাংগদাকে রাবণ সাস্থনা দান করছেন,

“এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে ?

দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব

গেছে চলি স্বর্গপুরে ;”

সাম্রাজ্ঞী ইথিকাও চেড়ীবৃন্দ সাথে নিয়ে প্রবেশ করেছেন রাজসভায়।  
তাকে সাস্থনা জানানো হচ্ছে,

“হে মহিষি! বৃথা খেদ এ বিলাপ !

... ..

পুত্র তব ভাগ্যবান, তেঁই রণভূমে  
সম্মুখ সমরে যুঝি অরাতির সনে  
গিয়াছে অমরপুরে—”

রাণী ইথিকার শোকের বর্ণনা সিরাজী সাহেব যেভাবে দিয়েছেন, সে বর্ণনাকে  
পাঠক মধুসূদনের রচনা বলে গ্রহণ করলে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

“এতেক কহিয়া রাণী বিপুল উচ্ছ্বাসে  
কাঁদিলেক হাহাকারে, শোক অশ্রুধারে  
তিতিল কপোল বক্ষ তিতিল বসন।  
কাঁদিলেক সভাজন চেড়ীবৃন্দ আর।”

এরকম উদ্ধৃতি ‘স্পেন-বিজয় কাব্য’র বিভিন্ন স্থান থেকে দেয়া যায়।

মেঘনাদ বধ কাব্যের নবম সর্গে বর্ণিত হয়েছে মেঘনাদের শোক শোভা  
যাত্রা। স্পেন-বিজয় কাব্যের সপ্তম সর্গে বর্ণিত মহীলকের শোক-শোভা যাত্রা  
বর্ণনা উক্ত বর্ণনার অনুসরণ বললে বাহুল্যোক্তি দোষ ঘটে না। এ উক্তির  
সমর্থনে নিম্নে উভয় কাব্য থেকেই কিছু সংখ্যক উদ্ধৃতি দেয়া গেল।

“পদব্রজে চলিয়াছে ভূপ রডারিক”

—স্পেন-বিজয় কাব্য

“বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃ কুল রাজা

রাবণ ;”

—মেঘনাদ বধ কাব্য

“সহসা পূরব দ্বার হ’ল উদ্ঘাটিত”

—স্পেন-বিজয় কাব্য।

“খুলিল পশ্চিম দ্বার অশনি নিনাদে।”

—মেঘনাদ বধ কাব্য।

সে আশা তরুর মূলে ভীষণ কুঠার  
অকালে হানিল হায় !”

পুত্র শোকাতুর রাজা রাবণের কাতরোক্তি,  
“কিন্তু বিধি-বুঝিব কেমনে  
তঁার লীলা, ভাড়াইলা সে সুখ আমারে !  
ছিল আশা রক্ষঃ কুল-রাজ-সিংহাসনে  
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,”

‘স্পেন-বিজয় কাব্য’ পাঠ করে পাঠকের স্বতঃই মনে হবে, মেঘনাদ বধ কাব্যের ভাষা, উপমা, অংলকার, ছন্দ এবং বর্ণনা-ভংগী সিরাজী সাহেবের কবি মানসকে প্রায় সম্পূর্ণ ভাবেই আচ্ছন্ন করেছিল। তবে এতদসত্ত্বেও প্রকৃতি বর্ণনায় এবং নারীরূপ বন্দনায় কোন কোন স্থানে তাঁর কবিকল্পনা মৌলিক স্ফূর্তি লাভ করেছে। স্থান বিশেষে রচনা-ভংগী যথার্থ কবিত্ব শক্তির পরিচায়ক। ফ্লোরিণ্ডার রূপ বর্ণনা করছেন, অরুণ আভার বিমণ্ডিত—

“নিশির শিশির-সিক্ত চম্পক-কলিকা”

শ্বেত শুভ্র সজ্জায় সজ্জিত সূক্ষ্মাকারিণী আরব রমণীদের কবি দেখছেন,

“পঞ্চশত উষা  
রমণীর রমণীয় মূর্তি পরিগ্রহি  
ভবে যেন অবতীর্ণ।”

সাগরের বর্ণনা,

“হেরিলা সম্মুখে  
গর্জিছে বিশাল সিদ্ধ উর্গি বাহু তুলি  
ফুলিয়া ছলিয়া রঙ্গে, নাহি কূল তার।”

নীল সিদ্ধ তটদেশে কায়রোয়ান নগরীকে কবি দেখছেন তাঁর কল্পনা দৃষ্টিতে,

“যেন কোন রাজধানী (রূপের প্রতিমা)  
মণি মুক্তা বিখচিত নানা অলঙ্কারে

সাজিয়া মোহিনী বেশে কৌষেয় বসনে,  
 স্নান করি সিন্ধু নীরে এলায়িত কেশে  
 দাঁড়ায়ে প্রভাতকালে মর্মর আসনে”

‘স্পেন-বিজয় কাব্য’র ভাষায় একটি বিশেষ লক্ষণ যা পাঠকের মনে কৌতূহলের সৃষ্টি করবে, তা হ’ল কবির শব্দ-চয়ন এবং শব্দ-ব্যবহার। প্রত্যেক মহান কবিই শব্দের ওপর নতুন ব্যঞ্জনার আরোপ করে নতুন অর্থদ্রোতনার সৃষ্টি করে থাকেন। সিরাজী সাহেব এ বিষয়ে মর্মান্তিক ভাবেই ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর শব্দ-চয়ন এবং ব্যবহারে মধুসূদনের প্রভাব প্রায় প্রতিচরণেই লক্ষণীয়। এমন কী, সমুদ্রের বাঁধ এই অর্থে তিনি মধুসূদনের ‘বাদঃ পতিরোধ’ শব্দটি পর্যন্ত ব্যবহার ক’রে গেছেন। মধুসূদনীয় নাম-ধাতুর ব্যবহার করেছেন তিনি যত্নতর। এমন কী নামধাতু ব্যবহারের ঝোঁকে শব্দের গ্রাম্য প্রয়োগও তিনি স্বীকার ক’রে নিয়েছেন। যেমন, ‘ধাওয়াইয়া’ বা ‘ভাগাইলা’। ‘স্পেন-বিজয় কাব্য’র শব্দ ব্যবহারে নামধাতু ব্যবহারের এই যান্ত্রিকতা পাঠকের কাব্যানুভূতির সৌকুমার্যকে প্রায়ই পীড়িত করে থাকে।

কাব্য হিসেবে ‘স্পেন-বিজয় কাব্য’ তেমন মহান সৃষ্টি কিছু নয়। এমন কী, কাব্য বিচারে এ কাব্যের কাব্যগুণ কতটা টেকে, ওপরের আলোচনা থেকেই তা প্রমাণিত হ’বে। এ কাব্য পাঠ করে এমন ধারণা করাও আয়াস-সাধ্য যে, কাব্যটি কোন সময়েই খুব বেশি জনপ্রিয় ছিল না। এই কারণেই সম্ভবতঃ এরই ভেতরে কাব্যটির নাম-পরিচয় পর্যন্ত পাঠক সাধারণ ভুলতে বসেছেন। এক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে, তাহলে আজকের দিনে ‘স্পেন-বিজয় কাব্য’ বিশেষ করে পাঠ করবার সার্থকতা কোথায়, প্রয়োজনীয়তা কী? আমাদের জাতীয় জীবনে এখন সংস্কৃতিবোধ গড়ে তোলার পালা চলেছে। এ প্রসঙ্গে স্বীকার করে নেয়া ভাল, মুসলমান বাঙালীর সংস্কৃতি সাধনার কোন ইতিহাসই আজ অবধি রচিত হয় নি। তেমন প্রচেষ্টাও যে হয়েছে,



আমাদের জানা নেই। কথাটা লজ্জাকর হ'লেও নির্মম ভাবে সত্যি। এ অভাব যদিই না মেটানো যাচ্ছে, আমাদের সংহত জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠার পথে প্রতিবন্ধকতার অবসান হবে না। মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল তার সমাজের ওপর, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিবেশের ওপর। অতএব কোন জাতির কালানুক্রমিক সংস্কৃতির ইতিহাস খুঁজে বা'র করতে হ'লে দেখা দরকার কী কী সামাজিক, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক উপাদান-উপকরণের টানাপোড়েনে, পরিবেষ্টনীতে সে জাতের ক্রমবিকাশ ঘটেছে।

যথার্থ ঐতিহাসিক দলিলের অভাবে এ পরিবেশের সন্ধান পাওয়া যাবে গত যুগের শিল্প-সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে। অতএব সেদিনকার রচিত সাহিত্য আশ্বাদন করে বা'র করতে হ'বে সে যুগের সঠিক পরিচয়। তাতে ক'রে আমরা চিনতে পারব সেদিনকার মানুষকে। আর সে পরিচয় স্পষ্ট নির্দেশে বাংলা দেবে সেই মানুষের সংস্কৃতি সাধনার ধারা এবং ইতিহাস।

এ আলোকে বিচার করলে আজকের দিনেও 'স্পেন-বিজয় কাব্য' পাঠ করবার সার্থকতা আছে বৈ কি! দ্বিতীয়তঃ, ভাববস্তু, আঙ্গিক এবং গঠন-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও 'স্পেন-বিজয় কাব্য' অধুনা-যুগের পাঠক সাধারণের রস-জিজ্ঞাসার উপকরণ যোগাবে। কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে মধুসূদন দত্ত যে আধুনিকতার পথ নির্দেশ দিয়ে যান, তার অনুসরণ করেছেন প্রাক-প্রথম মহাযুদ্ধ পর্বের সাহিত্য-শিল্পীরা প্রায় সবাই। মধুসূদনীয় পরিবেশে বিধৃত মুসলমান সাহিত্যিকদের সাহিত্য সাধনার স্বরূপ নির্ণয় কেবলমাত্র কৌতূহলোদ্দীপকই নয়, ইতিহাসেরও প্রয়োজন সাধন করবে।

এসব কারণে অবশ্যই প্রয়োজন, সে যুগে রচিত কাব্য সাহিত্যের বিস্তৃততর এবং গভীরতর পাঠ-অনুশীলন।



# বাংলা বিহারে ঊনবিংশ শতাব্দীর মু স লি ম শি ক্ষা র প ট ভূ মি

ঃ ডাঃ এ, আর, মল্লিক, এম. এ. পি-এইচ-ডি, এফ. আর. এ. এস.

“জ্ঞানার্জন বা বিদ্যাশিক্ষার প্রতি মুসলমান অপেক্ষা আর কোন জাতিই অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করে না।”<sup>১</sup> মুসলমানের জ্ঞানের ধারণা ও জ্ঞান-পিপাসার মূল নিহিত আছে কোরাণ ও হাদিসে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ইহজগতের ও পরজগতের জ্ঞানার্জনের নির্দেশ কোরাণ ও হাদিসে রহিয়াছে।<sup>২</sup> শিশুর বয়স চার বৎসর চার মাস চার দিন হইলেই তাহার হাতে খড়ি হয়। অনুল্লেখযোগ্য হেরফের হইলেও এই অনুষ্ঠান ভারতের সর্বত্র পালিত হইত এবং আজিও হইয়া থাকে।<sup>৩</sup> এই অনুষ্ঠানে শিশুকে কোরাণের সুনির্বাচিত আয়াত পড়িয়া শোনান হয় এবং শুনিবার পর শিশু সেই আয়াতগুলি আবৃত্তি করে। সুতরাং মুসলমানের নিকট বিদ্যার্জনের ধারণার মধ্যে সর্বদাই কিছুটা ধর্মের ছাপ রহিয়াছে। যে-কোন আর্থিক অবস্থার মুসলিম অভিভাবকই হউন না কেন, তিনি সাধ্যানুসারে তাঁহার সন্তানাদিকে শিক্ষাদানের ধর্মীয় বিধি মানিয়া চলিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। মুসলিম সমাজে জ্ঞানী ব্যক্তিদের অত্যন্ত সমীহ করা হইয়া থাকে এবং সমগ্র দেশে তাহাদিগকে সম্মানী ও প্রিয়জন হিসাবে গণ্য করা হয়।

ভারতের মুসলিম শাসকগণ তাঁহাদের রাজসভায় জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিরাট বিরাট সম্পত্তি দান করিতেন।<sup>৪</sup> “একথা অত্যন্ত সত্য যে, প্রথম মুসলমান বিজ্ঞেতাগণ তাঁহাদের নিজদেশে জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করেন। তাহাছাড়া স্বদেশের বিদ্বজ্জনের উপর অকাতরে সম্মান-বর্ষণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের রাজসভায় পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের বিখ্যাত সাহিত্যিক ও বিদ্বান ব্যক্তিদের আকর্ষণ করিবার জন্য অর্থব্যয় বা কষ্ট স্বীকার করিতেও পশ্চাদপদ হইতেন না। আরবী বা ফারসীর কোন অধ্যাপক রাখা হইত না এমন

কোন মসজিদ বা ইমাম বাড়ি সে যুগে বিরল ছিল !..... যেখানেই মুসলমানের সংখ্যাধিক ছিল সেখানেই পাঠশালার অনুকরণে মক্তব গড়িয়া উঠিয়াছিল।”<sup>১</sup> একথা বাংলার ক্ষেত্রে আরও বেশী সত্য—এখানকার নৃপতিগণ শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারে অত্যন্ত মুক্তহস্ত ছিলেন।<sup>২</sup>

সমগ্র দেশে ভূস্বামী ও সর্দারগণ তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতেন এবং এইভাবে বিত্তশালী ব্যক্তিদের দানশীলতা ও উদারচিত্ততায় পরিপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ গরীবদের জন্ম ও সুযোগ করিয়া দিত। নবাব ও মনসবদার ইত্যাদি বিরাট বিরাট সামন্ত প্রভু ও কর্মচারী ব্যতীত “নৃপতি ও ভূস্বামীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত খাজনামুক্ত সম্পত্তির মালিক আরেমনদার ও লাখিরাজদারগণের”ও জাতির শিক্ষার উন্নতিতে দান নিহায়েত কম ছিল না। যে সকল স্থায়পরাগণ বিদ্বান ব্যক্তি অপরকে শিক্ষাদান নিজেদের কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন, সাধারণতঃ তাহাদিগকেই তাঁহারা অর্থ সাহায্য করিতেন এবং এইভাবে খাজনামুক্ত সম্পত্তি দানের দ্বারা বহুসংখ্যক উচ্চস্তরের ও প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিপুষ্ট হইত।<sup>৩</sup>

১৮০৭ সাল হইতে ১৮১৪ সালের মধ্যে সংকলিত বুকাননের ( পরবর্তী-কালে হ্যামিলটন ) অথবা ১৮৩৫ সালে লিখিত ডব্লু, এ্যাডামের রিপোর্ট-সমূহে এমন বহুসংখ্যক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ ছিল—যেগুলি অনুরূপ খাজনামুক্ত সম্পত্তি দ্বারা পরিপুষ্ট হইত ( অবশ্য তৎকালে সেগুলির অবস্থা ছিল ক্ষয়িষ্ণু )। যদিও বাংলা ও বিহারে অনুরূপ দত্তক সম্পত্তির পরিমাণ সঠিকরূপে নির্ণয় করিবার কোন উপায় এ্যাডামের ছিল না, তবুও প্রচলিত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি নিশ্চিত হইয়াছিলেন, কেমনা উক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ছিল বিপুল।<sup>৪</sup> তিনি বাংলার অন্তর্গত রাজশাহী জেলার কসব বাঘার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়াছেন। সেখানে দানখররাত ও শিক্ষার জন্ম ৪২টি গ্রাম মিলিয়া অনুরূপ একটি দত্তক-সম্পত্তি ছিল।<sup>৫</sup> তাহা ছাড়াও বীরভূমের দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রশংসা বিবেচনা প্রসঙ্গে এ্যাডাম উল্লেখ করিয়াছেন যে, স্কুলসমূহ পরিচালনার জন্ম সাধারণ ভাবেই আয়ের উৎস ছিল দেবোত্তর সম্পত্তিসমূহ।<sup>৬</sup> এই সকল স্কুলে বিনা বেতনে শিক্ষালাভ ছাড়াও ছাত্রদের প্রায়শই বিনা

পরসায় থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল এবং এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে ভাতাও দেওয়া হইত। যেমন, কসবা বাঘার ছাত্ররা শিক্ষালাভ ছাড়াও থাকা, (ধোপা খরচা) বস্ত্রাদি, তৈল ও লিখিবার সরঞ্জামাদি এমনকি পাঠ্য পুস্তক হিসাবে ব্যবহারের জন্য পুস্তকাদি কপি করিবার কাগজ কলম ইত্যাদিও পাইত।<sup>১১</sup>

সরকার কর্তৃক মুসলমান শাসক ও অধিপতিদের সৃষ্ট দাতব্য ও অছি সম্পত্তি সমূহ পুনরাধিকারের বিবরণ হইতে উক্ত সম্পত্তিসমূহের পরিমাণ ও বৈচিত্র্য সম্পর্কে সন্ধ্যক ধারণা জন্মে।<sup>১২</sup> অবশ্য বহু ক্ষেত্রেই ইহাতে দেখা গিয়াছে যে, দাতব্য সম্পত্তির আয় তাহার যথার্থ প্রয়োজন না মিটাইয়া অগুভাবে ব্যয় হইতেছে। মুসলিম ওয়াক্ফ আইনের বিশেষত্বের জন্য জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট তহবিল শিক্ষা ভিন্ন অগু উদ্দেশ্যে ব্যয় করা সহজতর হইয়াছিল। এই আইন দাতার গরীব আত্মীয় স্বজনকে জমির আয় ভোগ করিবার অধিকার দিত। ফলে কেবলমাত্র বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইহাতে দানের চেহারা ই যে পরিদৃষ্ট হইত এমন নহে, প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তরাধিকারীরাও ইহা হইতে সাক্ষাৎভাবে উপকৃত হইতে পারিত।<sup>১৩</sup>

কোরাণ ও হাদিসের নির্দেশসমূহ গরীবদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে মুসলমান সমাজের ধনী ব্যক্তিদিগকে উদ্বুদ্ধ করে। ইহা ছাড়াও ধনী ব্যক্তিদের সম্মান-দিগকে গৃহে শিক্ষাদানের জন্য বেতনভুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা ছিল। (এবং সেখানেও গরীব ছেলে মেয়েরা বিনাখরচে অধ্যয়নের সুযোগ পাইত)। এইরূপ শুনা যায় যে, “প্রসিদ্ধ পাণ্ডুরাতে নাকি গরীব প্রতিবেশী ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে মুসলমান ভূস্বামিগণ নিজেদের ব্যক্তিগত খরচে শিক্ষক নিযুক্ত করিতেন এবং কোন স্বচ্ছল গৃহস্থ বা গ্রাম্য মাতব্বর এই উদ্দেশ্যে কোন শিক্ষক নিযুক্ত রাখেন নাই এরূপ দৃষ্টান্ত প্রায় ছিল না বলা চলে।”<sup>১৪</sup> শিক্ষকরাও শিক্ষাদানকে নৈতিক ও ধর্মীয় উন্নতির সোপান স্বরূপ মনে করিতেন বলিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে নিজ গৃহে অথবা ছাত্রদের সহায়তায় নির্মিত তাঁহার নিজস্ব বিদ্যালয়ে ছাত্রদের বিনাবেতনে শিক্ষাদান করিতেন।<sup>১৫</sup>

যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাথমিক ধরনের শিক্ষা প্রদান করা হইত তবুও সাধারণ মুসলমান জনসাধারণের বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে ইহার প্রচুর দান ছিল। অবশ্য, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুসলমানগণ দারিদ্র্য প্রপীড়িত হইয়া পড়ায় বিনা পরসায় শিক্ষা বিতরণ করেন, এরূপ লোকের সংখ্যা নগণ্যের কোঠায় গিয়া দাঁড়ায়। এ্যাডাম বলেন, “এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যা নাকি ক্রমশ প্রায় লোপ পাইয়াছে এবং এখন এই ধরনের স্কুলের অস্তিত্ব প্রায় চোখেই পড়ে না।”<sup>১৬</sup> ঊনবিংশ শতাব্দীর জর্নৈক লেখক লিখিয়াছেনঃ “ভারতের মুসলমানদের উপর দিয়া একের পর এক প্রতিকূলতার বাড় বহিয়া যাইবার ফলে অধিকাংশ বিত্তশালী পরিবার সহায়-সম্বলহীন হইয়া পড়িয়াছে এবং বেশ বিরাট অংশ একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।”<sup>১৭</sup> গরীবদের শিক্ষিত কারবার কর্মভার যে স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণী চিরাচরিত প্রথা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল, সেই শ্রেণী সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

এই সকল স্কুলে মুসলমানদের প্রধান শিক্ষণীয় বিষয় ছিল ফারসী ভাষা। “ছাত্র যাহাতে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে” ফারসী ভাষায় এমন ব্যুৎপত্তি লাভই” ইহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। “অবশ্য ব্যাকরণ, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব ও আইন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আরবী ভাষাও প্রায়ই পাঠ্য ছিল।”<sup>১৮</sup> ফারসী বিদ্যালয় সমূহে প্রাথমিক ও উচ্চ শ্রেণীর ব্যাকরণ, চিঠি পত্রের কায়দাকানুন এবং জনপ্রিয় কবিতা ও কাহিনীর পুস্তকাদিই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইত। মাঝে মাঝে ফারসী বিদ্যালয় সমূহে উচ্চ শিক্ষার অংশ হিসাবে কাব্য বিজ্ঞান বা ধর্মতত্ত্ব বা চিকিৎসা বিদ্যা সংক্রান্ত পুস্তকাদিও গৃহীত হইত। আরবী বিদ্যালয়-সমূহে শিক্ষার বিষয়বস্তুর পরিধি আরও অনেক বিস্তৃততর ছিল—মুসলমান ও গভীর তথ্য-সমৃদ্ধ ব্যাকরণের পুস্তক, কাব্য-বিজ্ঞান, যুক্তি-বিজ্ঞান ও আইনের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এবং বহিঃপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা এবং ইসলামের মৌলিক তত্ত্ব ইত্যাদি সকল কিছুই পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোন কোন বিদ্যালয়ে ইউক্লিডের জ্যামিতি ও টলেমির জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনুবাদ এবং তৎসহ বিজ্ঞান ও অধিবিদ্যা অধ্যয়ন করান হইত। এ্যাডাম বলিয়াছেন, “ভারতে মুসলমানদের বিদ্যাশিক্ষার অবস্থা মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে ইউরোপীয় জাতিসমূহের

বিদ্যাশিক্ষার অবস্থার অনুরূপ ছিল মনে করিলে খুব ভুল করা হইবে না।”<sup>১৯</sup>

এ্যাডাম সাহেব আরবী বিদ্যালয় সমূহের যে চিত্র অংকন করিয়াছেন তাহা অবশ্য উচ্চ পর্যায়ের আরবী শিক্ষা বিতরণে নিযুক্ত অতি অল্প সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের সম্পর্কে সত্য। অর্ধ শিক্ষিত কাঠমোলা জাতীয় শিক্ষকগণ কতৃক পরিচালিত মক্তব বা প্রাথমিক আরবী বিদ্যালয়সমূহের অবস্থা ছিল শোচনীয়। সেখানকার বিদ্যাশিক্ষা বলিতে কোনরূপ অর্থ উপলব্ধি না করিয়া কোরাণ পাঠই বুঝাইত।<sup>২০</sup> ঐ সকল আরবী বিদ্যালয় অপেক্ষা নগণ্যতর অপ্রয়োজনীয় ও সমগ্র দিক দিয়া বিবেচনার অযোগ্য কোন প্রতিষ্ঠানই ছিল না।<sup>২১</sup> তবুও মুসলিম সমাজের উপর এই সকল বিদ্যালয়সমূহের বিরাট আধিপত্য ছিল। কারণ গরীব জনসাধারণের মধ্যে বিনা মূল্যে ধর্মীয় শিক্ষা তাহারা বিতরণ করিত—সে শিক্ষা যত অপরিণতই হউক না কেন।

এ্যাডাম সাহেবের অনুসন্ধানকালে আরবী শিক্ষাদান সম্পূর্ণরূপে এবং ফারসী শিক্ষাদান প্রায় সম্পূর্ণ মুসলমানদের হাতে ছিল—তাঁহার হিসাব মতে বাংলা ও বিহারে তিনি যে পাঁচটি জেলায় তথ্যানুসন্ধান করিয়াছেন, সেখানে ১৪ জন হিন্দু ও ২১৫ জন মুসলমান শিক্ষক ছিলেন। অথচ শিক্ষকদের এই অনুপাতের তুলনায় হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ছিল ২০৯৬ আর মুসলমান ১৫৫৮।<sup>২২</sup> ফারসী শিক্ষার প্রতি আকর্ষণ হেতু হিন্দুরা ফারসী ভাষা শিক্ষা করিত এক্রপ মনে করিবার কোন হেতু নাই। ফারসী ছিল রাজদরবারের ভাষা।

শিক্ষকদের বেতন ছিল অকিঞ্চিৎকর। কারণ “ফারসী ভাষা জানা চাকুরী-প্রার্থী ব্যক্তির সংখ্যা ছিল অসংখ্য।<sup>২৩</sup> কাজেই তখনও পর্যন্ত শাসন পরিচালনার ভাষা হিসাবে ফারসী স্থানচ্যুত না হওয়া সত্ত্বেও চিরাচরিত পন্থায় শিক্ষিত স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষে চাকুরীর সংস্থান অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, অর্থাৎ চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ ছিল বেশী।

এই সকল ফারসী বিদ্যালয় সম্পর্কে আরও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা রহিয়াছে। এ্যাডাম সাহেব মুসলমানদের ও হিন্দুদের শিক্ষার জন্য দুই ধরনের বিদ্যালয়ের তুলনামূলক বিচার করিয়াছেন। তাঁহার মনে হইয়াছে

যে, মুসলিম বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষা-ব্যবস্থা “বাংলা বিদ্যালয়সমূহে পঠিত বিষয়াদি অপেক্ষা অনেক ব্যাপকতর প্রকৃতির এবং তাহাদের মধ্যে উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীও অধিকতর পরিমাণে রহিয়াছে।’ এবং মুসলিম ও হিন্দু বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছই শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকেরা “বুদ্ধিমত্তার দিক হইতে উন্নত স্তরে” থাকিত<sup>২৩</sup>।

বাংলা ও বিহারে এই সকল ফারসী ও আরবী বিদ্যালয়সমূহ ছাড়াও মাতৃভাষায় শিক্ষাদানকারী আরও বহু সংখ্যক বিদ্যালয় ছিল। এসমস্ত বিদ্যালয়ে বাংলা এবং কোন কোন স্থলে বাংলার সাথে হিন্দিও শিক্ষা দান করা হইত। এই সকল দেশীয় বিদ্যালয় সমূহ মুসলমানদিগকে আকৃষ্টও করিতে পারিত না বা করিবার চেষ্টাও করে নাই। এ্যাডাম সাহেব লক্ষা করিয়াছেন যে, মুসলমানগণ বাংলা বা হিন্দী স্কুলে যোগদান করিয়াছে, এইরূপ অত্যন্ত অল্প কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত” মাতৃভাষায় শিক্ষার একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা ছিল ফারসী শিক্ষা।”<sup>২৪</sup>

ইহার কারণ নির্ণয় খুব পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার নয়। মুসলিম সমাজে বিদ্যাশিক্ষার সহিত ধর্মের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলেই মুসলমানগণ ফারসী ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু (বাংলা বা হিন্দির স্থায়) ফারসী ভাষাও বাংলা ও বিহারের মুসলমানদের মাতৃভাষা ছিল না। উভয় প্রদেশের বহু মুসলমানেরই প্রচলিত কথ্য ভাষা ছিল হিন্দুস্থানী বা উর্দু। এমন কি ১৮৮২ সালে উনবিংশ শতাব্দীর জনৈক প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন : লেফটেন্যান্ট গভর্নর শাসিত বাংলা স্ত্রাব্য পাঞ্জাব হইতে ভাগলপুর পর্যন্ত বিশুদ্ধ উর্দু ভাষা কেবল মাত্র মুসলমানের নয়, অধিকাংশ হিন্দুরও মাতৃভাষা। বীরভূম, মেদিনীপুর, দিনাজপুর, মালদহ, পূর্ণিয়া এবং কিছু পরিমাণে ২৪ পরগণার ইংরেজ শাসিত জেলাসমূহে মুসলমানগণ উর্দুতে কথা বলিয়া থাকে—যদিও তাহাদের ভাষা লক্ষ্ণৌ বা দিল্লীর স্থায়ী ভাবে বিশুদ্ধ নয়। ইহার পূর্বদিকে উর্দু শহরে মুসলমানদের ভাষায় পর্যবসিত হইয়াছে।<sup>২৫</sup>

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা ও বিহারের গ্রামাঞ্চলে মুসলমানদের এক বিরাট অংশের মধ্যে কথ্য ভাষা হিসাবে উর্দুর প্রাধান্য আরও বেশী প্রকট ছিল।<sup>২৬</sup>

ইহার পর বেসরকারী ও সরকারী উভয় প্রকারের স্কুল ও কলেজ সমূহে বাংলা বাধ্যতামূলক পাঠ্য তালিকাভুক্ত হইবার ফলে এই প্রদেশের মুসলমানগণ প্রয়োজনের ভাগিদে বাধ্য হইয়া বাংলা ভাষা গ্রহণ করেন এবং ধীরে ধীরে যে যে বিরাট অংশের মধ্যে উর্দু কথ্যভাষার মর্যাদা পাইয়াছিল তাহা লোপ পাইতে থাকে ও বাংলা সাধারণ মাতৃভাষারূপে প্রচলিত হইয়া পড়ে। বাংলার বঙ্গীপ অঞ্চলের জেলাসমূহের গ্রাম্য মুসলমানগণ মাতৃভাষারূপে যে বাংলা ব্যবহার করিত তাহাতে “আরবী ও ফারসী শব্দ যথেষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত ছিল।”<sup>২৭</sup>

এই উর্দু বা হিন্দুস্থানীর উৎস হিসাবে ফারসী ভাষা সর্বজনস্বীকৃত। ফলে মুসলমানগণ ফারসী ভাষা চর্চাকে মর্যাদার ব্যাপার বলিয়া নেন করিত।<sup>২৮</sup> প্রায় সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়াই এমনকি মাতৃভাষা অপেক্ষা ফারসীর প্রতি আগ্রহ বিরাট সংখ্যক মুসলমানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। ১৮৫৩ সালে শিক্ষা কাউন্সিলের সেক্রেটারী লিখিয়াছেন যে, “ফারসী ভাষায়” মুসলমানদের “নিজস্ব একটি সাহিত্য ছিল—যাহাতে তাহারা গর্ব অনুভব করিত এবং যথার্থ রূপেই নিজের বলিয়া বিবেচনা করিয়া প্রশাস্তি লাভ করিত। কাহারও কাহারও নিজের বা বন্ধুবান্ধব বেষ্টিত পরিমণ্ডলে এরূপ ধারণা ছিল যে, সম্পূর্ণ অজ্ঞতার ক্ষতি পূরণ কোনরূপ বিদেশী ভাষা জ্ঞান এবং কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যুৎপত্তি দিয়াও করা সম্ভব ছিল না।”<sup>২৯</sup> বাংলা প্রাদেশিক কমিটি অত্যন্ত সঠিকরূপে বলিয়াছেন যে, “মাত্র দুই পুরুষ পূর্বেও প্রদেশের এই নিম্নবর্তী অঞ্চলে ইংরাজী জানা লোকের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী লোকে ফারসী ও উর্দু শিক্ষা করিত। ফারসী ভাষা চর্চা সম্পর্কে বিহারের আজ যে স্থান, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বাংলাদেশের সেই স্থানই ছিল।”<sup>৩০</sup> ছুভাগ্যক্রমে ফারসী ভাষার প্রতি এই শ্রদ্ধার ফলে উর্দু শিক্ষাদান উপেক্ষিত হইয়াছে। ১৮৩৮ সালে এ্যাডাম সাহেব তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন : “এই সকল প্রদেশে এবং আগার ধারণা সমগ্র ভারতে মুসলমান সমাজের কাঠামোর এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য এই যে, লিখিত শিক্ষাদানের মাধ্যম বা উপায় হিসাবে এই শ্রেণী কোন সময়েই মাতৃভাষাকে ব্যবহার করে নাই।”<sup>৩১</sup>



তথাকথিত মাতৃভাষায় শিক্ষাদানকারী বিদ্যালয় বা পাঠশালাসমূহ বাংলাদেশে সংস্কৃতযেঁষা বাংলা এবং বিহারে নাগরী হরফে হিন্দী শিক্ষা দান করিত। ফলে স্বভাবতঃই মুসলিম ছাত্ররা সেদিকে আকৃষ্ট হয় নাই। হিন্দু শিক্ষক ও অধ্যাপকদের সহায়তায় মিশনারীরা তাহাদের স্কুল ও কলেজসমূহে এবং গভর্নমেন্ট ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলাকে সংস্কৃত ভাষার ছাঁচে গড়িয়া তুলিয়াছিল এবং ইহার ফলে বদ্বীপ অধুষিত বাংলা মূল্যে যে সকল মুসলমান ফারসী ও আরবী শব্দে সমৃদ্ধ বাংলাকে কথ্য হিসাবে ব্যবহার করিত। তাহাদের নিকট ইহা বিদেশী ভাষার মত হইয়া পড়ে। হাউস অব কমন্সের সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্যদান প্রসঙ্গে ডাঃ এফ, এইচ, উলসন সংস্কৃতের সহিত বাংলা ও হিন্দীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে “সেক্সপীয়ারের হিন্দী অভিধানের” প্রায় ৫০০টি শব্দের মধ্যে ৩০৫টিই সংস্কৃত শব্দ। বাংলা পাঠ্যপুস্তক “হিতোপদেশ” সম্পর্কে কলেজে পরীক্ষা লওয়া হইত। ইহার প্রথম ১৪৭টি শব্দের মধ্যে সংস্কৃত নয় এমন মাত্র ৫টি শব্দ ছিল।<sup>৩২</sup>

বাংলাদেশে স্কুলসমূহে পাঠ্য এই সংস্কৃত-যেঁষা বাংলা উক্ত বিদ্যালয়-সমূহ হইতে মুসলিম ছাত্রদের দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল। আবার বিহারে দেবনাগরী হরফে হিন্দী শিক্ষা দেওয়া হইত—মুসলমানদের নিকট ইহার ভাষা ও হরফ কোনটাই নিজস্ব ছিল না।

শিক্ষকগণ হিন্দু সমাজের কার্যস্থ শ্রেণী সম্ভূত হওয়ায় এবং তাহাদের শিক্ষা একটি বিশেষ হিন্দু বৈশিষ্ট্য অর্জন করায় বাংলা বিহারের পাঠশালা-সমূহ ধর্মভীরু মুসলমানদের নিকট আকর্ষণজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।<sup>৩৩</sup>

এই সকল স্কুলের পাঠ্যপুস্তক বেশির ভাগ...হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু পুরাণের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। যেমন, বাংলা স্কুলসমূহে পাঠ্যপুস্তক ছিল অমর সিংহ চাণক্য, সরস্বতী বন্দনা (দেবী সরস্বতীর আরাধনা) মানভঞ্জন, কলঙ্কভঞ্জন (রাধার সহিত ভগবান কৃষ্ণের প্রেম উপাখ্যান) ইত্যাদি। বাংলা দেশের হিন্দী স্কুলে কৃষ্ণের বালমূলভ চপলতার উপর লিখিত দানলীলা, দধিলীলা ইত্যাদি পড়ান হইত।<sup>৩৪</sup> বিহারে সাধারণতঃ পড়ান হইত দানলীলা, দধিলীলা, সুদাম-চরিত, রাম-জুন্মা ইত্যাদি—এ সবগুলিই বাংলার পাঠ্যপুস্তকগুলির অনুরূপ।<sup>৩৫</sup>

কি হিন্দু কি মুসলমান দেশীয় সমাজের উভয় অংশেরই শিক্ষার একটি স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য হইতেছে শিক্ষার সহিত ধর্মের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্বিজ্ঞান বা অত্যাশ্চর্য যে কোন ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ের জ্ঞান দানও “ধর্মীয় অনুশাসনের আওতায়” করা হইত।<sup>৩৬</sup> সুতরাং ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সকল মুসলমানই যে এই সকল প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে পরিহার করিয়া চলিত তাহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই।

সরকারের নির্দেশানুসারে ১৮০৭ সাল হইতে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত ডাঃ ফ্রান্সিস বুকানন বাংলা ও বিহারের কয়েকটি জেলায় অনুসন্ধান পরিচালনা করেন। সরকারী তত্ত্বাবধানে আর, এম, মার্টিন ১৮৩৮ সালে তাঁহার অনুসন্ধানের ফলাফল সম্পাদনা করিয়া তিন খণ্ডে প্রকাশ করেন।<sup>৩৭</sup> লর্ড বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে বাংলা ও বিহারের দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে ডব্লু, এ্যাডাম ও তিনটি রিপোর্ট ( ১৮৩৫—৩৮ ) প্রণয়ন করেন— প্রথম রিপোর্টটি ( ১৮৩৫ ) বুকাননের তথ্যাবলী ও অন্যান্য সরকারী নথিপত্রের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত। নিজস্ব গভীর পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান-লব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া বাংলার অন্তর্গত রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার বিস্তৃত বিবরণটি হইতেছে তাঁহার দ্বিতীয় রিপোর্ট ( ১৮৩৬ ) ; এবং তৃতীয় রিপোর্টটি উভয় প্রদেশের পাঁচটি প্রতিনিধিত্বশীল জেলা সম্পর্কে উহা তাঁহার ব্যক্তিগত সমস্ত তত্ত্বাবধানে সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিত।

যে সকল জেলায় ডাঃ বুকানন অনুসন্ধান পরিচালনা করেন, সেখানে মুসলমানদের শিক্ষা ক্রমাবনতির দিকে যাইতেছিল একরূপ ধারণা করিবার যথেষ্ট ভিত্তি তাঁহার রিপোর্টে রহিয়াছে। ঐ সময়ের মধ্যে সমাজের দারিদ্র্য একরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, বিনা সাহায্যে মুসলমানদের পক্ষে আর তাহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান বা অনুশীলন করান প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। ডাঃ বুকাননের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে ( তিনি যে সকল জেলায় অনুসন্ধান করিয়াছেন সেখানে ) মুসলমানদের দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার বিচার-বিশ্লেষণ নেহায়েত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

দিনাজপুর ও মালদহের বর্ণনা প্রসঙ্গে বুকানন বলিয়াছেন যে, মক্তবখানা বা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত অল্প।<sup>৩৮</sup> তাহাছাড়া যে স্বল্প কয়েকটি

বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল, সেখানেও শিক্ষাদান ছিল ভ্রান্তিপূর্ণ এবং রুচিহীন। ‘আরবী বা মুসলিম বিজ্ঞান শিক্ষা দানের’ বিদ্যালয় কার্যতঃ ছিলই না—বুকাননের মতে যে জেলায় জনসংখ্যার অধিকাংশ লোকই মুসলমান সেখানেই এই অবস্থা।<sup>৩৩</sup>

দিনাজপুরের ২২টি পুলিশ-মহকুমার মধ্যে ১৩টিতে ১১৯টি বাংলা ও নয়টি ফারসী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল আর ৯টি পুলিশ-মহকুমার কোন ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ই ছিল না।<sup>৩৪</sup> এই সকল বিদ্যালয়ে ছাত্র-বেতন বেশী ছিল না, তবুও তাহা “অধিকাংশ জনসাধারণের সাধের অতীত” ছিল।<sup>৩৫</sup> শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের এই দুঃখজনক পরিস্থিতির ফলে বুকানন প্রস্তাব করেন যে, এই জেলার জন্ম পুস্তক “মুসলমান কতৃক লিখিত হওয়া আবশ্যিক, কারণ জনসাধারণের অধিকাংশ যাহাদের শিক্ষার প্রয়োজন সর্বাধিক, তাহারা সকলেই এই ধর্মাবলম্বী।”<sup>৩৬</sup> তাহার আরও মত এই যে, হিন্দু অধ্যাপকদের দাতব্য সম্পত্তির বৃদ্ধি জেলার প্রয়োজনের অনুকূল নয় কারণ হিন্দুরা সেখানে সংখ্যালঘু। তিনি বলেন, “আমার বিশ্বাস, মুসলিম বিজ্ঞান ও সাহিত্যে যুবকদের শিক্ষিত করিবার জন্ম কয়েকটি ভাল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলে ইহার যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হইতে পারে—এই ধরনের কোন প্রকার প্রতিষ্ঠানই বর্তমানে নাই।”<sup>৩৭</sup>

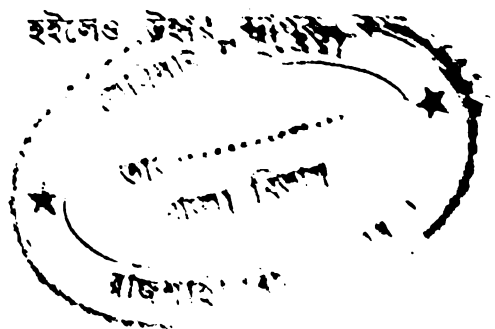
আর একটি মুসলমান প্রধান জেলা<sup>৩৮</sup> রংপুরে দিনাজপুর অপেক্ষাও শিক্ষা ব্যবস্থা উপেক্ষিত অবস্থায় দেখিয়াছেন বুকানন সাহেব। “কোন ধরনের সাধারণ বিদ্যালয়” বলিতে কিছুই সেখানে ছিল না<sup>৩৯</sup> এবং “এই জেলায় নগণ্য কেরানী হইবার উপযুক্ত কোন লোক” খুঁজিয়া বাহির করাই দুঃসাধ্যছিল।<sup>৪০</sup> আরবী বুঝিতে পারে এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম এবং “আখুনের (শিক্ষক) অধিকাংশই” আরবী বা ফারসী কোন ভাষাই বুঝিত না যদিও মুসলমানদের কোরাণ পড়াইবার জন্মই তাহাদের চাকুরি নির্ধারিত হইত। বিষয়বস্তুর কোনরূপ ব্যাখ্যা “তাহাদের ক্ষমতার বাহিরে” ছিল এবং বুকাননের মতে কাজীরাও “কোনরূপ অর্থ না বুঝিয়া পড়িত,” এ স্থলে এরূপ সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে।<sup>৪১</sup> উইলিয়াম এ্যাডাম সরকারী নথিপত্র ও ১৮৩৩ সালে লিখিত কাননগুদের রিপোর্টসমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, “১৯টি মহকুমার

মধ্যে ১৪টি মহকুমায় কোন ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অস্তিত্বই নাই এবং বাকি ৫টি মহকুমায় প্রাথমিক শিক্ষার ১০টি বাংলা ও দুইটি ফারসী বিদ্যালয় ছিল।<sup>৪৮</sup> শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থা এমনই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, “জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্ত নিজেদের মধ্যে বিজ্ঞ ব্যক্তির অভাবে” তাহারা হিন্দুদের নিকট হইতে পরামর্শ গ্রহণ করিত।<sup>৪৯</sup>

বুকাননের উপর ভিত্তি করিয়া এ্যাডাম লিখিয়াছেন যে, বিহারের অন্তর্গত পূর্ণিয়া জেলায় ৬৬ জন নিম্নস্তরের মুসলিম শিক্ষক (আখুন) ছিল এবং জেলার ছয়টি মহকুমায় কোনরূপ শিক্ষকই ছিল না।<sup>৫০</sup> তাহানের শিক্ষাদানও ছিল ত্রুটিপূর্ণ—যেমন না লিখাইয়া ফারসী ও আরবী হরক শিক্ষা দেওয়া হইত, কারণ লিখন পদ্ধতি স্বতন্ত্র শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল আর বহু ছাত্রই ফারসী অক্ষর জ্ঞানের পর আর লেখাপড়া শিক্ষা করিত না। কি পড়িতেছে তাহারা তাহার প্রায় কিছুই বুঝিত না। “অল্প কয়েকজনই চৌকশ ছাত্র হইতে পরিত” এবং শিক্ষকদের মধ্যে কেহই “উন্নত স্তরের ফারসী সাহিত্য শিক্ষা দানের ওয়াদা করিত না।”<sup>৫১</sup> বুকানন লক্ষ্য করেন যে, “আরবদের বিজ্ঞান” অত্যন্ত উপেক্ষিত এবং খুব কম কাজীই কোরাণ অথবা আরবী ভাষার লিখিত আইন, অধিবিদ্যা বা ব্যাকরণ জাতীয় পুস্তক বুঝিতে পারিত। বুকানন বলেন, “প্রকৃতপক্ষে মুসলিম আইনে বিচার করিবার জন্ত দেশীয় লোকদের শিক্ষার প্রতি যে ক্ষমতা প্রচেষ্টা নিয়োগ করা হয় তাহাও এই জেলায় ছিল না বলিলেই চল। ইংলণ্ডের কাউন্টি শহরের যে কোন সাধারণ এটনির মত নিজস্ব বিচার দপ্তর দখল আছে—এমন কোন লোক এখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছে কিনা তাহাও আমার যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে।”<sup>৫২</sup>

মুসলিম শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎসাহ দানের মত কোনরূপ প্রতিষ্ঠান বুকানন গোরক্ষপুর জেলায় দেখিতে পান নাই এবং অধ-শিক্ষিত শিক্ষকও ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করিতে অল্প সংখ্যক ছাত্রকে তিনি দেখিয়াছেন।<sup>৫৩</sup>

ভাগলপুরে দাতব্য সম্পত্তির আয়ে পরিচালিত কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং “আরবদের বিজ্ঞান” তেমন উপেক্ষিত না হইলেও উৎসাহ দানের চর্চা ছিল না।<sup>৫৪</sup>



পাটনা ও বিহার জেলায় ফারসী সাহিত্যের চর্চা পূর্ণিয়া ও ভাগলপুরের আয়ই ছিল। বুকানন বলেন, “অধিকাংশ মুসলমান অক্ষর জ্ঞান লাভ ও নাম সহি করিতে পারিলে এবং সেই সঙ্গে আরবী ভাষায় কিছু স্বরা মুখস্থ করিয়া রাখিতে পারিলেই সন্তুষ্ট থাকিত।”<sup>৫৫</sup> ঐ সকল জেলায় মুসলমানদের অপেক্ষা হিন্দু সমাজের ভাগ্য কিছু সুপ্রসন্ন ছিল বলিয়া মনে হয়। বুকাননের হিসাব মতে মোট ৭ জন মওলবী ও ৬৭০ জন মুসলিম নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকের তুলনায় ৫৬ জন পাণ্ডিত ও ১২৭৫ জন নিম্নশ্রেণীর হিন্দু গুরু ছিল।<sup>৫৬</sup>

কেবলমাত্র শাহবাদ জেলায় বুকানন দেখিতে পান যে, আইনজীবীর কাজ করিবার উদ্দেশ্যে মুসলমানগণ হিন্দুদের চাইতে বেশী করিয়া ফারসী শিক্ষা করিতেছে কিন্তু মুসলিম শিক্ষার জন্ত কোনরূপ প্রতিষ্ঠান ছিল না এবং শেরশাহ্ যে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাও পরিত্যক্ত হইয়াছে।<sup>৫৭</sup>

পূর্ব বাংলার সংখ্যাগুরু মুসলিম অধ্যুষিত জেলা সমূহেও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থা অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক ছিল বলিয়া মনে হয়। জনশিক্ষার সাধারণ কমিটি ১৮২৩ সালে অনুসন্ধান জানিতে পারেন যে, ত্রিপুরা জেলায় কোন স্কুলের জন্ত কোনরূপ দান বা কোন তহবিল নাই। ১৮৩৫ সালেও অবস্থার উন্নতি হইয়াছে এরূপ কোন তথ্য এ্যাডাম সাহেব পান নাই।<sup>৫৮</sup>

১৮৯১ সালের হিসাব মতে ময়মনসিংহ জেলার জন সংখ্যায় প্রতি ৭ জনে ৫ জন মুসলমান ও দুই জন হিন্দু ছিল। সেখানে বুকানন মুসলমানদের জন্ত কোন স্থায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখিতে পান নাই। অথচ হিন্দু শিক্ষার জন্য সেখানে ৫০।৬০টি বিদ্যালয় ছিল। যে জেলায় মুসলমানগণ এরূপ সংখ্যাধিক সেখানে মুসলিম শিক্ষার কোনরূপ প্রতিষ্ঠানের অভাব ১৮৩৫ সালে এ্যাডাম সাহেবের নিকট অন্তত ও অবিশ্বাস্য বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে।<sup>৫৯</sup> অবশ্য তিনিও এ সম্পর্কে কোনরূপ আলোকপাত করিতে পারেন নাই।

১৮০১ সালের হিসাবে চট্টগ্রাম জেলায় মুসলমান ও হিন্দুর সংখ্যানুপাত ছিল—মুসলমান ৩ জন ও হিন্দু ২ জন। ১৮২৭ সালে সেখানে দাতব্য সম্পত্তির আয়ে পরিচালিত একটি মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল ;

অনুরূপ আরও দুই একটি প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে বলিয়া এ্যাডাম সাহেবের বিশ্বাস।<sup>৬০</sup>

অপর একটি মুসলিম অধ্যুষিত জেলা বাথরগঞ্জে মুসলিম শিক্ষার ব্যবস্থা মোটেই উৎসাহজনক ছিল না এবং ১৮২৩ সালে কলেক্টর সাহেব তাঁহার রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছেন যে, শিক্ষার উদ্দেশ্যে জেলায় কোন দাতব্য সম্পত্তি বা তহবিলের অস্তিত্ব ছিল না।<sup>৬১</sup>

ঢাকায় সরকারী নথিপত্রে “ব্রিটিশ সংখ্যক মুসলমানের জ্ঞাত উল্লেখযোগ্য এই জেলায় ঘৃণাকরেও মুসলিম বিদ্যালয়ের উল্লেখ” না দেখিয়া এ্যাডাম সাহেব অত্যন্ত বিস্মিত হন।<sup>৬২</sup> হ্যামিল্টন অবশ্য বলিয়াছেন যে, বাংলা ভাষা শিক্ষা দিবার জ্ঞাত সমগ্র জেলায় বহু সংখ্যক হিন্দু বিদ্যালয় ছিল। গৃহে পাঠের ব্যবস্থা থাকিলেও এ্যাডাম সাহেবের ধারণা সামগ্রিকভাবে সর্বসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল “অত্যন্ত নিম্নস্তরে।”<sup>৬৩</sup>

এ্যাডাম সাহেবের দ্বিতীয় রিপোর্টটি ১৮৩৬ সালে তাঁহার অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক অনুসন্ধানের ফল। ইহাতে নাটোরের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য সরবরাহ করা হইয়াছে। নাটোর রাজশাহী জেলার একটি প্রতিনিধি স্থানীয় থানা এবং শিক্ষার দিক দিয়া সব চাইতে অগ্রসর। সংখ্যাগুরু মুসলিম অধ্যুষিত জেলার সব চাইতে অগ্রণী থানা সম্পর্কিত এই রিপোর্টে মুসলমানদের শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট চিত্র তুলিয়া ধরা হইয়াছে। কিন্তু সে চিত্র অপরাপর যে-কোন চিত্রের হায় সমান হতাশাব্যঞ্জক। ৪৮৫টি গ্রাম লইয়া গঠিত এই থানায় ৬,৫৬৫৫৮ জন হিন্দু ও ১২,৯৬, ৪০১ জন মুসলমান বাস করিত। সেখানে দুই সম্প্রদায়ের তুলনামূলক অবস্থা ছিল নিম্নরূপ<sup>৬৪</sup> :—

|                                                                                                       | হিন্দু | মুসলিম |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| ১। দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়                                                                          | ১১     | ১৬     |
| ২। দেশীয় উচ্চ শিক্ষায়তন                                                                             | ৩৮     | ০      |
| ৩। যে সকল পরিবারে পিতামাতা বা<br>বন্ধু বান্ধব ছেলেমেয়ের লেখাপড়ায়<br>মাঝে মাঝে সাহায্য করিয়া থাকেন | ১,২৭৭  | ৩১১    |

প্রথম শ্রেণীর (মোট ২৭ টি) বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে ২৩২ জন, তন্মধ্যে ৭১ জন মুসলিম শিক্ষকের অধীনে পড়াশুনা করে। বাকি ১৬১ জন ছাত্র হয় যে, মুসলিম শিক্ষকের নিকট যাহারা শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে তাহারা সকলেই মুসলমান (যাহা অবশ্যই সন্দেহের বিষয়, কারণ হিন্দু ও মুসলিম শিক্ষকদের নিকট হইতে ফারসী শিক্ষা গ্রহণ করিত) তাহা হইলে উক্ত ২৭টি স্কুলে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯১।<sup>৬০</sup> দ্বিতীয় শ্রেণীর বিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৩৯৭।<sup>৬১</sup> (এই শ্রেণীর কোন মুসলিম বিদ্যালয়ই ছিল না) : ফলে ঐ দুই শ্রেণীর বিদ্যালয়ে মোট হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৮৮, সেই তুলনায় মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা হইতেছে ৭১ জন। এতদ্ব্যতীত সাহেবের অনুসরণে যে সকল পরিবারে গৃহে শিক্ষাদান করা হইত তাহাতে প্রতি পরিবারে যদি ১১ জন ছেলেমেয়ে ধরা যায় তাহা হইলে বিদ্যালয়ে ছাত্রের সংখ্যার সহিত আরও ১৯১৬ জন হিন্দু ও ১১ জন মুসলিম ছাত্র যোগ করিতে হইবে। সুতরাং যে মহকুমায় হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা দ্বিগুণ সেখানে ১ জন মুসলমানের জায়গায় ৪ জন হিন্দু : : বন্দোবস্ত বিভাগ করিত এবং প্রতি মুসলিম ছাত্রের জায়গায় ২ জন হিন্দু ছাত্র বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিত। তাহাছাড়া, স্কুল-শিক্ষক ব্যতীত বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে ৮৮ জন, তন্মধ্যে মুসলমানমাত্র ১ জন।<sup>৬২</sup>

ঐ অনুসন্ধানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ্যাডাম সাহেব বলিয়াছেন যে, মুসলমানদের দারিদ্র্যের ফলেই এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমানেরা “দেশজ সমাজের সর্বাপেক্ষা দুঃস্থ অবস্থায় রহিয়াছিল এবং যাহারা অপরের স্থায় নিজেরাও মনে করিত যে, অবস্থা ও সামর্থ্য উভয় দিক দিয়াই তাহারা সামান্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনে অক্ষম।” এই সকল লোকের অবস্থা এমনই ছিল যে, এ্যাডাম সাহেব বলেন, “তাহাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান আর আকাশে ভ্রমণ করিবার কথা বলা উভয়ই তাহাদের কাছে সমান।” কারণ তাহাদের তৎকালীন অবস্থায় উভয়ই “সমান কঠিন ও হঠকারী” বলিয়া প্রতীয়মান হইত।<sup>৬৩</sup> জেলার সব চাইতে অগ্রণী থানায় মুসলমানদের অবস্থা হইতে অগ্রাগ্র অংশের চিত্র কল্পনা করা খুবই সহজ।

যতদূর পর্যন্ত এ্যাডাম সাহেব অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছিলেন, রাজাশাহী জেলার সর্বসাধারণের জন্য মুসলিম শিক্ষার একমাত্র বিদ্যালয় ছিল চিলমারিয়া থানার অন্তর্গত কসবা বাঘায়। এই বিদ্যালয়টি বহু শতাব্দীর পুরাতন এবং ইহা দাতব্য সম্পত্তির আয়ে চলিত।<sup>১০</sup> নাটোর মহকুমাকে এ্যাডাম সাহেব অধ্যাক্ষের তুলনায় অনস্বীকার্য রূপে উন্নতশীল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। এ্যাডাম সাহেব-প্রাপ্ত শেষ সংবাদ হইতেছে হরিয়াল, চানগাঁও, পুঁটিয়া, ভবানীগঞ্জ, চিলমারিয়া ও বাউলেশ থানার স্থান নাটোরের পরই। অপর পক্ষে তান্মোর, মান্দা, ছবলহাটি গোদাগাড়ি, সারদা ও মীরগঞ্জ থানা “শিক্ষাব্যবস্থার দিক হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত বলা যায়”।<sup>১১</sup> একথা এখন পরিষ্কার যে, শিক্ষা-ব্যবস্থা গুণাবলীর দিক হইতে ত্রুটিপূর্ণ ও স্বল্প পরিমাণ তো ছিলই, তাহা সঠিকভাবে সর্বত্র বিস্তৃতও ছিল না।

সামগ্রিকভাবে জেলার শিক্ষাব্যবস্থাকে এ্যাডাম সাহেব ত্রুটিপূর্ণ ও ক্ষয়িষ্ণু বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। অল্প সংখ্যক পরিবারে গৃহে শিক্ষাদানের ব্যবস্থাকে তিনি তাহাদের বর্তমান বিত্তহীন অবস্থার বিরুদ্ধে প্রাচীন আচার ও বিষয় বুদ্ধির সাহায্যে জনসাধারণের সংগ্রামের নির্দশন হিসাবেই ধরিয়া লইয়াছেন।<sup>১২</sup>

নিম্নে প্রদত্ত দুইটি হিসাব বাংলা ও বিহারের পাঁচটি জেলা সম্পর্কে এ্যাডাম সাহেবের তৃতীয় রিপোর্টের (১৮৩৮) ভিত্তিতে করা হইয়াছে। তালিকা দুইটি উভয় প্রদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবস্থার চিত্র উদ্ঘাটিত করিয়া ধরিয়াছে। জনসাধারণকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব তখনও সরকার গুরুত্বের সহিত বহন করে নাই। সেজন্য নিম্নে প্রদত্ত তালিকা দুইটি হইতে সরকারী সাহায্য ছাড়াও দেশীয় লোকেরা কিভাবে শিক্ষা চালু রাখিয়াছিলেন ও শিক্ষার ব্যাপারে কত উৎসাহী ছিলেন সে সম্পর্কে ধারণা করিয়া লওয়া যায়। বস্তুতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেশে প্রচলিত শিক্ষা ছিল দেশীয় লোকের প্রচেষ্টার ফল স্বরূপ।

**১নং তালিকা** <sup>১৩</sup> ফারসী ও আরবী স্কুল তাহার সংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যা  
ছাত্রদের জাতি ও ধর্মবিশ্বাস—



| জেলা         | ফারসী স্কুল | আরবী স্কুল | হিন্দু ছাত্র | মুসলিম ছাত্র | মোট   |
|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------|
| মুরশিদাবাদ   | ১৭          | ২          | ৬২           | ৪৭           | ১২৮   |
| বর্ধমান      | ৯৩          | ৮          | ৪৭৭          | ৪৯৪          | ১০৭২  |
| বীরভূম       | ৭১          | ২          | ২৪৫          | ২৪৫          | ৫৬৩   |
| ত্রিহৃত      | ২৩৪         | ৪          | ৪৪৫          | ১৫৩          | ৮৩৬   |
| দক্ষিণ বিহার | ২৭৯         | ১২         | ৮৬৭          | ৭১৯          | ১,৭৭৭ |
| মোট—         | ৬৯৪         | ২৮         | ২,০৯৬        | ১,৫৫৮        | ৫,৩৭৬ |

ইহা হইতে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য যে তথ্যটি জানা যায় তাহা হইতেছে এই যে, ফারসী ও আরবী বিদ্যালয় সমূহেও হিন্দুরা মুসলমানের অপেক্ষা সংখ্যাধিক। (৪ : ৩)—ইহার সহিত সংস্কৃত স্কুলে অধ্যয়নরত হিন্দুদের সংখ্যা যোগ দিলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যাইবে।

**২নং তালিকা** <sup>১৭</sup> মাতৃভাষার শিক্ষায়তন—তাহাদের সংখ্যা এবং ছাত্র সংখ্যা, ছাত্রদের জাতি ও ধর্মবিশ্বাস।

| জেলা         | বাংলা স্কুল | হিন্দি স্কুল | হিন্দু ছাত্র | মুসলিম ছাত্র | অন্যান্য | মোট    |
|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|
| মুরশিদাবাদ   | ৬২          | ৫            | ৯৯৮          | ৮২           | ×        | ১,১৪৭  |
| বর্ধমান      | ৬৩০         | ০            | ১২,৪০৮       | ৭৬৯          | ১৩       | ১৩,৭২০ |
| বীরভূম       | ৪০৭         | ৫            | ৬,১২৫        | ২৩২          | ২৬       | ৬,৭৯৫  |
| ত্রিহৃত      | ০           | ৮০           | ৫০২          | ৪            | ×        | ৫৮৭    |
| দক্ষিণ বিহার | ০           | ২৮৬          | ২,৯১৮        | ১৭২          | ×        | ৩,৩৭৬  |
| মোট—         | ১,০৯৯       | ৩৭৬          | ২২,৯৫১       | ১,২৬০        | ৩৯       | ২৫,৭২৫ |

মাতৃভাষায় শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় মুসলমানগণ হিন্দুদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে পশ্চাতে পড়িয়া ছিল। ২২,৯৫১ জন হিন্দু ছাত্রের তুলনায় মাত্র ১,২৬০ জন মুসলমান ছাত্র পাওয়া যায়।

বাংলা ও বিহারে মাতৃভাষার শিক্ষায়তনে মুসলিম ও হিন্দু ছাত্রের সংখ্যার এই তারতম্যের কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে। অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও সঙ্গত কারণে মুসলমানেরা এ সময় বাংলা ও হিন্দী বিদ্যালয় পরিহার করিয়া

চলিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন তাহাদের উপযুক্ত অনুরূপ কোন মাতৃ-ভাষার শিক্ষায়তন ছিল না।

এ্যাডাম সাহেব বলেন, “নিম্নশ্রেণীর হিন্দু জনসাধারণের তুলনায় নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণের অধিকতর নৈতিক অবনতি ও অজ্ঞানতার কিয়ৎ পরিমাণ কারণ নিহিত ছিল হিন্দুদের বাংলা ও হিন্দী বিদ্যালয়ের অনুরূপ মুসলমানদের জ্ঞান উর্দু স্কুলের অভাবের মধ্যে। উহাদের উন্নতির প্রথম ধাপই হওয়া উচিত এই অভাব দূর করা।”<sup>১০</sup>

কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক উচ্চশ্রেণীর মুসলমানরা ফারসী ও আরবী স্কুল সমূহে অধ্যয়ন করিত। বাংলা ও বিহারের মুসলমান কৃষকদের নিকট ফারসী ভাষা ছিল “বিদেশী ও অজ্ঞাত, সুতরাং জনসাধারণের শিক্ষার বাহন হইবাঃ অনুপযুক্ত।”<sup>১১</sup> ফারসী শিখিবার আগ্রহ না থাকায় মাতৃভাষার শিক্ষায়তনের অভাবে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল।<sup>১২</sup>

মাতৃভাষা যাহাদের উর্দু, বাংলা ও বিহারের সেই সকল লোকের জ্ঞান এ্যাডাম সাহেব উর্দু মাতৃভাষার শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার সোপানিষ্ঠ করেন। মুসলিম সমাজের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বিশেষ পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের সোপানিষ্ঠও তিনি করেন এবং দেশীয় বিদ্যালয় সমূহের পৃষ্ঠপোষকতা করিবার জ্ঞান তিনি সরকারকে উপদেশ দেন।<sup>১৩</sup>

তাহার সোপানিষ্ঠসমূহের তাৎপর্য কোনদিনই হৃদয়ঙ্গম করা হয় নাই। মাতৃভাষা হিসাবে বাংলা ও হিন্দীর পৃষ্ঠপোষকতা করায় মুসলমানদের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে এবং ১৮৩৫ সালের পর হইতে সরকার কর্তৃক পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে তাহাদের শিক্ষার বিস্তারে বিরাট বাধা হিসাবে কাজ করিয়াছে। জনসাধারণকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব যখন সরকার গ্রহণ করিলেন তখনও এ্যাডাম সাহেবের নির্দেশিত পথে মুসলমানদের জ্ঞান উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কোন চেষ্টাই করা হয় নাই; ফলে ঐ সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে দূরে সরিয়া থাকিয়াছে। শিক্ষা কমিশনের নিকট প্রদত্ত স্মারকলিপিতে ভাগলপুরের মুসলমানগণ স্পষ্ট ভাষায় এই কথা জানাইয়া দেন যে, “যতদিন পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সংস্কৃত ঘোঁষা

| জেলা         | ফারসী স্কুল | আরবী স্কুল | হিন্দু ছাত্র | মুসলিম ছাত্র | মোট   |
|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|-------|
| মুরশিদাবাদ   | ১৭          | ২          | ৬২           | ৪৭           | ১২৮   |
| বর্ধমান      | ৯৩          | ৮          | ৪৭৭          | ৪৯৪          | ১০৭২  |
| বীরভূম       | ৭১          | ২          | ২৪৫          | ২৪৫          | ৫৬৩   |
| ত্রিভূত      | ২৩৪         | ৪          | ৪৪৫          | ১৫৩          | ৮৩৬   |
| দক্ষিণ বিহার | ২৭৯         | ১২         | ৮৬৭          | ৭১৯          | ১,৭৭৭ |
| মোট—         | ৬৯৪         | ২৮         | ২,০৯৬        | ১,৫৫৮        | ৫,৩৭৬ |

ইহা হইতে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য যে তথ্যটি জানা যায় তাহা হইতেছে এই যে, ফারসী ও আরবী বিদ্যালয় সমূহেও হিন্দুরা মুসলমানের অপেক্ষা সংখ্যাধিক। (৪ : ৩)—ইহার সহিত সংস্কৃত স্কুলে অধ্যয়নরত হিন্দুদের সংখ্যা যোগ দিলে ব্যাপারটা বৃদ্ধিতে পারা যাইবে।

২নং তালিকা <sup>১৭</sup> মাতৃভাষার শিক্ষায়তন—তাহাদের সংখ্যা এবং ছাত্র সংখ্যা, ছাত্রদের জাতি ও ধর্মবিশ্বাস।

| জেলা         | বাংলা স্কুল | হিন্দি স্কুল | হিন্দু ছাত্র | মুসলিম ছাত্র | অন্যান্য | মোট    |
|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|
| মুরশিদাবাদ   | ৬২          | ৫            | ৯৯৮          | ৮২           | ×        | ১,১৪৭  |
| বর্ধমান      | ৬৩০         | ০            | ১২,৪০৮       | ৭৬৯          | ১৩       | ১৩,৭২০ |
| বীরভূম       | ৪০৭         | ৫            | ৬,১২৫        | ২৩২          | ২৬       | ৬,৭৯৫  |
| ত্রিভূত      | ০           | ৮০           | ৫০২          | ৪            | ×        | ৫৮৭    |
| দক্ষিণ বিহার | ০           | ২৮৬          | ২,৯১৮        | ১৭২          | ×        | ৩,৩৭৬  |
| মোট—         | ১,০৯৯       | ৩৭৬          | ২২,৯৫১       | ১,২৬০        | ৩৯       | ২৫,৭২৫ |

মাতৃভাষার শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় মুসলমানগণ হিন্দুদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে পশ্চাতে পড়িয়া ছিল। ২২,৯৫১ জন হিন্দু ছাত্রের তুলনায় মাত্র ১,২৬০ জন মুসলমান ছাত্র পাওয়া যায়।

বাংলা ও বিহারে মাতৃভাষার শিক্ষায়তনে মুসলিম ও হিন্দু ছাত্রের সংখ্যার এই তারতম্যের কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে। অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ ও সঙ্গত কারণে মুসলমানেরা এ সময় বাংলা ও হিন্দী বিদ্যালয় পরিহার করিয়া

চলিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তখন তাহাদের উপযুক্ত অনুরূপ কোন মাতৃভাষার শিক্ষায়তন ছিল না।

এ্যাডাম সাহেব বলেন, “নিম্নশ্রেণীর হিন্দু জনসাধারণের তুলনায় নিম্নশ্রেণীর মুসলমানগণের অধিকতর নৈতিক অবনতি ও অজ্ঞানতার কিয়ৎ পরিমাণ কারণ নিহিত ছিল হিন্দুদের বাংলা ও হিন্দী বিদ্যালয়ের অনুরূপ মুসলমানদের জন্য উচ্চ স্কুলের অভাবের মধ্যে। উহাদের উন্নতির প্রথম ধাপই হওয়া উচিত এই অভাব দূর করা।”<sup>১০</sup>

কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক উচ্চশ্রেণীর মুসলমানরা ফারসী ও আরবী স্কুল সমূহে অধ্যয়ন করিত। বাংলা ও বিহারের মুসলমান কৃষকদের নিকট ফারসী ভাষা ছিল “বিদেশী ও অজ্ঞাত, সুতরাং জনসাধারণের শিক্ষার বাহন হইবাঃ অনুপযুক্ত।”<sup>১১</sup> ফারসী শিখিবার আগ্রহ না থাকায় মাতৃভাষার শিক্ষায়তনের অভাবে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা অজ্ঞানতার অন্ধকারে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল।<sup>১২</sup>

মাতৃভাষা যাহাদের উচ্চ, বাংলা ও বিহারের সেই সকল লোকের জন্য এ্যাডাম সাহেব উচ্চ মাতৃভাষার শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার সোপারিশ করেন। মুসলিম সমাজের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বিশেষ পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের সোপারিশও তিনি করেন এবং দেশীয় বিদ্যালয় সমূহের পৃষ্ঠপোষকতা করিবার জন্য তিনি সরকারকে উপদেশ দেন।<sup>১৩</sup>

তাহার সোপারিশসমূহের তাৎপর্য কোনদিনই হৃদয়ঙ্গম করা হয় নাই। মাতৃভাষা হিসাবে বাংলা ও হিন্দীর পৃষ্ঠপোষকতা করায় মুসলমানদের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে এবং ১৮৩৫ সালের পর হইতে সরকার কর্তৃক পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহে তাহাদের শিক্ষার বিস্তারে বিরাট বাধা হিসাবে কাজ করিয়াছে। জনসাধারণকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব যখন সরকার গ্রহণ করিলেন তখনও এ্যাডাম সাহেবের নির্দেশিত পথে মুসলমানদের জন্য উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কোন চেষ্টাই করা হয় নাই; ফলে ঐ সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে দূরে সরিয়া থাকিয়াছে। শিক্ষা কমিশনের নিকট প্রদত্ত স্মারকলিপিতে ভাগলপুরের মুসলমানগণ স্পষ্ট ভাষায় এই কথা জানাইয়া দেন যে, “যতদিন পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সংস্কৃত বোঁধা

মার্জিত হিন্দী কেতাব পড়ান হইবে ততদিন পর্যন্ত মুসলমান ছাত্রদের অভাবটাই বেশী করিয়া চোখে পড়িবে।”<sup>১২</sup>

জনসাধারণের শিক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার করিয়া প্রচলিত দেশীয় বিদ্যালয়সমূহকে ব্যবহারের জন্ত এ্যাডাম সাহেব যে সোপারিশ করিয়াছেন তাহার ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে, ইন্দো-ব্রিটিশ সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র সমূহ হইতে বহু দূরবর্তী অঞ্চলে বাসকারী মুসলমানরা নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়ে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিত ; এমন কি জেলা শহরগুলিতে ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহে প্রদত্ত পরবর্তী উচ্চস্তরের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত হইতে পারিত। কিন্তু এ বিষয়ে সরকার কার্যতঃ কিছুই করেন নাই। দেশীয় বিদ্যালয়-সমূহকে অবলুপ্ত হইতে দেওয়া হইয়াছে। মফস্বলের অধিবাসী শহর বন্দরে লব্ধ পশ্চিমী চিন্তাধারার আলোক-বঞ্চিত গরীব মুসলমান সম্প্রদায়ের এমন সম্পদ বা প্রেরণা ছিল না—যাহাতে তাহারা নিজেদের প্রয়োজন মারফিক একটি শিক্ষাব্যবস্থা নিজেরাই গড়িয়া তুলিতে পারে।

॥ অনূদিত ॥

প্রবন্ধটি লিখিতে নিম্নলিখিত দলীল ও

গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করা হইয়াছে :—

- ১। Selections from the Records of Bengal Government (S. R. B. G.) Vol. XIV, Papers relating to Presidency College, P. 10 Secretary Council of Edn. to Secretary Beng. Govt. 4 August, 1853.
- ২। See Quran, sura xevi, and Tradition from the Bihar-ul Anwar of Mulla Bakir Ibn Mohammed Teki al- majliei, Fluegel's edition, p. 44-quoted in Ameer Ali, Spirit of Islam, pp 550-61.

- ৩। Low, M. N., Promotion of learning in India during Mohamadan rule, p. 128.
- ৪। Fuzli Rubbi, Origin of the Mussalmans of Bengal. pp. 67, 74.
- ৫। Bengal Provincial Committee, Education Commission Part II, pp. 50-51, para 183.
- ৬। Jaffar, Education in Muslim India, p. 33 ; Law, op, cit., pp. 10-21 ; Fuzli. Rubbi, op. cit. pp. 67-74 ; Seir, vol. 11, pp. 63, 69-70, 432-34.
- ৭। Selections from the Records of the Government of India (S. R. G. I.) ccv, p. 24.
- ৮। Adam, W. Third Report, p. 174. See also p. 216 in which he mentions endowed institutions of a large number of places.
- ৯। Adam, Second Report, p. 37.
- ১০। Adam, Third Report, p. 66. For religious endowments at other places see Eastern India, vol. I, p. 133 and Ibid, vol. II, pp. 104-105.
- ১১। Adam, Second Report, p. 59.
- ১২। Hunter, W. W., Indian Mussalmans, p. 156.
- ১৩। Adam, Third Report, p. 56.
- ১৪। Adam, First Report, p. 55.
- ১৫। Ibid, p. 24, Buchanan refers to a number of cases where “Muslim teachers taught Hindu and Muslim boys gratis, Eastern India, vol. II, pp. 105, 432 and Ibid., vol. III, p. 560.
- ১৬। Adam, First Report, p. 55.
- ১৭। Ammer Ali, A cry from the Indian Mahomedans, Nineteenth Century, vol. XII, p. 198.
- ১৮। Adam, First Report, p. 20.

- ১৯ । Adam, Third Report, p. 80.
- ২০ । Adam, Second Report, p. 28.
- ২১ । Adam, Third Report, p. 18.
- ২২ । Adam, Third Report, p. 99.
- ২৩ । Adam, Second Report, pp. 26, 27.
- ২৪ । Adam, Third Report, p. 77.
- ২৫-২৬ । A cry from the Indian Mahomedans, Nineteenth Century vol. XII, p. 169.
- ২৭ । Bengal Provincial Committee, Education Commission, p. 213, Evidence of Abdul Luteef in answer to Q 1-3.
- ২৮ । Eastern India, vol. III, p. 504.
- ২৯ । S. R. B. C. vol. XIV, Papers relating to Presidency College, pp. 10-11, Secretary Council to Secretary Bengal Government, 4 Augst, 1853, para, 40.
- ৩০ । Bengal Provincial Committee, Education Commission p. 51 para 183.
- ৩১ । Adam, Third Report, p. 76.
- ৩২ । Sixth Report, Select Committee ( H. C. ) 1853 Minutes of Evidence, p. 9., Wilson in reply to Q 8472.
- ৩৩ । Bengal Provincial Committee, Education Commission p. 213,
- ৩৪ । Adam, Third Report, p. 21
- ৩৫ । Ibid., p. 54.
- ৩৬ । Sixth Report, Select Committee (H. C.) 1853, Minutes of Evidence, Evidence of John Clarks Murahman (18 July 1853) in reply to Q 8592.
- ৩৭ । Reports of R. M. Martin, 1838, Eastern India.
- ৩৮ । Eastern India, vol. II, p. 710

- ৩৯। Ibid, Appendix, p. I8.
- ৪০। Ibid, See also Adam, First Report, p. II8
- ৪১। Eastern India, vol. II, p. 705
- ৪২। Ibid, p. 7I0.
- ৪৩। Ibid., p. 113
- ৪৪। Report Census of Bengal, 1872, vol. II, p. 11 para 356.
- ৪৫। Eastern India, vol. III, p. 499
- ৪৬। Ibid, p. 500
- ৪৭। Ibid., p. 504
- ৪৮। Adam, First Report, P. 103
- ৪৯। Ibid., p. 104 ; Eastern India vol. III, p. 505
- ৫০। Adam, First Report, p. 115
- ৫১। Ibid., see also Eastern India, vol. III, p. 129
- ৫২। Eastern India, vol. III p. 133
- ৫৩। Eastern India, vol. II, p. 432
- ৫৪। Ibid., pp. 104, 105
- ৫৫। Eastern India, vol. I., p. 132
- ৫৬। Ibid, Appendix, p. 2
- ৫৭। Ibid, pp. 484-85
- ৫৮। Adam, First Report, pp. 88-9
- ৫৯। Ibid., pp. 89-90
- ৬০। Ibid., pp. 86-8
- ৬১। Adam, First Report, pp. 83-4
- ৬২। Ibid., p. 82
- ৬৩। Ibid., p. 81
- ৬৪। Adam, Second Report, Summary of Tables etc., Table I. columns 6, 7, 8, p. XVI.
- ৬৫। Calculation based on Table I, pp. XVII-XXIX.



- ৬৯ Adam, Second Report, Table III, Column 4, p. XIVIII.
- ৭০ Ibid. p. 53
- ৭১ Ibid. Summary. of the Tables, Table I, Column 9, P. XVI.,
- ৭২ Ibid.. p. 33.
- ৭৩ Ibid.. p. 37
- ৭৪ Ibid.. p. 69
- ৭৫ Ibid.. p. 35
- ৭৬ Table drawn up from facts and figures contained in Adam's Third Report, pp. 63-76.
- ৭৭ Adam's Third Report, pp. 17, 24, 30 and 33.
- ৭৮ Adam, Third Report, p. 76.
- ৭৯ Ibid., p. 77, 214
- ৮০ Ibid., p. 134
- ৮১ Ibid., pp. 213-20
- ৮২ Bengal Provincial Committee, Education Commission, p. 396-para 5, )



২৪৮

## ॥ লেখক পরিচিতি ॥

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এম-এ, ডি-লিট  
ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, বাংলা বিভাগ,  
ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,  
(বর্তমানে) বৈতনিক সদস্য,  
উর্দু-উন্নয়ন পরিষদ,  
করাচী।

ডক্টর এ. আর মল্লিক এম-এ, পি-এইচ-ডি, এক, আব. এনএস  
অধ্যক্ষ, ইতিহাস বিভাগ ও  
ডীন, কলা বিভাগ,  
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ডক্টর মম্বাহরুল ইসলাম এম-এ, পি-এইচ-ডি,  
অধ্যক্ষ, বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগ,  
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

নুস্তাফা নূর-উল-ইসলাম এম-এ  
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,  
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের  
বাংলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত

ডক্টর মম্বহারুল ইসলামের  
দুইটি অনবদ্য গবেষণা-গ্রন্থ

কবি হুমায়ূন আহমেদ (যন্ত্রস্থ) মূল্য ১০০

কবি পাগলা কানাই (সদ্য প্রকাশিত) মূল্য ৩০০

প্রাপ্তিস্থান : বাংলা বিভাগ,  
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,  
রাজশাহী

ও : গ্রেট বেংগল লাইব্রেরী  
এগারো—ইসলামপুর রোড, ঢাকা-এক



